রামায়ণ-মহাভারতের দেব-গন্ধর্বরা
কি
ভিনগ্রহবাসী ?

[দানিকেন তত্ত্বের আলোকে রামায়ণ-মহাভারতের আলোচনা]

নিরঞ্জন সিংহ

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৭৮
[মে, ১৯৭১]

প্রকাশনা
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তর
বাংলা একাডেমী
ঢাকা—২

মুদ্রণ
ইউনিক প্রিণ্টার্স
৪২/২, আজিমপুর
ঢাকা—৯

প্রচ্ছদ
কাজী আবুল কাসেম

ভূমিকা ও কৃতজ্ঞতা

Erich Von Daniken তাঁর বৈপ্লবিক তত্ত্বের জন্য বর্তমানে সারা বিশ্বের একজন অতি বিতর্কিত মানুষ। তাঁর তত্ত্বের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে বহুকাল পূর্বে একদল ভিন্‌গ্রহবাসী উন্নত জীব পৃথিবীতে এসে সভ্যতা বিস্তার করেছিল। প্রাচীন রহস্যময় সভ্যতাগুলির তারাই সম্ভবত আদি পুরুষ। দানিকেনের প্রথম বই Chariots of the Gods যখন প্রথম পড়ি তখন তাঁর একটি মন্তব্য আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে হয়েছিল। মহাভারতের দিব্য অস্ত্রের কথা উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেছিলেনঃ 'This ancient Indian Epic, the Mahabharata, is more comprehensive than the Bible and even at a conservative estimate its original core at least 5000 years old. It is well worthwhile reading this Epic in the light of present day knowledge.'

১৯৭৫ এর আগস্ট মাসে দানিকেন কলকাতায় এসে যাদুঘরে এক আলোচনা সভায় যোগ দেন। এই সভার সভানেত্রী ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়। ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের বিভিন্ন ঘটনাবলীর পিছনে বাস্তব বিজ্ঞান কাজ করছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ-বেদান্ত এবং অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব বলেও তিনি মনে করেন।

সত্যিই তো, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ এগুলো আধুনিক জ্ঞানের আলোকে একটু খুঁটিয়ে দেখলে হয় না? কিন্তু সময়ের অভাবে ইচ্ছেটাকে কাজে লাগাতে পারছিলাম না। বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প/উপন্যাস লেখায় ডুবে ছিলাম। হঠাৎ একদিন কথায় কথায় সাহিত্যিক বন্ধু শিশিরকুমার মজুমদার বললেন, 'রামায়ণ, মহাভারত

ভালো করে পড়ুন আপনার লেখার বহু খোরাক পাবেন।' কথাটা আমার মগজ-কমপিউটারে কাজ করল প্রোগ্রামিং-এর মতো। না, আর অপেক্ষা করা চলে না। শুরু হল বই-পত্র সংগ্রহ ও পড়ার পালা। কিন্তু পড়তে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। এ যে বিরাট এক রহস্য ভাণ্ডার! অতএব লেখা শুরু করতেই হল।

দানিকেন, ডঃ চট্টোপাধ্যায় ও শিশিরবাবুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ অধ্যাপিকা রেবা রুদ্রর কাছে, যিনি বহু প্রয়োজনীয় বই-পত্র সংগ্রহ করে দিয়েছেন। সাহিত্যিক বন্ধু মঞ্জিল সেন ও রাধারমণ রায়ের কাছ থেকে নিয়ত উৎসাহ পেয়েছি। গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত গ্রন্থকারদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে যাঁদের বই থেকে আলোকচিত্র ইত্যাদি গ্রহণ করেছি। আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপ ঘোষ যথেষ্ট সাহায্য করেছেন বই থেকে ছবি তোলার ব্যাপারে। এ ছাড়াও অনেকেই আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সব শেষে কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় প্রণব বিশ্বাসকে, যাঁর উৎসাহ, উপদেশ ও সহযোগিতায় বইটির সুষ্ঠু ও দ্রুত প্রকাশন সম্ভব হল।

নিরঞ্জন সিংহ

অমিতা ও অনিন্দ্যকে

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা	...	৯
ভিন্‌গ্রহে উন্নত জীব থাকার সম্ভাবনা কতটা ?	...	১৭
পৃথিবীতে কি করে মানুষের জন্ম হল ?	...	২২
পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা এত রহস্যময় কেন ?	...	২৮
মহেঞ্জোদড়োবাসীরাই কি রামায়ণের গন্ধর্বরা ?	...	৩৪
রাক্ষসরা নগর পরিকল্পনায় কি রকম উন্নত ছিল	...	৪২
সিংহলই কি রাবণের লঙ্কা ?	...	৪৪
লুপ্ত মহাদেশ লেমুরিয়া	...	৪৬
তামিলরা কি লেমুরিয়াবাসী ?	...	৪৮
সুগ্রীব হনুমানকে কি লেমুরিয়ার কথা বলেছিলেন ?	...	৫১
লঙ্কার রাবণ-পূর্ব রাক্ষসের ইতিহাস	...	৫৯
রহস্যময় ইস্টার-দ্বীপবাসীরাই কি মহেঞ্জোদড়োবাসী ?	...	৬১
লুপ্ত আটলান্টিস	...	৬৩
পৃথিবীর রহস্যময় মানচিত্র !	...	৬৬
মিশরের পিরামিড কি একটি কালাধার ?	...	৭০
মায়া রহস্য	...	৭৫
দেব-গন্ধর্বরা কি গ্রহান্তরের মানুষ ?	...	৮০
অনার্য রাবণও কি বেদ বিশারদ ছিলেন ?	...	৮৩
বেদ কত প্রাচীন ?	...	৮৭
পুরাণ রচনাকারীরা কি আপেক্ষিক তত্ত্ব জানতেন ?	...	৮৯
বিমান তৈরির কলা-কৌশল কি বেদেই আছে ?	...	৯৩
ইন্দ্র কি উড়ন্ত-চাকী করে পৃথিবীতে আসতেন ?	...	৯৯
অথঃ পুষ্পকবিমান কথা	...	১০৫
অর্জুন কি মহাকাশ পাড়ি দিয়েছিলেন ?	...	১০৮
দেবতাদের গ্রহান্তর-স্টেশনটি কোথায় ছিল ?	...	১১৬
রামায়ণে কৃত্রিম উপগ্রহ !	...	১২৬
হনূমান কি টেলিস্কোপিক রকেট ?	...	১৩২

		পৃষ্ঠা
মায়া-সীতা আর তিলোত্তমা আসলে কি রোবট ?	...	১৪৪
গরুড় রহস্য !	...	১৪৯
পুরাকালের স্থাপত্য	...	১৫৫
অস্ত্র রহস্য !	...	১৫৯
পুরাকালের অভিনব চিকিৎসা-বিদ্যা	...	১৬৭
ব্যাসদেব রহস্য !	...	১৭৫
কথা শেষ, কিন্তু শেষ কথা নয়	...	১৮৩
গ্রন্থপঞ্জী	...	১৮৭

চিত্রসূচী

৫৬ পৃষ্ঠার পর :
কুতুবমিনার প্রাঙ্গণের লৌহস্তম্ভ
মোহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার ও পয়োপ্রণালী
মোহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত নরকঙ্কাল
পীরি রেইসের রহস্যময় মানচিত্র

৮৮ পৃষ্ঠার পর :
সিন্ধু সভ্যতার বিস্তার
বিশ কোটি বছর আগেকার পৃথিবী
পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির ভৌগোলিক অবস্থান
চিচেন ইৎজা

১২০ পৃষ্ঠার পর :
জিগগুরাট—মানমন্দির
চিচেন ইৎজার এল ক্যাস্টিলো স্টেপ পিরামিড
গীজের পিরামিড
ইস্টার দ্বীপ ও মহেঞ্জোদড়োর লিপি

১৫১ পৃষ্ঠার পর :
ইস্টার দ্বীপের হোয়া-হাকা-নানা-ইয়া
টিয়াহুয়ানাকো মন্দিরের প্রবেশদ্বার
টিয়াহুয়ানাকো মন্দিরের বিগ্রহ
মহাকাশচারীর স্কেচ ও আধুনিক মহাকাশচারী

॥ প্রস্তাবনা ॥

কতকগুলি রহস্যময় প্রাচীন সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আজ আমাদের হাতে এসে পড়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি করা সত্ত্বেও আমরা এই সব রহস্যের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ছি। না পারছি রহস্যগুলি ভালো ভাবে বুঝতে, না পারছি তার সমাধান করতে।

সম্প্রতি একদল তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-লেখক সেই রহস্য-কুহেলী দূর করার জন্য এক বৈপ্লবিক তত্ত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন।

সুমের-সভ্যতা, মিশর-সভ্যতা, মায়া-সভ্যতা, ইস্টার দ্বীপের-সভ্যতা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে তাঁরা বলছেন যে এই সব সভ্যতার আদিপুরুষরা আমাদের পৃথিবীর মানুষ নন। বহু প্রাচীন কালে তারা মহাকাশের বুক চিরে অন্য কোন গ্রহ থেকে নেমে এসেছিলেন এই পৃথিবীতে। তারপর এখানে আস্তানা গেড়েছিলেন। জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্যে পৃথিবীর বানর-মানুষকে হয়তো পরিবর্তিত করেছিলেন তারা বুদ্ধিমান মানুষে। নিজেদের উন্নত জ্ঞানের নানা নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছেন তারা এই পৃথিবীর বুকে। হয়তো তারা আশা করেছিলেন যে তাদের সৃষ্ট মানুষ একদিন তাদের মতো সভ্য হয়ে উঠে তাদের উন্নত জ্ঞানের অংশীদার হবে। সে আশা কি পুরোপুরি সফল হয়েছে? উত্তর দেওয়া শক্ত।

ভারতবাসী হিসেবে আমরা কি কোন রহস্যময় প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী? ভারতে কি কোন প্রাচীন রহস্যময় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে? দিল্লীর কুতব মিনার প্রাঙ্গনে একটি মরিচাহীন লৌহস্তম্ভ আছে। এর বয়স আনুমানিক ৩৫০০ বৎসর। ওজন প্রায় ৬ টন এবং উচ্চতা প্রায় ৭·৫ মিটার। এত দিনের রোদ-বৃষ্টিতেও স্তম্ভটির গায়ে এতটুকু মরিচা ধরে নি। বর্তমান কালে 'স্টেনলেস' বা 'মরিচা ধরে না এ রকম' ইস্পাত তৈরি করা হলেও সুদূর প্রাচীন কালে মরিচাহীন ইস্পাত তৈরি নিশ্চয় বিস্ময়কর ঘটনা। কেবল তাই নয়, এত বড় একটি স্তম্ভ ঢালাই করার জন্য যে ধরণের কারখানার দরকার সে-রকম কারখানার কথা সেই পুরাকালে কল্পনা করাই যায় না। পুরাকালের মানুষের উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নীরব সাক্ষী হিসেবে স্তম্ভটি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই কি সব? না, আরো আছে। মহেঞ্জোদড়ো-হরাপ্পায় আবিষ্কৃত সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। পৃথিবীর আদিম সভ্যতা হিসেবে খ্যাত সুমের-সভ্যতার মতোই যা বিস্ময়কর। নগর পরিকল্পনা ও নগর স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞানে যারা ছিলেন আধুনিক আমেরিকা ও ফরাসীদের সমকক্ষ। কিন্তু এতে কি মন ভরে? মিশরের ও চিচেনইৎজার রহস্যময় পিরামিড, ইস্টার দ্বীপের বিশাল বিশাল পাথরের মূর্তি, টিয়াহুয়ানকার বিশাল সূর্যতোরণ, পেরুর নাজকার বিস্তৃত সমতলভূমি জুড়ে বিমান অবতরণের চিহ্ন—এ রকম বিস্ময়কর পুরাবস্তুর সন্ধান তো ভারতে পাওয়া যায় নি। তা ঠিক। কিন্তু ভারতে বোধ করি তার চাইতেও বেশী রহস্যময় জিনিস আছে এবং তা ভারতের একান্তই নিজস্ব। সে জিনিস হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীন গ্রন্থ বেদ। এই বেদ এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। মানুষ সভ্যতার চরম শিখরে উঠলে তবেই এ রকম গ্রন্থ রচনা করতে পারে। ভূত বা ম্যাটার-এর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান পার্থিব ভোগ-সুখের চরম পর্যায়ে পৌঁছবার জন্য এই বিংশ শতাব্দীতে যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বেদ-রচয়িতারা বহু হাজার বৎসর পূর্বেই সম্ভবত সেই চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

ইতিহাস বলে ভারতে বেদ নিয়ে আসেন আর্যরা। এই আর্য কারা? কোথা থেকে এরা ভারতে এসেছিলেন? ঐতিহাসিকরা সে সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বলতে পারেন না। তবে তারা অনুমান করেন যে ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের দিকে মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের কোন অংশে অথবা রাশিয়ার উরাল পর্বতমালার দক্ষিণের সমতলে এই আর্য জাতির উদ্ভব হয়। সভ্যতার বিচারে এরা কিন্তু খুব একটা উচ্চ স্তরে উঠতে পারে নি। কিছু চাষবাস, কিছু পশুপালন এই নাকি ছিল তাদের প্রধান বৃত্তি। অথচ ঠিক এই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে কিন্তু বেশ কয়েকটি বড় বড় সভ্যতার বিকাশ ঘটে গেছে। সুমের, মিশর ও সিন্ধু-সভ্যতা তাদের অন্যতম। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বড় বড় ইমারত ও দেবমন্দির তৈরি, ভাস্কর্য, মূর্তিশিল্প, শিলালেখ, মৃন্ময়লেখ, নগর পরিকল্পনা ইত্যাদি এই সব সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট। আর্যদের তখনকার সভ্যতা যার ধার কাছ দিয়েও যায় না। ঐতিহাসিকরা যে আর্যদের কথা বলে থাকেন তারা তো তখন চাষবাস আর পশুপালন করে অতি সাধারণ জীবনযাত্রা চালাচ্ছে।

ঐতিহাসিকরা আরো বলেন আনুমানিক ২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের দিকে এই আর্যরা নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়লেন। প্রাচীন গ্রীস, এশিয়া-মাইনর, ইরাণ, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে এদের ছড়িয়ে পড়ার খবর পাওয়া যায়। এই সময় এরা নাকি ইরাণ হয়ে ভারতেও ঢুকে পড়েন। ভারতে যখন আর্যরা এলেন তখন তারা যাযাবর জাতি। ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছেন। গরু পোষেন এবং দল বেঁধে খাবার আর আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। এ রকম একটি জাতির পক্ষে বেদের মতো গ্রন্থ সৃষ্টি করা কি করে সম্ভব হল সে ব্যাখ্যা অবশ্য পাওয়া যায় না।

সভ্যতার উষা লগ্নে একদল পশুপালক যাযাবর বিবর্তন-চক্রের ধারাবাহিকতা এড়িয়ে কি করে মানসিক উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে বেদের মতো এক অসীম জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্টি করেছিলেন তা যেন এক ধাঁধা।

ঐতিহাসিকরা বার বার এ ধাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু ধাঁধার সমাধান করতে না পেরে কোন রকমে একটি গোঁজামিল দিয়ে বিষয়টির উপর যবনিকা টেনেছেন। একটি চরম সভ্য জাতির জ্ঞানভাণ্ডার বেদকে তারা প্রাথমিক স্তরের সভ্য আর্যদের সৃষ্টি বলে চালাতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু কেন? তার একমাত্র কারণ সেই সময়ে যাযাবর পশুপালকদের ছদ্মবেশে যে ভিন্‌গ্রহবাসী সুসভ্য উন্নত মানুষ পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তাদের আসল পরিচয় ঐতিহাসিকরা উদ্ধার করতে পারেন নি। একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই ওই ভিন্‌গ্রহবাসীরা তথাকথিত পশুপালক যাযাবরদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। সেই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পরে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি।

বেদ সৃষ্টিকারী আর্য ও ঐতিহাসিক আর্য এক নয়। এরা সভ্যতার দুই মেরুর বাসিন্দা। এদের আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারলেই বহু ধাঁধার উত্তর পাওয়া যাবে।

আর্য-পূর্ব যে সুসভ্য জাতি ভারতে বাস করতেন সেই মহেঞ্জোদড়ো-বাসীরাই বা কারা? পশুপালক যাযাবর আর্যদের তুলনায় এরা যে অনেক বেশী সুসভ্য ছিলেন তার প্রমাণ সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। অথচ আমরা দেখি পশুপালক যাযাবর আর্যরা এদের অনার্য, রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি হীন সম্বোধন করছে ও এদেরকে উৎখাত করে আর্য-সভ্যতা বিস্তার করছে। এর ভিতরে কি কোন গূঢ় রহস্য আছে?

নিশ্চয় আছে। বেদ সৃষ্টিকারী আর্য, যারা পরবর্তী কালে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন পৌরাণিক দেবতা এবং রামায়ণ, মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র রূপে—সেই তথাকথিত দেবতারা, দেবজন অর্থাৎ গন্ধর্ব, নাগেরা এবং দেবশত্রু অনার্য, রাক্ষস বা অসুররা কেউই এই পৃথিবী-বাসী নন। তারা সবাই এসেছিলেন ছায়াপথের কোন এক গ্রহ থেকে, যাকে আমরা বলে থাকি স্বর্গলোক। কেন এক দল আর এক দলকে হীন চোখে দেখতে শুরু করলেন আর কেনই বা তাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করলেন তারই বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী ছড়িয়ে আছে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে।

শ্রদ্ধেয় রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা' বইয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন : 'একটা সময় এসেছিল যখন স্বর্গলোক দেবগণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সেই সময় দেবতা, দেবজন এবং অসুর সবাইকে নতুন বসতির অনুসন্ধান করতে হয়; তাঁরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে মর্ত্যপথে পৃথিবীতে নেমে আসতে থাকেন। এইখানে ক্রমে আরও বহু মিশ্রজাতির সৃষ্টি হল। মূল স্বর্গলোকের সঙ্গে তাঁদের অনেকের হয়ত সম্বন্ধ রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি, কিন্তু তাঁরা মর্ত্যকে বহু অমর্ত্যবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।'

মিত্র মহাশয় অবশ্য স্বর্গলোক বলতে হিমালয় পর্বতের উচ্চতর বিস্তীর্ণ ভূভাগকেই বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন 'এই অঞ্চলটিই হচ্ছে তথাকথিত স্বর্গভূমি।' আসলে হিমালয় পর্বতের উচ্চতর ভূভাগ স্বর্গভূমি ছিল না, ছিল দেবলোক অর্থাৎ দেবতাদের একটি গোপন ঘাঁটি। স্বর্গভূমি ছিল পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন গ্রহে।

বেদে যা ছিল বীজরূপে, সেই জ্ঞানভাণ্ডার যেন পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠেছে উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী যদি আমরা সংস্কারহীন মন নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করি তাহলে রহস্য হয়তো সহজ হয়ে উঠবে। বহু পণ্ডিত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের রহস্যময় কাহিনীগুলিকে অলীক বলে মনে করেন। এ রকম খোলাখুলি মন্তব্য করার আগে আমরা নিশ্চয় একবার ভালো করে ভেবে দেখব। Erich Von Daniken তাঁর Chariots of the Gods বইয়ে বলেছেন, 'If we want to set out on the arduous search for the truth, we must all summon up the courage to leave the lines along which we have thought until now and as the first step begin to doubt everything that we previously accepted as correct and true. Can we still afford to close our eyes and stop up our ears because new ideas are supposed to be heretical and absurd?'

রামায়ণ, মহাভারতের কিছু কাহিনী অলীক বলে মনে হওয়ার দুটি স্বাভাবিক কারণ আছে। প্রথমত: যে কথা আমরা পূর্বেই

উল্লেখ করেছি তা হচ্ছে এই যে আমাদের সীমিত জ্ঞান দিয়ে আমরা বহু ঘটনার গূঢ় অর্থ বুঝে উঠতে পারছি না, স্বভাবতই ঘটনাগুলি আমাদের কাছে ব্যাখ্যাহীন অলীক বলে মনে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত: নকল করা মানুষের একটি সাধারণ ধর্ম। বিরাট, বিশাল বা অভিনব কিছু তাব মনকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে। তখন নিজের সৃষ্টিক্ষমতার কথা বিস্মৃত হয়ে সে আসল জিনিসের নকল করার চেষ্টা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

তাই দেখা যায় মিশরে গীজের বিখ্যাত রহস্যময় পিরামিডের পাশে অতি-সাধারণ বহু পিরামিড ছড়িয়ে আছে। যেগুলি পরবর্তী কালের সৃষ্টি এবং যার মধ্যে কোন রহস্য নেই। আসল পিরামিড নির্মাতাদের গভীর উদ্দেশ্যের কথা এই সব সাধারণ পিরামিড নির্মাতারা জানতেন না। তাই আসলের পাশে নকলের এই ছড়াছড়ি। ঠিক তেমনি রামায়ণ, মহাভারতের আসল রহস্যময় ঘটনার মাঝে ছড়িয়ে আছে অতি-সাধারণ বহু ঘটনার কথা পরবর্তী কালের রচনাকাররা রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনাগুলির গূঢ় তত্ত্ব না বুঝেই নিজেদের বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে কিছু অক্ষম রচনা রামায়ণ, মহাভারতে ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন। এগুলিকে চিনে নিতে অবশ্য খুব বেশী কষ্ট হয় না।

আব্রাহাম যেখান থেকে এসেছিলেন, বাইবেলে বর্ণিত সেই উর নগরীকে উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতেরা ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক কোন গুরুত্বই দেন নি। সম্প্রতি কয়েকজন ঐতিহাসিক বাইবেলকে ইতিহাসের এক মূল্যবান উৎস বলে মনে করছেন। Sir Leonardo Ulley মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীন উর শহর আবিষ্কাব করার পর থেকেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে।

একশো বছর আগে কোন পণ্ডিতই হোমারের 'ইলিয়াড' বা 'অডিসি'কে ইতিহাসের মর্যাদা দেন নি। Heinrich Schliemann একে ইতিহাস মনে করে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করেন ও শেষ পর্যন্ত কিংবদন্তীর ট্রয় নগরী আবিষ্কার করেন। এর পর শ্লিমান

অডেসিয়াসের দেশে ফিরে আসার পথ অনুসরণ করে গ্রীকরা ট্রয় নগরী লুঠ করে যে ধনসম্পদ নিয়ে আসে তার সন্ধানে মাইসিনদের কবর খুঁড়তে আরম্ভ করেন। ইলিয়াডে হোমার অডেসিয়াসের ব্যবহৃত পায়রা খোদাই করা যে পানপাত্রের বর্ণনা দিয়েছিলেন, গভীর গর্ত থেকে শিলিম্যান ৩৬০০ বৎসরের পুরাতন সেই পানপাত্রটি খুঁজে পান।

সুতরাং রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনাবলীকে আজ পুরোপুরি অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়তো সম্ভব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মহাভারত সম্বন্ধে বলেছেন, 'যাহা অতিপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিব না। (তবে) আমি এমন বলি না যে, আমরা যাহাকে অনৈসর্গিক বলি, তাহা কাজে কাজেই মিথ্যা। আমি জানি যে, এমন অনেক অনৈসর্গিক নিয়ম আছে যাহা আমরা অবগত নহি। যেমন একজন বন্যজাতীয় মনুষ্য, একটি ঘড়ি, কি বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রীকে অনৈসর্গিক ব্যাপার মনে করিতে পারে, আমরাও অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাবি।' তিনি এই প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, 'বুঝাইয়া দাও যে, যাহাকে অতিপ্রাকৃত বলিতেছি, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত, তবে বুঝিব।' বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিবাদী মানুষ, তাই মন্তব্য করেছেন, 'বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত কোন অনৈসর্গিক ঘটনায় বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি তোমাকে কেহ বলে, আম গাছে তাল ফলিতেছে দেখিয়াছি, তোমার তাহা বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। তোমাকে বলিতে হইবে, হয় আমগাছে তাল দেখাও, নয় বুঝাইয়া দাও কি প্রকারে ইহা হইতে পারে।'

আজ থেকে একুশ বছর আগে যদি কাউকে বলা হত যে মানুষের পক্ষে পৃথিবীর চারপাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ঘোরানো সম্ভব তাহলে ব্যাপারটাকে কেউ বিশ্বাস করতেন না, অতিপ্রাকৃত বলে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু আজকে কি কেউ বলবেন যে ব্যাপারটা অসম্ভব? আজ থেকে দশ বছর আগে যদি কাউকে বলা হত চাঁদে মানুষ যেতে

পারে তাহলে অনেকে হয়তো বলতেন, 'আগে যাক দেখি তবে বিশ্বাস করব।' কিন্তু ১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই নীল আর্মস্ট্রং অলড্রিনকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদের বুকে নেমে ওঁদের মহাকাশযানের পাশে যে পতাকাটি পুঁতেছিলেন তাতে লেখা ছিল :

আর কি অবিশ্বাস করার উপায় আছে ?

ফরাসী বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাহিনীকার জুলে ভের্ণ যখন তাঁর কল্প-কাহিনী Round the World in Eighty Days প্রকাশ করলেন, তখন সে গল্প পড়ে সবাই মজা পেয়েছিলেন, কিন্তু সেই কল্প-কাহিনীটিই যে একদা সত্যি হয়ে উঠতে পারে এ কথা কেউ তখন ভাবতে পারেন নি। আজ আমাদের মহাকাশচারীরা আশি দিনের পরিবর্তে মাত্র ছিয়াশি মিনিটে পৃথিবীকে একবার করে চক্কর দিয়ে আসছেন।

এটাই স্বাভাবিক। মানুষ তার নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সব কিছুর ব্যাখ্যা করে। তার জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হলে, পূর্ব-ব্যাখ্যারও পরিবর্তন হয়। চন্দ্রগ্রহণ যে রাহুর কোপে ঘটে না তা এখন আমরা জানি।

রাবণের পুষ্পক রথকে এককালে মানুষ অলীক রূপকথার কাহিনী বলে ভাবত ; কিন্তু এখন আমরা জানি ও রকম বিমান তৈরি অসম্ভব কোন ঘটনা নয়। দেবতারা যখন তখন রথে চড়ে স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে নেমে আসতেন, এ ঘটনাটিও তো এখন বহুলাংশে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে, তাই নয় কি ?

সুতরাং আমাদের নবলব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকে রামায়ণ, মহাভারত আর একবার খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

ভিনগ্রহে উন্নত জীব থাকার সম্ভাবনা কতটা?

দেবতারা যদি ভিনগ্রহবাসী হন, তাহলে আমাদের দেখতে হবে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে মানুষের মতো বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা কতটা।

বেতার-দূরবীণ বা রেডিও টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের বহু অজানা রহস্যকে জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। এই বেতার-দূরবীণের মাধ্যমে মাঝে মাঝে তাঁরা যে সব সুসংবদ্ধ বেতার সংকেত পেতে লাগলেন তাতে বিজ্ঞানীরা রীতিমত হতচকিত হলেন। এগুলিকে তাঁরা কিন্তু মহাবিশ্বের সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা বলে মেনে নিতে পারলেন না। এই সব সুসংবদ্ধ বেতার সংকেত তাঁদের মনে সৃষ্টি করল এক গভীর সন্দেহের। তবে কি তাঁরা মহাবিশ্ব থেকে পাঠানো কোন উন্নত প্রাণীদের বেতার সংকেত পাচ্ছেন? যে প্রাণীরা মহাবিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে চলেছে?

১৯৬০ সালে Frank Drake নামে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গ্রীণ ব্যাঙ্কের ন্যাশনাল রেডিও এ্যাস্ট্রনমি সেণ্টারে শুরু করলেন পরীক্ষা নিরীক্ষা। ড্রেক ৮৫ ফুট বেতার-দূরবীণের মুখ ঘুরিয়ে ধরলেন সূর্য থেকে ১০.৮ আলোক-বর্ষ দূরের এপসিলন ইরিডানি এবং সূর্য থেকে ১২.২ আলোকবর্ষ দূরের টাউসেটি এই দুই নক্ষত্রের দিকে। রেকর্ড করলেন ওই দুই নক্ষত্র থেকে আগত বেতার সংকেতের। তারপর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ওই সংকেতগুলিকে বিশ্লেষণ করা হল, সত্যি সত্যি ওগুলি দূর নক্ষত্র থেকে ভেসে আসা কোন উন্নত প্রাণীদের পাঠানো বেতার সংকেত কি না তা জানবার জন্যে।

বিশ্লেষণের পর কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা অবশ্য ড্রেকের পক্ষে সম্ভব হল না। ড্রেকের এই পরীক্ষা 'প্রজেক্ট ওজমা' নামে

খ্যাত। ড্রেক কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও বিজ্ঞানী মহলে কিন্তু বিষয়টি নিয়ে বেশ হৈ চৈ পড়ে গেল। এই অনন্ত বিশ্বে মানুষ হয়তো নিঃসঙ্গ নয়। পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন গ্রহে বা আমাদের সৌরলোকের বাইরে অন্য কোন নক্ষত্রলোকের কোন গ্রহে হয়তো মানুষের মতো বা মানুষের থেকেও উন্নত কোন প্রাণী আছে। সুতরাং অনুসন্ধান শুরু হল।

মহাকাশ যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। মানুষ আজ তার নিজের সৌরমণ্ডলের গ্রহে গ্রহে পাঠাতে শুরু করেছে মনুষ্যহীন মহাকাশযান। সেখানে কোন উন্নত প্রাণী আছে কিনা তা এক্ষুণি সঠিক ভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ অনুসন্ধানের পালা সবে শুরু হয়েছে। সৌর-মণ্ডলের বাইরেও মনুষ্যহীন মহাকাশযান পাইওনীয়র পাঠানো হয়েছে।

সত্যিই কি মহাবিশ্বে কোন উন্নত সভ্য প্রাণী আছে? কল্প-বিজ্ঞানের কাহিনীকাররা বহু দিন ধরেই বলে আসছেন যে মহাবিশ্বে বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কি বলেন? বিজ্ঞানীদের মত হচ্ছে যে উপযুক্ত অবস্থায় পৃথিবীর মতো অন্যান্য গ্রহেও জীবনের বিকাশ সম্ভব।

আমাদের নিজেদের সৌরজগত সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা যে বৃহস্পতি ও শনি গ্রহে যদি কোন প্রাণী থাকে তাহলে তারা আমাদের মতো অক্সিজেন-সেবী না হয়ে হবে এ্যামোনিয়া-সেবী। কারণ বৃহস্পতি ও শনির আবহমণ্ডলে এ্যামোনিয়ার প্রাচুর্য। শুক্র অত্যন্ত উত্তপ্ত ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে ঢাকা তাই সেখানে জীবনের সম্ভাবনা খুব কম। বিজ্ঞানীরা মঙ্গলে জীবনের সম্ভাবনা বেশী বলে ভাবতেন; কিন্তু মনুষ্য-হীন মহাকাশযান ভাইকিং তাঁদের অল্পবিস্তর হতাশ করেছে।

এবার দেখা যাক আমাদের গ্যালাক্সী মিল্কিওয়ে বা ছায়াপথ—প্রাচীন পণ্ডিতরা যাকে আকাশ-গঙ্গা বলতেন সেখানে জীবনের সম্ভাবনা কি রকম। আমাদের ছায়াপথে সম্ভাব্য নক্ষত্রের সংখ্যা হচ্ছে দশ হাজার কোটি। এদের মধ্যে বহু নক্ষত্র অল্পবয়সী বা নতুন, অর্থাৎ এগুলি প্রচণ্ড উত্তপ্ত। এদের যদি গ্রহমণ্ডলী থাকে তাহলে তারাও

হবে এক একটি অগ্নিময় গোলক – সৃষ্টির প্রথম দিকে যেমন ছিল আমাদের পৃথিবী। এ রকম উত্তপ্ত গ্রহমণ্ডলীতে জীবনের বিকাশ সম্ভব নয় বলেই বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছেন।

আবার বহু নক্ষত্র হয়তো অত্যন্ত বেশী বয়সী অর্থাৎ প্রাচীন সুতরাং স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। ফলে তাদের গ্রহমণ্ডলীও হবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা—হয়তো বরফে মোড়া। সুতরাং সেখানে উচ্চস্তরের জীবনের আশা করা ভুল।

আবার বহু নক্ষত্র হয়তো বা ডাব্‌ল বা ট্রিপ্‌ল-স্টার সিস্টেম, অর্থাৎ দুটি বা তিনটি নক্ষত্র খুব কাছাকাছি থেকে পরস্পরকে পরিক্রমা করে চলেছে। এদের যদি কোন গ্রহমণ্ডলী থাকে তবে তাদের কক্ষপথ হবে বিকেন্দ্রিক। অর্থাৎ কোন সময়ে তারা চলে আসবে নক্ষত্রদের খুব কাছাকাছি, আবার কোন সময় চলে যাবে নক্ষত্রদের কাছ থেকে বহু দূরে। এর ফলে যখন এরা নক্ষত্রদের খুব কাছে আসবে তখন ওদের ভূপৃষ্ঠ প্রচণ্ড উত্তাপে ঝল্‌সে যাবে। আবার যখন দূরে চলে যাবে তখন উত্তাপের অভাবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ওদের ভূপৃষ্ঠ জমে যাবে বরফের মতো। এই রকম চরমভাবাপন্ন অবস্থায় কোন জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়।

আর অবশিষ্ট কিছু নক্ষত্র হয়তো হবে মাঝবয়সী অর্থাৎ আমাদের সূর্যের মতো। এরা প্রচণ্ড উত্তপ্তও নয় আবার প্রচণ্ড ঠাণ্ডাও নয়। এদের ঘূর্ণনের বেগ এমন যে এরা এদের গ্রহমণ্ডলীকে ধরে রাখতে সক্ষম। এই সব নক্ষত্রদের গ্রহমণ্ডলী হয়তো বহু দিন পূর্বে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। হয়তো ধীরে ধীরে পবিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেখানে জন্ম নিয়েছে উদ্ভিদ, জীবজন্তু। সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌রা হিসেব করে দেখেছেন যে আমাদের ছায়াপথে এই ধরণের নক্ষত্রের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় চারশো কোটির মতো।

এই চারশো কোটি নক্ষত্রের সকলেরই যে গ্রহমণ্ডলী থাকবে এমন কোন কথা নেই। আমাদের সূর্যের সর্বাপেক্ষা কাছের কুড়িটি নক্ষত্রের মধ্যে মাত্র দুটি নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলী আছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এরা হচ্ছে ৬ আলোকবর্ষ দূরের বার্ণার্ডস্ স্টার এবং ১১'১ আলোক-বর্ষ দূরের ৬১-সিগনী। সুতরাং মোট নক্ষত্রের শতকরা দশভাগ নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলী আছে বলে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ চারশো কোটি নক্ষত্রের মধ্যে চল্লিশ কোটি নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলী থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

কিন্তু এদের মধ্যে ক'টি গ্রহে জীবন-বিকাশী পরিবেশ থাকতে পারে? আমাদের সৌরমণ্ডলের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে সূর্যের ন'টি গ্রহের মধ্যে মাত্র মঙ্গল ও পৃথিবীতে জীবন-বিকাশী পরিবেশ আছে। এই পরিবেশ নির্ভর করে দুটি জিনিসের উপর। প্রথমত: গ্রহগুলির ভর এমন হবে যাতে করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বেশ জোরালো হয়, অন্যথায় গ্রহগুলি তাদের চারপাশের আবহমণ্ডলকে ধরে রাখতে পারবে না। অর্থাৎ এই সব গ্রহগুলির অবস্থা হবে চাঁদের মতো। আবহমণ্ডল না থাকলে জীবন বিকাশের সম্ভাবনা প্রায় থাকেই না। দ্বিতীয়ত: এই গ্রহগুলি তাদের কেন্দ্রীয় নক্ষত্রের কাছাকাছি এমন একটি কক্ষপথে থাকবে যেখানে উত্তাপ না-কম না-বেশী। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে গড়ে দশটি সৌরমণ্ডলের মাত্র তিনটি গ্রহ এই দুটি প্রধান সর্ত মেনে চলে। তার অর্থ হল এই যে চল্লিশ কোটি গ্রহমণ্ডলী সমন্বিত নক্ষত্রের মধ্যে প্রায় বারো কোটি গ্রহে জীবন-বিকাশী পরিবেশ থাকার সম্ভাবনা আছে।

জীবন-বিকাশী পরিবেশ থাকলেই প্রত্যেকটি গ্রহে উন্নত জীবনের আশা করা যায় না। মঙ্গলে জীবন-বিকাশী পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত সেখানে কোন জীবনের সন্ধান পাওয়া যায় নি, উন্নত জীবের কথা তো দূরের কথা। এর কারণ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক-কোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী ও জটিল মস্তিষ্কের অধিকারী উন্নত প্রাণীর উদ্ভব হতে কোটি কোটি বৎসর লেগে যায়। পৃথিবীতে প্রথম প্রাণীর উদ্ভব হতে দশ কোটি বৎসর লেগেছিল বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। তাই বারো কোটি গ্রহের শতকরা দশভাগ গ্রহে উন্নত প্রাণী থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। অর্থাৎ আমাদের ছায়া-

পথে এক কোটি কুড়ি লক্ষ গ্রহে উন্নত জীবের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আমাদের ছায়াপথের মতো কোটি কোটি গ্যালাক্সী নিয়ে মহাবিশ্ব। সুতরাং হয়তো এই মুহূর্তে কোটি কোটি গ্রহে উন্নত জীবেরা সভ্যতা বিস্তার করে চলেছে।

গত ১২ই নভেম্বর, ১৯৭৮-এর আনন্দবাজার পত্রিকার একটি প্রতিবেদন তুলে দিয়ে এই প্রসঙ্গের ইতি টানছি :

'আকোলা, ১১ই নভেম্বর—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ডঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার সম্প্রতি বলেছেন, অন্যান্য গ্রহেও প্রাণের অস্তিত্ব আছে এ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। ডঃ নারলিকার টাটা ইন্‌সটিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চের জ্যোতি-পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। গতকাল এখানে আর এল টি কলেজ অব সায়েন্‌সে মহাকাশে জীবন সম্পর্কে এক বক্তৃতায় ডঃ নারলিকার এ কথা বলেন। তিনি জানান বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীই তাঁর সঙ্গে একমত। সূর্য থেকে পৃথিবী ও মঙ্গলের দূরত্ব প্রায় সমান এবং মঙ্গলের আবহাওয়া সম্ভবত প্রাণের পক্ষে আরও অনুকূল। ডঃ নারলিকারের মতে মঙ্গল গ্রহে অবতীর্ণ ভাইকিং মহাকাশযানের পরীক্ষা খুবই সীমিত ছিল। তিনি বলেন এই মহাবিশ্বে সূর্যের মতো অগণিত নক্ষত্রের বহু গ্রহেই নিশ্চিত প্রাণ আছে।'

অর্থাৎ পৃথিবীর বাইরে আমাদের ছায়াপথের অন্য বহু গ্রহে বুদ্ধিমান জীব আছে বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

পৃথিবীতে কি করে মানুষের জন্ম হল ?

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলিকে কেন রহস্যময় বলা হয় সে কথা বুঝতে হলে প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য গবেষণায় মানুষের বিবর্তনের যে ধারাবাহিক ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়েছে সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১৯৫৯ সালে বৃটিশ পুরাতত্ত্ববিদ Dr. Louis Leakey ও তাঁর স্ত্রী Mary পূর্ব আফ্রিকার একটি শুষ্ক হ্রদের বুক থেকে আবিষ্কার করেন একটি খুলির জীবাশ্ম। খুলিটি মানুষের মতো কোন প্রাণীর। তাঁরা এই প্রাণীর নাম রাখলেন জিঞ্জানথ্রোপাস। (অর্থাৎ পূর্ব আফ্রিকার মানুষ)। বিজ্ঞানীরা এর ডাক-নাম দিলেন জিঞ্জি। প্রায় ২০,০০,০০০ বৎসর পূর্বে জিঞ্জি পৃথিবীতে বাস করত। জিঞ্জির খুলির জীবাশ্মের আশেপাশে পাওয়া গেছে পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র। অর্থাৎ জিঞ্জি পাথরের টুকরো থেকে প্রয়োজন মতো অস্ত্র তৈরি করতে পারত। বিজ্ঞানীদের ধারণা জিঞ্জি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত, সামান্য একটু ভাবনা চিন্তাও করতে পারত। কিন্তু সে কথা বলতে পারত না এবং আগুনের ব্যবহার জানত না। জিঞ্জি হচ্ছে বানর-মানুষ।

জিঞ্জির সমসাময়িক হচ্ছে অস্ট্রেলোপিথিকাস। ১৯২০ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী Dr Raymond Dart এদের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। অস্ট্রেলোপিথিকাস হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার বানর-মানুষ।

এর পরের দশ লক্ষ বৎসর কুয়াশাচ্ছন্ন। এই দশ লক্ষ বৎসরের মধ্যে আমরা আর কোন বানর-মানুষ বা তাদের থেকে উন্নত জীবের কোন সন্ধান পাই না। এর পর যাদের সন্ধান পাওয়া গেল তারা পিকিং-মানুষ বা সিনানথ্রোপাস। পিকিং শহরের কাছে একটি গুহায় এদের জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া যায়। প্রস্তর-যুগের এই শিকারী মানুষরা প্রয়োজনীয় পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে পারত। শিকারে যাওয়া

সময় এই সব অস্ত্রশস্ত্র তারা সঙ্গে নিয়ে যেত। পিকিং-মানুষেরা একটি সাংঘাতিক আবিষ্কার করে ফেলেছিল। এরা আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। নৃতত্ত্ববিদ্ F. Clark Howell বলেন এরা হাতের কাছে জ্বালানী যোগাড় করে রাখত এবং সব সময়ের জন্য আগুন জ্বালিয়ে রাখত, আগুন নিভতে দিত না। জিঞ্জি আর পিকিং-মানুষের মধ্যে কেটে গেছে দশ লক্ষ বৎসর। আর এই দশ লক্ষ বৎসরে আবিষ্কৃত হয়েছে কেবলমাত্র আগুন। অগ্রগতির এই ধাবায় পরবর্তী দশ লক্ষ বৎসরে মানুষ আজকের সভ্যতায় পৌঁছুতে পাবত কি?

যাই হোক, আমরা আরো একটু আলোচনা করে দেখি। জিঞ্জি ও পিকিং-মানুষের মগজের মাপ আধুনিক মানুষেব মগজের চেয়ে ছোট ছিল। দশ লক্ষ বৎসরের ব্যবধানে জিঞ্জি ও পিকিং-মানুষের শারীরিক গঠন ও মগজের মাপের সামান্যই পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু এর মধ্যে পিকিং-মানুষ আবিষ্কার করল আগুন। যে আগুন সভ্যতার এক বিশেষ অঙ্গ। জিঞ্জি ও পিকিং-মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে এই আগুনের ব্যবহার ছাড়া আর বিশেষ কোন পার্থক্যই আমাদের চোখে পড়ে না। কি করে পিকিং-মানুষেরা আগুনের আবিষ্কার করল? না কি কেউ তাকে আগুন জ্বালাবার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল?

Alan এবং Sally Landsburg তাঁদের In search of Ancient Mysteries বইয়ে মন্তব্য করেছেন 'But may be, on the other hand, somebody dropped in from the skies and taught the submen about fire'

এর পর আমরা সন্ধান পাই Homo-Neanderthals বা নিয়ান-ডারথাল মানুষের। প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে এরা ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকায় আবির্ভূত হল। এরা কিন্তু বানর-মানব নয়। এদের চেহারা ছিল বেঁটে ও মোটাসোটা। পাঁচ ফুটের একটু বেশী লম্বা ছিল এরা। এদের হাত ও পায়ের চেহারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। জিঞ্জি ও পিকিং-মানুষদের হাত পা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে এ রকম রূপ পেয়েছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন না। সব থেকে বিস্ময়কর হচ্ছে, এদের মগজ ছিল অনেক বড়, প্রায় ১৬০০ ঘন

সেন্টিমিটার। জিঞ্জি ও পিকিং-মানুষদের মগজ থেকে প্রায় দেড়গুণ বড় এবং আমাদের মগজ থেকে প্রায় ২০০ ঘন সেন্টিমিটার বেশী। নিয়ানডারথাল মানুষদের শরীরের লোমও আমাদের শরীরের লোম থেকে বেশী ছিল না। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে একজন নিয়ানডারথাল মানুষকে চুল দাড়ি কামিয়ে আধুনিক পোশাকে কলকাতার মতো কোন আধুনিক শহরের রাজপথে ছেড়ে দিলে সে দিব্যি আধুনিক মানুষের ভিড়ে মিশে যাবে।

নিয়ানডারথাল মানুষেরা কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্রই তৈরি করতে পারত তা নয়, তারা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করার মতো যন্ত্রপাতিও তৈরি করত। যেমন হাড় বা কাঠ কাটার জন্য করাতের মতো ধারালো অস্ত্র, বাটালি, র‍্যাদা ইত্যাদি। পশুর চামড়া শুকিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে গায়ে দিত এরা। এরা কাজকর্মের জন্য আমাদের মতো ডান হাত ব্যবহার করত। কারণ এদের মগজের বাঁদিক ডানদিকের তুলনায় বড় ছিল (বাঁদিকের মগজ শরীরের ডানদিকের অংশকে পরিচালনা করে)। এদের মগজের মাপ আমাদের মগজের মাপের চেয়ে একটু বড় ছিল ঠিকই; কিন্তু আমাদের মগজ থেকে এদের মগজ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ছিল বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা।

এরা মৃতদেহের সৎকার করত। মৃতদেহ কবর দিত ও কবরের চারপাশে পাথরের বেড়া দিয়ে রাখত। কেবল তাই নয়, এরা হয়তো বিশ্বাস করত মৃত্যুর পরেও জীবন আছে, তাই বেশীর ভাগ কবরে কুঠার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। এরা হয়তো ভাবত পরবর্তী জীবনে মৃতেরা এই সব কুঠার ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করবে। সম্ভবত তারা মৃতদেহকে শ্রদ্ধা জানাত ফুল দিয়ে। একটি কবরের কাছে প্রায় আট রকম ফুলের রেণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। গুহার গভীর অভ্যন্তরে যেখানে কঙ্কালটি পাওয়া গেছে সেখানে এমনি এমনি গোছা গোছা ফুল হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে এমন মনে হয় না। এই রহস্যময় নিয়ানডারথাল মানুষ কারা? বিবর্তনের ধারা দিয়ে যাদের রহস্যভেদ করা যায় না?

Alan এবং Landsburg তাঁদের In search of Ancient Mysteries বইয়ে একটি অদ্ভুত মন্তব্য করেছেন :

'May be a colony of advanced beings lived on Earth for thousands of years during one of those dim interglacial stages. and then had to leave when the next Ice Age came to grind away all traces of the colony . * * * Degenerate descendants of the little colony of astronauts could have been the Neanderthals.'

বিখ্যাত ঐতিহাসিক Will Durant তাঁর Story of Civilization এ স্বীকার করেছেন : 'Primitive cultures were not necessarily the ancestors of our own : for all we know they may be the degenerate remnants of higher culture that decayed when human leadership moved in the wake of the receding ice.'

প্রস্তর ও মধ্য-প্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন ভারতেও পাওয়া গেছে। তামিলনাড়ুতে প্রস্তরযুগের পাথুরে অস্ত্র পাওয়া গেছে। বৃটিশ সরকারী অফিসার Bruce Foote প্রথম এই অস্ত্র আবিষ্কার করেন। কাশ্মীরের পীরপাঞ্জাল, সিন্ধু ও ঝিলম নদী বেষ্টিত পোটওয়ার সমতল ভূমিতে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বাসস্থান ছিল বলে জানা গেছে। এই পোটওয়ার সমতল ভূমির কেন্দ্রে অবস্থিত পাকিস্থানের বর্তমান রাজধানী ইসলামাবাদ। ১৯৩৫ সালে H. D. Terra এবং T. T. Patterson ইয়েল এবং কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে কাশ্মীর ও শোন নদীর উপত্যকায় ব্যাপক অনুসন্ধান চালান এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু নিদর্শন খুঁজে পান।

ভারতে এখনো পর্যন্ত অবশ্য কোন প্রাচীন মানুষের জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায় নি। কোন উল্লেখযোগ্য গুহা বা গুহাচিত্রও আবিষ্কৃত হয় নি ঠিকই, কিন্তু যে সব পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে সে-সবের সঙ্গে জিঞ্জি ও পিকিং-মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্রের যথেষ্ট মিল আছে।

যাই হোক, খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০০ বৎসর পূর্বে এই নিয়ানডারথাল মানুষরা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এর পরবর্তী কালের নিয়ানডারথাল মানুষদের কোন কঙ্কাল আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

এদিকে দশ লক্ষ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর বুকে কেটে গেছে চার চারটি তুষার-যুগ। এর মধ্যে শেষ তুষার-যুগ যাকে উর্ম (wurm) তুষাব যুগ বলা হয় তা শেষ হয় খ্রীষ্ট জন্মের ১৩,০০০ বৎসর পূর্বে। এর পূর্বে অর্থাৎ নিয়ানডারথাল মানুষেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সময় (৩৫,০০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ২০,০০০ খ্রীঃ পূঃ এর মধ্যে) আবির্ভাব হল ক্রো-ম্যাগনন মানুষের। এরা আবার নিয়ানডারথালদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ক্রো-ম্যাগনন মানুষই নাকি আমাদের পূর্ব-পুরুষ। এরা বেশ দীর্ঘকায়—পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি থেকে ছ' ফুট চার ইঞ্চি। এদের মগজের মাপ অবিশ্বাস্য রকমের বড়। যেখানে আমাদের মগজের মাপ প্রায় ১৪০০ ঘন সেন্টিমিটার সেখানে এদের মগজের মাপ হচ্ছে ১৫৯০ ঘন সেন্টিমিটার থেকে প্রায় ১৭১৫ ঘন সেন্টিমিটার।

ক্রো-ম্যাগনন মানুষেরা নিয়ানডারথালদের চেয়ে যথেষ্ট উন্নত ছিল। এরা হাড়, কাঠ, পাথর ও গজদন্তের ব্যবহার জানত। আগুনের ব্যবহার জানত। বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারত। প্রায় ৩০,০০০ বৎসরের পুরোনো হাড় ও পাথরের উপর বিভিন্ন ধরণের সাংকেতিক চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। অনেকে মনে করেন এগুলি এক ধরণের ক্যালেণ্ডার। এই ক্রো-ম্যাগনন মানুষেরা যে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি হত তা জানত এবং সেইগুলিরই এই সব হাড় ও পাথরের ক্যালেণ্ডারে লিখে রাখত। এদের ছবি আঁকার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। স্পেন, ফ্রান্স, ইটালী ও উরাল পর্বতে একশোরও বেশী গুহার পাথুরে দেওয়ালে এই সব রঙীন ছবি ও খোদাই আবিষ্কৃত হয়েছে।

নিয়ানডারথালদের মতো ক্রো-ম্যাগনন মানুষদেরও গুহা-মানুষ বলা হয়। সম্ভবত এদের সভ্যতা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল; কিন্তু তুষার-যুগের আক্রমণে সে-সব ছেড়ে এরা সুবিধাজনক গুহাগুলিতে

আশ্রয় নেয়। আর সেখানেই আমরা তাদের কঙ্কাল ও ব্যবহৃত সামগ্রী খুঁজে পেয়েছি বলে এদের গুহা-মানুষ বলছি।

প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী আকস্মিক ভাবে কিছুই ঘটে না। মানুষের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এ রকম ঘটল কেন? যেখানে দশ লক্ষ বৎসরে জিঞ্জি ও পিকিং-মানুষের মধ্যে বিরাট কোন দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটল না সেখানে নিয়ানডারথালদের সঙ্গে ক্রো-ম্যাগননদের মধ্যে এ রকম বিরাট পার্থক্যের কারণ কি?

ক্রো-ম্যাগননরা ছবি আঁকতে পারত। ছবি আঁকা অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি কাজ। এই কাজ করার জন্য চাই উন্নত বুদ্ধি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা এ রকম মানসিক উন্নতি তো এক দিনে ঘটে না। বহু লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তবেই মগজের উন্নতি ঘটে, জ্ঞানের প্রসার হয়। কিন্তু ক্রো-ম্যাগননদের ক্ষেত্রে সে রকম কোন সাক্ষ্য প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় না। এরা বিরাট মগজ ও উন্নত বুদ্ধি নিয়ে হঠাৎই যেন পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিল। এবং আবির্ভাবের পরেও তারা খুব একটা পরিবর্তিত হয় নি। আজকের দিনের মানুষ: যারা পরমাণু নিয়ে গবেষণা করছেন, মহাকাশচারী: যারা শব্দের চেয়েও দ্রুত গতিতে মহাশূন্যে ছুটে যাচ্ছেন, তাদের দৈহিক চেহারা ও মগজের পরিমাণ সেই বিশ হাজার বৎসরের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের থেকে এতটুকু বেশী না।

এই ক্রো-ম্যাগনন মানুষরা তাহলে কি অন্য কোন গ্রহে তাদের বিবর্তন ঘটিয়েছিল? তারা কি তাহলে ভিনগ্রহ থেকে এসেছিল?

যাই হোক, প্রায় ৩৫,০০০ বৎসর সংগ্রামের পর মানুষ তার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ৮০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে অর্থাৎ প্রায় ১০,০০০ বৎসর পূর্বে মানুষ প্রথম তার শিকার জীবন থেকে সরে আসতে শুরু করল। খাদ্য সংগ্রহ করা থেকে খাদ্য উৎপাদনে মন দিল। গম, যব, শব্জীর চাষ শিখল। কুকুরকে গুহাজীবন থেকেই সে পোষ মানিয়েছে, এবার সে ছাগল, ভেড়া, গরু পালন করতে শিখল। তার যাযাবরী বৃত্তির শেষ হল, শুরু হল গ্রাম্য জীবন।

পৃথিবীর প্রথম সভ্যতা এত রহস্যময় কেন ?

দশ হাজার বৎসর পূর্বে শিকার জীবন ছেড়ে মানুষ কৃষিজীবি হল। আর পাঁচ হাজার বৎসব পরে সে গড়ে তুলল এক বিস্ময়কর সভ্যতা। পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে খোঁজ পাওয়া গেছে এই সভ্যতার। এই সভ্যতার নাম ছিল ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। পরে গ্রীকরা ব্যাবিলনের নাম দেয় মেসোপটেমিয়া এবং তাই থেকে এর নাম হল মেসোপটেমিয়া সভ্যতা। বর্তমানে একেই আমরা বলি সুমের-সভ্যতা।

সুমের-সভ্যতাকেই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আদি সভ্যতা বলে মনে করেন। আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী Carl Sagan বলেন: 'The Sumerian civilization is generally accepted as one of the first civilization on Earth'.

প্রাচীন সুমেরীয়রা লিখতে পারতেন। মাটির তৈরি কাঁচা ইটের উপর আঁচড় কেটে লিখতেন এঁরা। এই লিপি বাণমুখ বা কিউনিফর্ম লিপি নামে পরিচিত।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে এরা জ্ঞানী ছিলেন। কাঁচা ইটের ঘরবাড়ি তৈরি করতেন। সব বড় বড শহরে অসংখ্য দেব মন্দির ছিল। দেব মন্দিরগুলি খুব উঁচু করে তৈরি করা হত। এগুলিও ইট দিয়ে তৈরি। 'জিগ্‌গুরাট' নামে এক রকম মন্দির ছিল যা চৌকো ভিত্তির উপর সাধারণত ধাপে ধাপে সাততলা পর্যন্ত উঁচু করে তৈরি করা হত। এবং এর এক একটি তলা এক এক রকম রঙ করা হত। সব থেকে উপরের তলায় থাকত একটি গম্বুজ। এখানে বসে পুরোহিতরা গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। এগুলি ছিল এক ধরণের মানমন্দির। পুরোহিতদের ছিল অসীম ক্ষমতা। রাজ্য শাসনও তারাই করতেন।

পারদর্শী লোকেরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারতেন। নৈসর্গিক ঘটনা থেকে কাজকর্মের শুভাশুভ বিচার করতে পারতেন। যজ্ঞীয় পশুর দেহের অংশ পরীক্ষা করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন। তার জন্য অবশ্য খুঁটিনাটি বহু রকম নিয়ম-কানুন ছিল।

মেসোপটেমিয়ার নাইনেভ-এ ইটের উপর লেখা বিরাট একটি গ্রন্থাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারে ঐতিহাসিক ঘটনা, রাজকীয় আদেশ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, আইন, গল্প ও অন্যান্য অনেক কিছু লেখা আছে কিউনিফর্ম লিপিতে। এই ভাষার পাঠোদ্ধার করে গবেষকরা বহু কিছু জানতে পেরেছেন।

পৃথিবীব দেবতা ইয়া, তিনি সব দুষ্টাত্মাদের দমন করে মানুষকে রক্ষা করেন। ইয়ার পুত্র হচ্ছেন মেরিডুগ। এর কাজ হচ্ছে অসহায় মানুষদের সাহায্যের জন্য বাবার কাছে ওকালতি করা। এ ছাড়া আছেন আকাশের দেবতা অনু, সাগরের দেবতা ইয়া, ইয়ার পুত্র এনলিন বা বেল হচ্ছেন পৃথিবীর দেবতা, চন্দ্র দেবতা সিন, সূর্য দেবতা শ্যামাশ এবং বায়ু দেবতা রামান। এ ছাড়াও কয়েকজন বড় দেবতা ছিলেন। শনিগ্রহের দেবতা নিণ্ডার বা নিনেব। বৃহস্পতির দেবতা মার্ডুক। মঙ্গলের দেবতা নার্গল, বুধগ্রহের দেবতা নেবো এবং শুক্রগ্রহের জনপ্রিয় দেবী হচ্ছেন ইস্তার।

স্তোত্র ও প্রার্থনা ছাড়া আরও অনেক কিছু আছে এই সব ইটের পুথিতে। দুটি মহাকাব্যেরও সন্ধান পাওয়া গেছে এই পুঁথিতে। প্রথম মহাকাব্যের একটি অংশে বলা হয়েছে যে প্রথমে স্বর্গ মর্ত্য কিছুই ছিল না। অপ্‌সু (অন্ধকার) মুম্মু টিয়ামাট (ক্ষুদ্ধ সাগর) থেকে জগতের সৃষ্টি হয়। প্রথমে জন্ম হয় দেবতাদের। অন্য একটি অংশ থেকে জানা যায় কেমন করে দেবতারা মানুষ ও জীবজন্তু সৃষ্টি করলেন। কতকগুলি ভাঙা ইটে সম্ভবত মানুষ সৃষ্টি, মানুষের অবাধ্যতা ও তার পতনের কথা লেখা আছে। অন্য আর একটি অংশ থেকে জানা যায় যে চারিদিকে যখন অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলা ছিল তখন তার মধ্যে নানা রকম অদ্ভুত প্রাণী বিচরণ করত। বেল আকাশ ও

পৃথিবীকে আলাদা করে অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলা দূর করেন ও আলোর জন্ম দেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই সব কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীরাও ধ্বংস হয়ে যায়। আলোর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অন্ধকার ও ক্ষুব্ধ-সাগর দৈত্যদের মৃত্যু হল না। তারা দেবতাদের ও দেবতাদের সৃষ্ট প্রাণীদের মহাশত্রু হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে দৈত্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। বেল, মেরিডুগ যুদ্ধে গেলেন। ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত ও শঙ্কিত হয়ে দেব-দৈত্যের এই যুদ্ধ দেখতে লাগল। মেরিডুগ দৈত্যকে আঘাতের পর আঘাতে কাবু করে ফেলে অবশেষে তাকে বেঁধে ফেললেন। যুদ্ধ শেষ হল। দেবতারা জয়ী হলেন—দৈত্যরা পরাজিত।

দ্বিতীয় মহাকাব্যটি 'গিলগামেস' নামে পরিচিত। মহাকাব্যটি বিরাট—বারো খণ্ডে প্রায় ৩০০০ লাইনে সম্পূর্ণ। এক একটি ইটে এক একটি খণ্ড লিখিত। এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ইরেক রাজ্যের রাজা গিলগামেস-এর কীর্তি কাহিনী। কবে এই মহাকাব্য রচিত হয় তা বলা মুশকিল তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই মহাকাব্যটি প্রায় ৪৫০০ বৎসরের পুরাতন। সাহিত্য ও গল্প কাহিনীর দিক থেকে এই মহাকাব্যটি অন্যতম প্রাচীন কীর্তি এবং পৃথিবীর অতীত সাহিত্য সমৃদ্ধির অন্যতম নিদর্শন।

এই মহাকাব্যের একাদশ খণ্ডে আছে একটি জলপ্লাবনের গল্প।

এই জলপ্লাবনের কাহিনী ও নতুন সৃষ্টি আরম্ভের গল্প। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের পুরাণ ও প্রাচীন লোকগাথায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: মহাভারতের মনুর গল্প, বাইবেলের নোয়ার গল্প। ইরাণ, গ্রীস, রোম অ্যাজটেক, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি দেশের প্রাচীন মানুষেরা এই প্লাবনের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

এখানে রাজা উত্তা নাপিসটিম গিলগামেসকে গল্পটি বলছেন। এক সময় দেবতারা মানুষের পাপের জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ঠিক করলেন জলপ্লাবনে সমস্ত প্রাণীজগৎ ধ্বংস করবেন। দেবতা ইয়া স্বপ্নে উত্তা নাপিসটিমকে সব কথা জানিয়ে দিলেন। বললেন, একটা জাহাজ

তৈরি করে তাতে বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, ধন-সামগ্রী ও পশু-পাখি নিয়ে উতা যেন আশ্রয় নেন। উতা স্বপ্নাদেশ শুনে সেই মতো কাজ করলেন। তারপর আরম্ভ হল ভয়ঙ্কর দুর্যোগ। ঝড়, বৃষ্টি, প্রলয়। দুর্যোগ চলল ছ'দিন ছ'রাত। এই মহাপ্রলয় দেখে দেবতারাও ভয় পেয়ে গেলেন। সমস্ত পৃথিবী জলে ডুবে গেল।

সাত দিনের দিন আস্তে আস্তে ঝড়বৃষ্টি কমে এলো। সমুদ্র শান্ত হল। এর পর এক জায়গায় জাহাজটা আটকে গেল। উতা একটি ঘুঘু পাখিকে পাঠালেন ডাঙার খবর আনতে। সে কোন শুকনো জায়গা দেখতে না পেয়ে আবার জাহাজে ফিরে এলো। এর পর উতা একটি সোয়ালো পাখি পাঠালেন, সেও ফিরে এলো। অবশেষে একটি দাঁড়-কাককে পাঠানো হল। দাঁড়কাক জল কমে আসছে দেখে জাহাজের কাছে ফিরে এসে একটি চক্কর দিয়ে আবার উড়ে চলে গেল। উতা বুঝলেন ডাঙা জেগেছে। তিনি জাহাজের প্রাণীদের একে একে বের করে চারিদিকে ছেড়ে দিলেন। তারপর পাহাড়ের উঁচু শিখরে গিয়ে তিনি দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজো দিলেন। তখন ইস্তার দেবী এসে জানালেন যে দেবতা বেলের রাগের জন্য এই মহাপ্রলয় ঘটেছে।

বেল যখন জানতে পারলেন যে পৃথিবীর সব মানুষ ধ্বংস হয় নি তখন তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। নিনিব দেব তখন তাকে বোঝালেন যে এ ভাবে সম্পূর্ণ সৃষ্টি ধ্বংস না করে মানুষের পাপের শাস্তি হিসেবে মড়ক দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টি করা যেতে পারে। বেল তখন শান্ত হলেন। উতাকে বর দিলেন উতা ও উতার স্ত্রী দেবত্ব পাবেন ও অমরাবতীতে বাস করবেন।

এই উন্নত সভ্যতার সৃষ্টিকারী সুমেরীয়দের পূর্ব ইতিহাস কিন্তু অজানা। কোথা থেকে এরা এসেছিলেন, কি ভাবে এ রকম একটা সভ্যতার জন্ম হল সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্যই আমরা জানি না। প্রাচীন গুহা মানুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে এরা সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন সে রকম কোন প্রমাণই বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেন নি। তাহলে কি এরা অন্য কোথাও থেকে ব্যাবিলনে

এসেছিলেন ? ব্যাবিলনের কিম্বদন্তী বলে যে ওয়ানেস বা ইয়া-হান নামে এক সর্বশাস্ত্রবিদ দেবতা পারস্য উপসাগর থেকে উঠে আসেন। তিনিই অসভ্য ব্যাবিলনবাসীদের লেখাপড়া, কলা-বিজ্ঞান, আইন-কানুন, কৃষিবিদ্যা, ধর্ম সবই শেখান। সেই দেবতার চেহারা ছিল খুব অদ্ভুত। তার সারা দেহটি ছিল মাছের মতো, কিন্তু মাথা ও হাত পা ছিল মানুষের মতো। মানুষের মতোই কথাবর্তা বলতেন তিনি। পরবর্তী কালে এই রকম আরও বহু দেবতা নাকি পারস্য উপসাগর থেকে উঠে এসেছিলেন ব্যাবিলনে। এই কিম্বদন্তীর মধ্যে কি কোন সত্য লুকিয়ে আছে ? পারস্য উপসাগর পেরিয়ে কোন সভ্য জাতি ব্যাবিলনে এসে কি সুমেরীয়দের সভ্য করে তুলেছিলেন ? অন্যথায় অসভ্য ব্যাবিলনবাসীরা হঠাৎ প্রস্তর যুগ থেকে লাফ দিয়ে একেবারে সভ্য যুগে এসে পৌঁছুল কি করে ?

মেসোপটেমিয়ার ইরিডু শহরের কাছে একটি পাহাড়ে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে। স্থানীয় লোকেরা জায়গাটিকে বলে 'আল-উবায়েদ'। এই অজানা জাতি তাদের অজানা ভাষা নিয়ে 'উবায়েদ' নামে পরিচিত। প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্বে ইরিডু পারস্য উপসাগরের মুখে একটি বন্দর ছিল। পরে ইরিডুর কাছ থেকে সমুদ্র দূরে সরে যায়। এই ইরিডু থেকে সভ্যতা টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিসের উজান বেয়ে এগিয়ে যায় উত্তর দিকে উরুক, উর, লাগাশ ও অন্যান্য শহরে। পণ্ডিতেরা মনে করেন একটি সভ্য জাতি তাদের উন্নত সভ্যতা নিয়ে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় হাজির হয়েছিল। এর পরই খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ অব্দে এখানে এক পরিপূর্ণ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

ইরিডুর কিম্বদন্তীর ইয়া, যিনি ব্যাবিলনবাসীদের সভ্য করে তুলেছিলেন তিনি আসলে ব্যাবিলনবাসী নন। তিনি এসেছিলেন উবায়েদ থেকে। পুরাতাত্ত্বিক ভিত্তিতে এ কথা আজ প্রমাণিত হয়েছে যে ইরিডুতেই প্রথম মেসোপটেমিয়া সভ্যতার জন্ম হয়। এই অজানা উবায়েদরা কারা ? সুমেরীয় পুঁথি থেকে উবায়েদ শব্দটি উদ্ধার করা ও আল-উবায়েদ নামে একটি জায়গা আবিষ্কৃত হওয়ার পর

আরো প্রায় কুড়িটি উবায়েদ শব্দ ও প্রায় কুড়িটি জায়গার নাম পাওয়া গেছে যেগুলো এসেছে উবায়েদ থেকে। অধিকাংশ উবায়েদ শব্দের সঙ্গে দ্রাবিড় শব্দের যথেষ্ট মিল রয়েছে বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা।

আবার টাইগ্রীস নদীর উত্তরে ইরাণের খুজিস্থানের নাম ছিল এক সময়ে এলাম। প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বে এখানে একটি নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এদের লিখিত ভাষাও ছিল। এই এলাম-সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়া বা সুমের-সভ্যতার মিল আছে। এলামদের ভাষার সঙ্গে আবার দ্রাবিড় ভাষার মিল রয়েছে। বিখ্যাত সোভিয়েত ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ I. Dyakonov তাঁর Languages of Ancient Asia Minor বইয়ে এই মত প্রকাশ করেছেন।

ভাষাতত্ত্ববিদরা প্রাচীন সুমেরীয় পুঁথি পড়তে গিয়ে এমন কিছু শব্দ দেখতে পান, সুমেরীয় পদ্ধতিতে যেগুলিব অর্থোদ্ধার করা যায় না। জায়গাব নাম বিশ্লেষণ করলেও এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দ্রাবিড় ভাষা-ভাষীরাই টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীব মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে সুমেরীয়দের আগে থেকেই বসবাস করতেন। কিউনিফর্ম পুঁথি অনুযায়ী টাইগ্রিস নদীব নাম ইডিগ্লাট ও ইউক্রেটিস নদীর নাম হচ্ছে বুরানন। প্রাচীন শহগুরলির নাম উরুক, উর, নিপ্পুর, লাগাশ, কিশ, ইরিডু ইত্যাদি—এগুলি সুমেরীয় নাম নয় বলেই ভাষাবিজ্ঞানীদের মত। তারা মনে করেন এগুলি প্রাচীন দ্রাবিড ভাষার নাম। প্রাচীন সুমেরীয় ও উবায়েদ শব্দের সঙ্গে প্রাচীন দ্রাবিড় শব্দের এই মিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সুমের-সভ্যতার সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা—সিন্ধু-সভ্যতার তো আবার অনেক মিল। সুমেরীয় সভ্যতার উর শহরের পোড়া ইটের বাড়ি-ঘর দেখে বৃটিশ পুরাতত্ত্ববিদ John Marshall মন্তব্য করেছিলেন যে পোড়া ইটের বাড়ি সুমেরীয়-সভ্যতার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না; বরং এগুলির সঙ্গে মহেঞ্জোদড়োর শেষ পর্যায়ের তৈরি বাড়িগুলির খুব মিল আছে। আবার সিন্ধু-সভ্যতার ভাষাও প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মহেঞ্জোদড়োবাসীরাই কি রামায়ণের গন্ধর্বরা ?

ভারতে আর্যরা আসবার পূর্বেই যে এখানে একটি সুসভ্য জাতি বাস করত সে কথা কিন্তু আজ থেকে ৬০ বছর আগে পৃথিবীর মানুষ জানত না। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বুঝতে পারেন যে সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জোদড়োর মাটি খুঁড়লে একটি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে। মাটি খুঁড়ে সত্যি সত্যি সেই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেল, বয়স যার প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর। এখানে আধুনিক প্যারিস বা ওয়াশিংটনের মতো সুপরিকল্পিত ভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল নগর-সভ্যতা।

ভারতের অন্যান্য পুরাকীর্তির সঙ্গে এর কিন্তু নাড়ীর যোগ খুঁজে পাওয়া গেল না। যাই হোক, এর পর পাঞ্জাবের ইরাবতী নদীর তীরে আবিষ্কৃত হল হরাপ্পা। শুনলে অবাক হতে হয় যে হরাপ্পার ভগ্নস্তূপের ইট দিয়ে ১৮৫৬ সালে ই. আই. আর কোম্পানির রেললাইন পাতা হয়। লাহোর থেকে করাচী পর্যন্ত রেললাইন বসানোর জন্য ইজারা নিয়েছিলেন দুই ভাই—জন এবং উইলিয়ম। উইলিয়ামের দায়িত্ব ছিল উত্তর দিকের রেললাইন বসানোর। ইটের খোঁজ করতে গিয়ে উইলিয়ামের নজরে পড়ল একটি শহরের ভগ্নস্তূপ। সেই ইট এসে পড়তে লাগল রেললাইনে। একটি প্রাচীন সভ্যতার পুবাকীর্তির বিরাট একটি অংশ অবিবেচনার ফলে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

মহেঞ্জোদড়ো থেকে হরাপ্পার দূরত্ব ৪০০ মাইল কিন্তু এই শহর দুটি প্রায় একই মাপের এবং এদের গঠন বৈশিষ্টও প্রায় একই। সিন্ধু-সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল বহু দূর অবধি। পরবর্তী কালের আবিষ্কার এ কথা প্রমাণ করেছে। সরস্বতী নদীর তীরে রূপের (আধুনিক সিমলার কাছে), রাজস্থানের কালিবঙ্গান, গুজরাটের লোথাল প্রভৃতি স্থানে ১০০টি শহর ও বাসস্থানের পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এ পর্যন্ত।

মহেঞ্জোদড়ো খুবই সমৃদ্ধ শহর ছিল। আগেই বলা হয়েছে যারা এই শহর তৈরি করেছিলেন তারা নগর পরিকল্পনা ও স্থপতিবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। নগরের বাড়িগুলি শ্রীসম্পন্ন ছিল। সব বাড়িই পোড়া ইট দিয়ে তৈরি হত। ধনীদের বাড়ি বড় ও কারুকার্যময় হত। বাড়িগুলি দোতলা ও তিনতলা—ওপরতলায় ওঠার জন্য থাকত সিঁড়ি। ভিতর বাড়িতে থাকত উঠান। উঠানে বাঁধানো কূয়া থাকত। অনেক সময় প্রতিবেশীদের সুবিধার জন্য উঠানের একপাশে আলাদা দেওয়াল দেওয়া কূয়া থাকত।

নগরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাথরে বাঁধানো চওড়া রাস্তা ছিল। প্রতিটি বড় রাস্তা থেকে বেরুনো ছোট বড় বহু গলি ছিল। এই গলির দু'পাশের বাড়িগুলি ছিল দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান। নগরে বহু মন্দির ছিল। ছিল সাধারণ স্নানাগার। স্নানাগারটির চতুর্দিকে প্রশস্ত ফাঁকা চত্বর এবং সেই চত্বর ঘিরে ছিল দোতলা বাড়ি। বাড়িটিতে বহু ছোট ছোট ঘর ছিল। মহেঞ্জোদড়োবাসীরা এই সব ঘরে খেলাধুলো বা গল্পগুজব করতেন অনুমিত হয়।

স্নানাগারটির জল যাতে চুঁইয়ে না বেরিয়ে যায় সেজন্য এঁটেল মাটির প্রলেপের উপর শিলাজতুর (আলকাতরার মতো জিনিস) প্রলেপ দেওয়া থাকত। স্নানাগারের নোংরা জল বের করে দেওয়ার জন্য ছিল নর্দমা। স্নানাগারে পরিষ্কার জল ঢালার জন্য পাশেই কূয়া ছিল। শীতকালে লোকে যাতে গরম জলে স্নান করতে পারে সেই জন্য স্নানাগারের পাশে জল গরম করবার ব্যবস্থা ছিল।

রাস্তার দু'পাশে ইট-বাধানো নর্দমা ছিল। শহরের নোংরা জল এই সব নর্দমা দিয়ে শহরের বাইরে গিয়ে পড়ত। নর্দমাগুলি ইট বা পাথর দিয়ে ঢাকা থাকত। (অথচ এই বিংশ শতাব্দীতে কলকাতার মতো শহরের বুকে খোলা নর্দমা আছে!) সবচেয়ে প্রশস্ত রাজপথের নীচেকার নর্দমাটি এত বড় ছিল যে এর মধ্যে দিয়ে অনায়াসে লোক চলাচল করতে পারত। শহরে ছিল একটি দুর্গ ও একটি শস্যাগার। খাজনা হিসেবে শস্য নেওয়া হত এবং এই শস্যাগারে জমা রাখা হত।

মহেঞ্জোদড়োবাসীরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করতেন। শিব ছিল এদের প্রধান দেবতা। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শিবের লিঙ্গমূর্তি পাওয়া গেছে। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন দ্রাবিড়দের মধ্যেও শিবপূজার প্রচলন ছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে এদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। গণিতেও যথেষ্ট উন্নত ছিলেন এরা। আর্যরা এ দেশে আসবার বহু আগে থেকেই সিন্ধু বণিকরা দশমিকের ব্যবহার জানতেন বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

এদের দেহের রঙ ছিল তাম্রাভ। চেহারা ছিল দীর্ঘকায় এবং মুখে দাড়ি। শিল্পকলার দিকেও এদের যথেষ্ট ঝোঁক ছিল। নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ এবং খেলাধূলোর দিকেও এদের নজর ছিল।

স্ত্রী পুরুষ সকলেই গহনা পরতে ভালোবাসতেন। হার, তাগা, বালা, আংটি ইত্যাদি বহু রকমের গহনা মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে। বড়লোকদের গহনা তৈরি হত সোনা, রূপা ও গজদন্ত প্রভৃতি বহুমূল্য উপকরণ দিয়ে। আর গরীবরা ঝিনুক, পাথর, হাড়, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির অলঙ্কারেই খুশি থাকতেন। এরা সিন্ধুনদে ছিপ ফেলে মাছ ধরতেন। পাশা খেলার খুব আদর ছিল। পাশার যে সব ঘুটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা এখনকার পাশার ঘুটির মতো। বন্য জন্তু শিকার, যুদ্ধ বা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হত তীর-ধনুক, তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি বর্শা, কুঠার, গদা ইত্যাদি। লৌহনির্মিত জিনিসের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে এ থেকে জোর করে বলা যায় না যে মহেঞ্জোদড়োবাসীরা লোহার ব্যবহার জানতেন না।

ঘর গেরস্থালীর জন্য যে সব জিনিসপত্র আমরা আজকাল ব্যবহার করি সে সবই প্রায় মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া গেছে। যেমন, থালা, ঘটি, বাটি, শিল-নোড়া, যাঁতা, কলসী, ঘট ইত্যাদি। বেশীর ভাগই পোড়া মাটি বা পাথরের তৈরি। পোড়ামাটির পাত্রগুলি নকশাকাটা ও রং করা। ছুঁচ, চিরুণী এ সব হাড় বা হাতির দাঁতের তৈরি। পোড়ামাটির তৈরি বহু শীলমোহর ও খেলনা পাওয়া গেছে। কোন কোন খেলনা আবার চাকা লাগানো। ফলে মহেঞ্জোদড়োবাসীরা যে চাকা

ব্যবহার জানতেন তা প্রমাণিত। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে সিন্ধুবাসীরা তুলোয় বোনা কাপড় পরতেন। তুলো থেকে কাপড় তৈরি করা যথেষ্ট উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক, কারণ ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য জায়গায় দু'হাজার বৎসর পূর্বেও মানুষ চামড়ার বা ভেড়ার লোমে তৈরি মোটা কাপড় পরত।

নৌ-চালনা ও বড় বড় পালতোলা জাহাজ তৈরিতেও দক্ষ ছিলেন মহেঞ্জোদড়োবাসীরা। আরব সাগরের বুকের উপর দিয়ে পারস্য উপসাগর পেরিয়ে এরা সুমেরীয়দের সঙ্গে বাণিজ্য করতেন। গুজরাটের লোথাল ছিল একটি সমৃদ্ধ বন্দর।

মহেঞ্জোদড়োবাসীদের লিখিত ভাষা ছিল। এই লিপি চিত্রলেখ। বিভিন্ন শীলমোহর থেকে এই লিপি পাওয়া গেছে। এ ভাষার পাঠোদ্ধার অবশ্য এখনো সম্ভব হয় নি।

একদল সোভিয়েত বিজ্ঞানী ইলেক্‌ট্রনিক কমপিউটারের সাহায্যে মহেঞ্জোদড়ো ও হরাপ্পার লিপির ভাষা পৃথিবীর কোন্ ভাষার অন্তর্গত তা আবিষ্কার করার এক প্রচেষ্টা চালান। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত এদের প্রথম প্রতিবেদনে জানা যায় যে এই ভাষার সঙ্গে প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষার যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন বার পাঁচেক মহেঞ্জোদড়োয় বিরাট বন্যা বা প্লাবন হয়েছে। বন্যার পর আবার ধীরে ধীরে মহেঞ্জোদড়ো জেগে উঠেছে। প্রতি বন্যার পর অন্তত ১০০ বছর কাদার মধ্যে ডুবে থাকত মহেঞ্জোদড়ো। আবার কি করে যে সে জেগে উঠত সে এক রহস্য। সম্প্রতি দশ মিটার উঁচু ও কুড়ি মিটার চওড়া একটি বাঁধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বাঁধের সাহায্যে মহেঞ্জোদড়োবাসীরা সিন্ধুনদকে বেঁধে হয়তো জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতেন।

চৌকো মতো হাতির দাঁতের একটি টুকরো মহেঞ্জোদড়ো থেকে পাওয়া গেছে। দৈর্ঘ্যে এটি ১০·২ সেঃমিঃ এবং ব্যাস হচ্ছে ০·৬ সেঃমিঃ। এর তিন দিকে দাগ কাটা। Fairservice এটিকে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ওটি একটি সময়পঞ্জী বা ক্যালেণ্ডার।

মানব সভ্যতার উষাকালে এ রকম একটি সুসভ্য জাতির সন্ধান পেয়ে আমরা বিস্মিত হই। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মহেঞ্জোদড়ো-বাসীরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নন। এদের আদিপুরুষ অন্য কোন জায়গা থেকে এখানে এসে এই সভ্যতার পত্তন করেন। এই সভ্যতা যে রকম রহস্যময় ভাবে গড়ে উঠেছিল সেই রকম রহস্যময় ভাবেই ধ্বংস হয়ে যায়। মহেঞ্জোদড়োর সৃষ্টি ও ধ্বংসের ইতিহাস সম্পূর্ণ রহস্যের কুহেলীতে ঢাকা।

Sir Mortimer Wheeler-এর ধারণা যে আর্যদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে এই সভ্যতা সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। একটি গলিতে মহেঞ্জোদড়োবাসীরা মুখোমুখি যুদ্ধ করেছেন আর্যদের সঙ্গে। তারপর অসহায়ভাবে মারা পড়েছেন। মাটি খুঁড়ে একটি গলিতে পাওয়া গেছে তেরটি নরকঙ্কাল। Mack অনুমান করেন একটি গজদন্ত-শিল্পী পরিবার পালাতে গিয়ে প্রাণ দেন বিজয়ীদের নিষ্ঠুর অস্ত্রাঘাতে। সেই বিয়োগান্ত নাটকের সাক্ষী হয়ে রয়েছে নটি কঙ্কাল এবং দুটি হাতির দাঁত। এই নটি কঙ্কালের মধ্যে পাঁচটিই শিশুর কঙ্কাল।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে উল্লেখ আছে যে সিন্ধুনদের তীরে গান্ধর্ব-সভ্যতা গড়ে ওঠে। এরা শৌর্যে-বীর্যে যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছিলেন।

ভরতের মামা কেকয়রাজ যুধাজিৎ পুরোহিত অঙ্গিরার ছেলে ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যকে দূত হিসেবে পাঠালেন রামের কাছে। গার্গ্য রামকে গিয়ে বললেন যে তোমার মামা বলে পাঠিয়েছেন, 'সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বে যে ফলমূলশোভিত রমণীয় গন্ধর্ব্বদেশ আছে, তিন কোটি যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ মহাবলবান শৈলূষ * তনয় গন্ধর্ব্ব সর্বদা সশস্ত্র হইয়া তাহা রক্ষা করিয়া থাকে।

* এই গন্ধর্বরাজ শৈলূষকে আমরা ভারত মহাসাগরে একটি দ্বীপ (ঋষভ) এর রাজা রূপে দেখি। ঋষভ দ্বীপ থেকে এখানে এসে তার ছেলের বা বংশধররা সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এ কথার প্রমাণ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাব।

মহাবাহো! তুমি সেই গন্ধর্ব্বদিগকে পরাস্ত করিয়া গন্ধর্ব্বদেশ তোমার সুশাসিত সাম্রাজ্যের অধীন কর। রাম! আমি তোমাকে মন্দ কথা বলিতেছি না। সেই পরম রমণীয় গন্ধর্ব্বদেশ জয় করা অন্যেব অসাধ্য; তুমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাহা জয় করিতে পার। আমাদের একান্ত ইচ্ছা তুমি তাহা জয় কর।'

রাম রাজি হয়ে ভরতের দুই ছেলে তক্ষ ও পুষ্কলকে ভরতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। ভরত মামা যুধাজিতের সঙ্গে প্রচুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে গন্ধর্ব্বদেশে গেলেন। তখন 'সেই রাজ্যের মহাবীর্য্যশালী গন্ধর্ব্বগণ ভরতের আগমণ সংবাদ শ্রবণে সমরাভিলাষী হইয়া চারিদিক হইতে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। পরে সপ্তাহব্যাপী মহাভয়ঙ্কর তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইলেও সেই যুদ্ধে কোন পক্ষেরই জয়লাভ হইল না। সেই যুদ্ধে চারিদিকে খড়্গ শক্তি এবং ধনুকরূপ গ্রাহবিশিষ্ট নরদেহ বাহিনী রক্তনদী সকল বহিল। পরে রামানুজ ভরত ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্বগণের উপর সংবর্ত্ত নামক ভীষণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে ক্ষণকালের মধ্যে তিন কোটি গন্ধর্ব্ব সেই কালপাশদ্বারা আবদ্ধ এবং বিদারিত হইল। মহাবলবান গন্ধর্ব্বগণ নিমেষমধ্যে সেই কালপাশে নিহত হইয়া গেল দেখিয়া দেবতারাও বিস্মিত হইলেন।'

ঐতিহাসিকরাও মহেঞ্জোদড়োর শেষ মুহূর্তের ঠিক এই একই রকমের একটা ছবি কল্পনা করেন।

হয়তো হাজার হাজার দ্রুতগামী অশ্বারোহী তীরবেগে ধেয়ে এসেছিল নগরের দিকে। সেই আর্য অশ্বারোহীদের পিঙ্গল চুল পিছনে সাপের ফণার মতো দুলছিল। নীল চোখ রক্তের লালসায় লাল হয়ে উঠেছিল। খাঁড়ার মতো লম্বা নাক ফুলে ফুলে উঠেছিল উত্তেজনায়। অশ্বারোহীদের হাতে উন্মুক্ত তামার তরোয়াল, উদ্যত কুঠার সূর্যের আলোয় ঝল্‌সে উঠছিল। জলতরঙ্গের মতো সেই অশ্বারোহী বাহিনী নগরে ঝটিকার মতো ঢুকে পড়েছিল। পিছনে আসছে আরো, যেন তরঙ্গের পর তরঙ্গ। নগরবাসীরা পাগলের মতো দলিত মথিত হয়ে ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। অশ্বের তীব্র হ্রেষারব, আহত

মানুষের আর্তনাদে কেঁপে উঠছে মহেঞ্জোদড়ো শহর। রাজপথ রক্তাক্ত হয়েছে নিহত মানুষের রক্তে।

দুটো দৃশ্যের মূল বক্তব্য এক নয় কি?

এর পর রামায়ণ বলছে 'সেই গন্ধর্ব্বগণ এইরূপে নিহত হইলে, কৈকেয়ীপুত্র ভরত সেই রমণীয় গন্ধর্ব্বদেশকে তক্ষশীলা* এবং পুষ্কলাবত নামক দুইটি পুরীতে বিভক্ত করিয়া কুমার তক্ষকে তক্ষশীলাতে এবং কুমার পুষ্কলকে পুষ্কলাবতে স্থাপন করিলেন।' অর্থাৎ এই ভাবে ভাগ করার আগে সিন্ধুনদের তীরবর্তী গন্ধর্বদেশ হয়তো একটাই ছিল। তক্ষশীলা কি আসলে হরাপ্পা? আর মহেঞ্জোদড়োই কি পুষ্কলাবত?

আর্যদের চোখে মহেঞ্জোদড়োবাসীরা ছিল অনার্য, রামায়ণে এদেরকেই বলা হয়েছে গন্ধর্ব। গন্ধর্ব আর রাক্ষসরা ছিল দুটি আলাদা গোষ্ঠি; কিন্তু এদের মধ্যে অবাধ বিয়ে-থা হত। যক্ষরা ছিল এ রকমই আর একটি গোষ্ঠি। রাক্ষস ও যক্ষরা একই সময়ে ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আমরা দেখি অগস্ত্য মুনি রামকে রাক্ষস ও যক্ষদের জন্মের ইতিহাস বলছেন:

'পুরাকালে ভূমির অধোভাগবর্ত্তী জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সলিল সম্ভব প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্মযোনি—স্বসৃষ্ট প্রাণীপুঞ্জের রক্ষার জন্য কতকগুলি প্রাণীর সৃষ্টি করেন। সেই প্রাণীগণ, ক্ষুধা, পিপাসা এবং ভয়ে প্রপীড়িত হইয়া, আমরা কি করিব? এইরূপ কহিতে কহিতে বিনীতভাবে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কাছে আসিল। ব্রহ্মা হাসি হাসি মুখে তাহাদিগকে বলিলেন, হে জীবগণ! তোমরা যত্ন সহকারে মানবগণকে রক্ষা কর। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুধার্ত্ত জীব রক্ষাম অর্থাৎ রক্ষা করিব এবং কতকগুলি অক্ষুধার্ত জীব রক্ষাম স্থলে যক্ষাম উচ্চারণ করিল। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,

রক্ষামেতি চ যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তে ভবন্তু বঃ।
যক্ষাম ইতি যৈরুক্তং যক্ষা এব ভবন্তু বঃ॥

* তক্ষশীলা বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডির বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যাহারা রক্ষাম বলিয়াছ, তাহারা রাক্ষস হও, আর যাহারা যক্ষাম বলিয়াছ তাহারা যক্ষ হও।'

আসলে দেবতা, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব, নাগ—এরা সবাই একই জায়গার উন্নত সভ্য বিভিন্ন গোষ্ঠী। যক্ষ কুবের ছিলেন রাক্ষস রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই। এরা খুব সম্ভব একই সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে আসেন। তারপর রাক্ষস এবং গন্ধর্বরা এখানে যথেষ্ট উন্নতি করতে থাকেন, সে তুলনায় দেবতারা বিশেষ সুবিধে কবে উঠতে পারেন না। এর পর রাক্ষসদের সঙ্গে যক্ষদের যুদ্ধ হয়। কুবের পরাজিত হয়ে সোজা হিমালয়ে পালিয়ে গিয়ে দেবতাদের পক্ষে যোগ দেন।

যাই হোক, অনার্য সভ্যতা ও রাক্ষস সভ্যতার মধ্যে কি কিছু মিল ছিল? মহেঞ্জোদড়োবাসীরা নগর-পরিকল্পনা ও নগর-স্থাপত্যে খুবই উন্নত ছিলেন তা আমরা দেখেছি। রাবণের লঙ্কানগবী কি রকম ছিল তা এবার একটু দেখা যেতে পারে।

রাক্ষসরা নগর-সভ্যতা ও পরিকল্পনায় কি রকম উন্নত ছিল ?

রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দেখি হনুমান সীতার খোঁজে সাগর পার হয়ে লঙ্কায় এলেন। লঙ্কার শোভা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন :

'তৎপরে বীর্য্যবান বায়ুপুত্র হনুমান, বিকীর্ণ কুসুমে সুশোভিত রাজপথ অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, আকাশমণ্ডল যেমন মেঘসমূহ দ্বারা শোভিত হয়, তদ্রূপ সেই সুচারু লঙ্কানগরী তূর্য্যধ্বনি মিশ্রিত হাস্যজনিত সুমধুর শব্দে মুখরিত, হীরক খচিত বাতায়ণ পরিবৃত, বজ্রাকার ও অঙ্কুশাকার গৃহরূপ মেঘমালায় বিরাজিতা হইয়া শোভা পাইতেছে।** ক্রমে তিনি প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগের গৃহমধ্যে স্বর্গলোকে অপ্সরাদিগের গীতের ন্যায় সুমধুর কণ্ঠাদি-স্থানত্রয় সমুত্থিত উচ্চ নীচ মধ্যমস্বরে গীত কামমোহিতা প্রমদাগণের গীতধ্বনি, কাঞ্চী এবং নূপুর শিঞ্জিত ও সোপানারোহণ শব্দ শুনিলেন ** মধ্যমকক্ষ্যামধ্যে রাজপথ আবরণপূর্ব্বক অবস্থিত সুমহৎ রাক্ষসদল দেখিতে দেখিতে মধ্যমকক্ষ্যায় ব্রতধারী রাবণের অনেক গুপ্তচর দেখিলেন। ** হনুমান পর্ব্বত শিখরে সন্নিবিষ্ট সুবর্ণ-নির্ম্মিত তোরণালঙ্কৃত সুবিখ্যাত রাবণের অন্তঃপুর দেখিতে লাগিলেন। সুচারু দ্বারে সুশোভিত সেই রাবণের অন্তঃপুর শ্বেতপদ্মশোভিত পরিখায় পরিবৃত, অতি উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, স্বর্গের ন্যায় সুন্দরাকৃত, সুমধুর শব্দে মুখরিত, সহস্র সহস্র মহাবীর রাক্ষসকর্ত্তৃক সাবধানে সুরক্ষিত, অশ্বগণের হ্রেষারবে প্রতিধ্বনিত, অদ্ভুতাকার অশ্ব ও শুভ্রবর্ণ মেঘবৎ সুসজ্জিত চতুর্দ্দংস্ট্র হস্তিসমূহে সমাবৃত, প্রমত্ত মৃগ, পক্ষী, অশ্বের ন্যায় সুন্দরাকৃতি হস্তি, রথ, যান ও বিমানরাজিদ্বারা সমাকুল ছিল। কপিবর হনুমান কনকনির্ম্মিত প্রাচীর পরিবেষ্টিত শিরোভাগে মহামূল্য-মুক্তামণিসমূহে বিভূষিত, বহুমূল্য কৃষ্ণবর্ণ অগুরুচন্দন-সৌরভে সুবাসিত, সুরক্ষিত রাবণের অন্তঃপুর দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।'

এর পর লঙ্কাকাণ্ডে হনূমান সীতার খোঁজ নিয়ে ফিরে আসতে রাম লঙ্কার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কি রকম তা জানতে চাইলেন। হনূমান তখন সবিস্তারে বলতে আরম্ভ করলেন:

'সেই লঙ্কাপুরীর মহাপরিখ বিশিষ্ট দৃঢ় কপাটবদ্ধ চারিটী বৃহৎ ও বিশাল দ্বার আছে। সেই দ্বারসকলের ভিতর হইতে বাণ ও শিলাদি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত দৃঢ় বৃহৎ ইষুপল যন্ত্রসমূহ স্থাপিত আছে। উহাদ্বারা সমাগত শত্রু সৈন্যগণ বহির্দ্দেশ হইতেই নিবারিত হয়। রাক্ষসবীরগণ তথায় লৌহসারময়ী শলা সকল এবং শতশত শাণিত শতঘ্নী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার সেই মণি, বিদ্রুম, বৈদূর্য্য ও মুক্তাদিযুক্ত স্বর্ণনির্ম্মিত প্রাচীর কেহই ধর্ষণ করিতে পারে না। তাহার চতুর্দ্দিকে মীনসেবিত ভীষণ নক্রসমাকুল ও বহুল শীতল জলপূর্ণ অগাধ পরিখা বিদ্যমান আছে। সেই লঙ্কাপুরীর চারিটী দ্বারে পরিখা পার হইবার নিমিত্ত চারিটী সুপ্রশস্ত সেতুপথ আছে। শত্রু সৈন্যগণ উপস্থিত হইলে সেই সেতুপথ সকল প্রাকারের উপরিভাগে স্থাপিত যন্ত্রাদিদ্বারা সুরক্ষিত হয়; এবং শত্রু সৈন্যগণও পরিখা মধ্যে বিতাড়িত হইয়া থাকে। সেই চারিটী পথের মধ্যে একটি সংক্রম—অকম্প্য, বলবান, দৃঢ় ও অতিবৃহৎ এবং কাঞ্চননির্ম্মিত অনেক স্তম্ভ ও বেদিকা-দ্বারা সুশোভিত। হে রামচন্দ্র! রাবণ যুদ্ধ-ইচ্ছুক হইয়া বলদর্শনের নিমিত্ত সতর্কিতভাবে অক্ষোভ্য-চিত্তে সেই সেতুপথের নিকটে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই নিরাবলম্ব ভয়াবহ লঙ্কাপুরীতে নাদেয়, পার্ব্বতীয়, বন্য ও কৃত্রিম, এই চারিরকম দুর্গ থাকায় দেবগণও তথায় যাইতে ভীত হন। রাঘব! লঙ্কাপুরী দুস্তর সাগরের পরপারস্থিতা। সেখানে যেসকল জলদুর্গ আছে তথায় নৌকা দ্বারা গমনাগমনের পথ নাই। এইজন্য এ পর্য্যন্ত কেহই সেই লঙ্কাপুরীর কোন বিশেষ সংবাদ অবগত নহে। পর্ব্বতের উপর অনেক দুর্গ নির্ম্মিত থাকায়, বাজি-বারণ সম্পূর্ণ অমরাবতীতুল্য সেই লঙ্কাপুরীকে দুর্জ্জয় বোধ হইল।'

এ থেকেই বোঝা যাবে লঙ্কানগরী রক্ষার ব্যবস্থা আধুনিক যুগের দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা থেকে কিছু কম ছিল না।

সিংহলই কি রাবণের লঙ্কা ?

আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি যে বর্তমানের সিংহল দ্বীপ হচ্ছে রাবণের রাজধানী স্বর্ণলঙ্কা। সিংহলের গাইডরা পর্যটকদের রাবণের গুহা, যেখানে অশোক কানন ছিল সেই জায়গা, হনুমান যে পাহাড়ের চুড়া ভেঙেছিলেন সেই পাহাড় ইত্যাদি দেখিয়ে থাকে। সব দেশের পাণ্ডা বা গাইডরা পৌরাণিক নিদর্শন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দেখায়। সঙ্গে সঙ্গে এমন এক একটি বক্তৃতা দেয় যে ভক্ত বা পর্যটকরা সে কথা সত্যি বলে মেনে নিতে বাধ্য হন।

ঐতিহাসিকরাও যে মাঝে মাঝে পাণ্ডার ভূমিকা নিয়ে থাকেন এ কথা অস্বীকার করা যায় কি ? পৌরাণিক স্বর্ণলঙ্কাই যে আধুনিক সিংহল তার কি ধ্রুব প্রমাণ আছে ?

হনুমানকে শত যোজন সাগর পাড়ি দিয়ে লঙ্কায় যেতে হয়েছিল। নল সাগর পার হওয়ার জন্য যে সেতু তৈরি করেছিলেন সে সেতুও দৈর্ঘ্যে ছিল শত যোজন অর্থাৎ প্রায় ১২৮০ কিলোমিটার। সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকে মান্নার উপসাগর পেরিয়ে সিংহলের ভূখণ্ডের দূরত্ব তো ১২৮০ কিলোমিটারের অনেক কম। তাহলে পুরাকালে কি এই ব্যবধান শতযোজন ছিল ?

শ্রীমনোনীত সেন তাঁর 'রামায়ণ ও মহাভারত : নব সমীক্ষা' গ্রন্থে প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মতামত বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষ এবং সিংহলের মধ্যবর্তী সমুদ্রকে পৌরাণিক কাহিনীতে যে রকম দুস্তর বলা হয়েছে সে রকম দুস্তর ছিল না।

ঠিকই তো, পৌরাণিক কাহিনীতে লঙ্কার কথা বলা হয়েছে, সিংহলের কথা তো বলা হয় নি। ভারত এবং লঙ্কার মধ্যে ব্যবধান দুস্তরই ছিল।

মেগাস্থিনিস বলেছেন লঙ্কাদ্বীপ একটি নদীর দ্বারা বিভক্ত। কিন্তু আমরা জানি সিংহল দ্বীপ কোন নদীর দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত নয়।

মহাভারতের বনপর্বে শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞে ইন্দ্রপ্রস্থে বিভিন্ন রাজ্যের যে সমস্ত রাজারা এসে পাণ্ডবদের সাহায্য করেছিলেন তাদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সিংহল ও লঙ্কার রাজাদের কথা আলাদা ভাবে উল্লেখ করেছেন।

সুগ্রীব যখন হনুমান প্রভৃতি বানরদের সীতার খোঁজে দক্ষিণ দিকে যেতে নির্দেশ দিচ্ছেন তখন তিনি পথের বিপদ আপদের কথা জানিয়ে দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন যে দক্ষিণ সমুদ্রে রাবণের অনুচরী অঙ্গারকা নামে এক নিশাচরী আছে, সে প্রাণীদের ছায়া আকর্ষণ করে তাদের খেয়ে ফেলে, সুতরাং তোমরা সাবধানে যাবে। এই রাক্ষসী আসলে হয়তো কোন চুম্বক পাহাড়। কিন্তু এ রকম চুম্বক পাহাড়ের অস্তিত্ব তো ভারত ও সিংহলের মধ্যে নেই।

সিংহল যদি রাবণের স্বর্ণলঙ্কা না হয় তাহলে স্বর্ণলঙ্কা কোন্ দ্বীপ? ভারত মহাসাগরে ভারতের দক্ষিণে সিংহল ছাড়া আর কোন বড় দ্বীপ তো নেই। তাহলে স্বর্ণলঙ্কা কি বাল্মীকির স্বকপোলকল্পিত কোন দ্বীপ? হয়তো না। যত দূর সম্ভব লঙ্কাদ্বীপ এখন ভারত মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত।

লুপ্ত মহাদেশ লেমুরিয়া

বিজ্ঞানীরা বলেন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে পৃথিবীর বুকে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে চলেছে। আজ আমরা ভূপৃষ্ঠের যে চেহারা দেখছি আগে সে রকম ছিল না। জার্মান বিজ্ঞানী Alfred Wegener তাঁর Origin of Continents and Ocean Basin বইয়ে প্রথম ভাসমান-মহাদেশ বা Continental Drift তত্ত্ব প্রচার করেন। ওয়েগনারের মতে প্রথমে পৃথিবীর বুকে সমস্ত ডাঙা মিলে একটি মহাদেশ ছিল। পরে চাঁদ ও সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের টানাপোড়েনে ও পৃথিবীর অভ্যন্তরের ভয়াবহ পরিবর্তনের ফলে মহাদেশটি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায়। বর্তমানের ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং এশিয়ার বৃহত্তর অংশ নিয়ে উত্তর গোলার্দ্ধে রইল লাউরেশিয়া আর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে রইল বর্তমানের দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া এবং সুমেরু মহাদেশ। এর নাম গাণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড।

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের নজরে পড়বে। দেখা যাবে যে এক একটি মহাদেশের সীমারেখা আর একটি মহাদেশের সীমারেখার সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে, যদিও এখন এই সব মহাদেশের মধ্যে হাজার হাজার কিলো-মিটার সমুদ্রের ব্যবধান রয়েছে।

ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে মহাদেশগুলির তটরেখার ভূত্বকের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের ভূত্বকের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলের ভূত্বকের যথেষ্ট মিল আছে। এই দুই মহাদেশের দুই উপকূলে এমন পাহাড় রয়েছে যাদের ভূস্তর একই ধরণের এবং এই সব পাহাড়ে একই ধরনের খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে।

লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে গাণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বৃটিশ প্রাণীতত্ত্ববিদ Philip Sclater মনে করেন যে ভারত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমে লেমুরিয়া নামে এক বিরাট ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিল। লেমুরিয়া গাণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের উত্তর অংশ। গাণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙে যাওয়ার বহু লক্ষ বৎসর পরেও লেমুরিয়া জলের উপর জেগে ছিল। বহু বিজ্ঞানী Sclater-এর মতকে সমর্থন করেন। আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্বের ম্যাডাগাস্কার দ্বীপ (বর্তমানে যার নাম মালাগাসি) লেমুরিয়ার অংশ। তাই দেখা যায় মালাগাসির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে আফ্রিকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর খুব বেশী মিল নেই কিন্তু ভারতের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে তাদের মিল অনেক বেশী।

ভূবিজ্ঞানীরাও বিশ্বাস করেন যে বহু কাল পূর্বে এক বিরাট ভূখণ্ড ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল—যার নাম লেমুরিয়া এবং কালক্রমে এই লেমুরিয়া ভারত মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে।

প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমী বিশ্বাস করতেন যে ভারত মহাসাগর ছিল বিরাট একটি হ্রদ। এর চারপাশে ছিল ভূখণ্ড। যা লেমুরিয়ার অস্তিত্বই প্রমাণ করে।

আফ্রিকার প্রান্তে এই লেমুরিয়ার একটি অংশ মালাগাসি রূপে জেগে রয়েছে। ভারতের প্রান্তের কোন একটি অংশেরই নাম ছিল হয়তো লঙ্কা।

লঙ্কা যদি লেমুরিয়ার কোন অংশ হয় তাহলে লেমুরিয়াতে একটি উন্নত সভ্যতার জন্ম হয়েছিল বলে মেনে নিতে হয়। লেমুরিয়াতে সত্যিই কি কোন উন্নত সভ্যতার জন্ম হয়েছিল?

তামিলরা কি লেমুরিয়াবাসী ?

Darwin-এর শিষ্য Thomas Huxley মনে করতেন যে বুদ্ধিমান জীবের জন্ম হয় বর্তমানে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত লেমুরিয়াতে।

উনবিংশ শতাব্দীর আর একজন বিজ্ঞানী Arnest Haeckel এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বিবর্তনবাদে বানর ও বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যে একটি লুপ্তধারা বা মিসিং-লিঙ্ক আছে। মাঝখানের এই জীবের নাম দিলেন তিনি পিথেক্যানথ্রোপাস বা বানর-মানুষ। হেকেল বিশ্বাস করতেন এই বানর-মানুষরা লেমুরিয়াতে বাস করত।

সোভিয়েত লেখক Y. Reshetov তাঁর The Nature of the Earth and the Origin of Man গ্রন্থে বলেছেন যে গাণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ডের পূর্ব অংশ লেমুরিয়াতে আদি মানুষের জন্ম হয়। প্রথমে প্রাইমেট লেমুর বা আধা-বানরের আবির্ভাব হয় আন্দাজ সাত থেকে দশ কোটি বৎসর পূর্বে। তারপর সাড়ে তিন কোটি বৎসর পূর্বে একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটল। লেমুরিয়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক জলের তলায় ডুবতে শুরু করল। মালাগাসি আগেই আলাদা হয়ে গিয়েছিল। আধা-বানরদের মধ্যেও বিরাট পরিবর্তন ঘটল। কিছু কিছু লেমুরের চেহারা হয়ে উঠল বিরাট। তারা গাছ থেকে মাটিতে নামল খাদ্যের সন্ধানে। এই দৈত্যাকৃতি লেমুর বা মেগালাডাপিস-এর কঙ্কাল মালাগাসিতে পাওয়া গেছে।

এই লেমুর থেকে সৃষ্টি হল পুরো বানরদের। এদেরই একটি শাখা থেকে জন্ম নিল Anthropoid Ape বা ড্রাইয়োপিথেকাস। এদের থেকে এক দিকে গরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলের অরণ্যের প্রাণীর সৃষ্টি হল এবং অন্য দিকে এদের থেকেই সৃষ্টি হল আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ। বিবর্তনবাদের এ কাহিনী এ পর্যন্ত ঠিকঠাক কিন্তু তারপরই গণ্ডগোল দেখা দিতে শুরু করেছে।

Mystery of Ancients এর লেখক Craig এবং Eric Umland বিশ্বাস করেন যে বহু লক্ষ বৎসর পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকার মায়ারা অন্য কোন গ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাদের প্রথম আস্তানা ছিল গাণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের সুমেরু মহাদেশে। তারপর তুষার-যুগের প্রারম্ভে যখন দক্ষিণ মেরুতে বরফ জমতে শুরু করল তখন মায়ারা ছড়িয়ে পড়লেন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে মু, আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে আটলান্টিস ও ভারত মহাসাগরের বুকে লেমুরিয়াতে। যে তিনটি মহাদেশ এখন তিন মহাসাগরের গর্ভে সলিল সমাধি লাভ করেছে। তুষার যুগের সময় এই তিনটি মহাদেশ ছিল তাদের প্রধান ঘাঁটি। পৃথিবীতে তখন সভ্য মানুষের জন্ম হয় নি। তখন বানর-মানুষদের রাজত্ব। হয়তো মায়ারা জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্যে এই বানর মানুষদের সভ্য মানুষে পরিবর্তিত করেছিলেন। মায়াদের ক্রনিকল্‌সে এই সময়টিকেই বানরদের যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

তুষার যুগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলতে শুরু করল। সমুদ্রের উচ্চতা বাড়তে লাগল। পৃথিবীর অভ্যন্তরের চাপও বাড়তে শুরু করল, ফলে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাৎ ইত্যাদি আরম্ভ হল। Platoর মতে আটলান্টিস জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল মাত্র এক দিন ও এক রাত্রির মধ্যে। লেমুরিয়াও আস্তে আস্তে সমুদ্রগর্ভে ডুবছিল। এই সময় মায়ারা দক্ষিণ আফ্রিকাতে গিয়েও বসবাস শুরু করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলভাগে প্রত্নতাত্ত্বিকরা সভ্য মানুষের আদিপুরুষদের চিহ্ন খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছেন সভ্য মানুষের ভবিষ্যৎ-পুরুষদের চিহ্ন! এই অদ্ভুত মানুষদের 'বস্কপ' বলা হয়। এরা আধুনিক সভ্য মানুষদের থেকেও বেশী সভ্য ছিল বলে মনে করা হয়। Dr. Loren Eisely তাঁর The Immense Journey বইয়ে বলেছেন এই মানুষদের মগজের মাপ ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক মানুষদের থেকে অনেক বড়। Dr. Brennan মন্তব্য করেছেন: 'It appears ultra-modern in many of its features, surpassing the European in almost every direction. That is to say, it is less simian than any modern skull.'

তামিলদের উপকথা বলে যে তামিলদের আদি বাসভূমি ছিল ভারত মহাসাগরের মধ্যে কোন এক দেশে; কালক্রমে সেই দেশ সমুদ্রে ডুবে যায়। প্রাচীন তামিল ঐতিহাসিকদেরও বিশ্বাস যে তাদের আদি বাসভূমি তামালাহাম হচ্ছে নাওয়ালাম দ্বীপের অংশ। প্রাচীন কালে বিষুবরেখার কাছাকাছি এই দ্বীপের অস্তিত্ব ছিল। এই নাওয়ালাম দ্বীপ হচ্ছে লেমুরিয়ারই অংশ। এই নাওয়ালাম লঙ্কা হলেও অবাক হব না। লেমুরিয়াতে কেবল মানুষের পূর্বপুরুষদেরই জন্ম হয় নি—এখানেই জন্ম হয়েছিল সভ্য মানুষেরও এক উন্নত সভ্যতার। সোভিয়েত লেখক ও বিজ্ঞানী Alexander Kondratov-এর দৃঢ় বিশ্বাস যে লেমুরিয়াতে ছিল উন্নত ও সভ্য মানুষের বাস।

যাই হোক, লেমুরিয়াতে যে সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল যত দূর সম্ভব প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষাভাষি। লেমুরিয়া ডুবতে শুরু করলে এরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন।

১৯৭৩ সালের ৩০শে জুলাই Newsweek পত্রিকায় একটি প্রতিবেদনে বলা হয় যে উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়ার হিমবাহ মণ্ডিত 'শাসতা' পর্বতে লেমুরিয়াবাসী নামে একটি জাতি বাস করে। স্থানীয় জনসাধারণ ওই পর্বত শিখরের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে; কারণ তাদের ধারণা ওখানে একটি ভয়ঙ্কর অদ্ভুত জাত বাস করে, নিউজউইকের ওই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে লেমুরিয়াবাসীরা তাদের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। তাদের কোন খাবার-দাবার লাগে না; বাইরের জগৎ থেকে তাদের কিছুই নিতে হয় না ··।

১৮৯৮ সালে Fredrick S. Oliver প্রথম উল্লেখ করেন যে শাসতা পর্বতের উপরে লম্বা সাদা পোশাক পরে লেমুরিয়াবাসীরা রহস্যময় সব যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান করে থাকে। লস এঞ্জেলসের Sunday Times-এ ১৯৩১ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ওই পর্বতের উপর থেকে অদ্ভুত আলো ছড়িয়ে পড়ে এবং ওখানে রহস্যময় কিছু ঘটে থাকে।

সুগ্রীব হনুমানকে কি লেমুরিয়ার কথা বলেছিলেন ?

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীব জাম্ববান, অঙ্গদ, হনূমান, নীল, গন্ধমাদন ইত্যাদি বিক্রমশালী বীরদের সীতার খোঁজ করার জন্য দক্ষিণ দিকে যেতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পথেরও বিশদ বিবরণ দিতে লাগলেন। এই বিবরণ বিশ্লেষণ করলেই আমরা দেখতে পাব যে সুগ্রীব এমন সব জায়গায় সীতার খোঁজ করতে বলছেন যেগুলোকে ভারত মহাসাগরের বুকে একটি দ্বীপ-শৃঙ্খল বলে মনে হয়। এই দ্বীপ-শৃঙ্খলের একটি দ্বীপ হচ্ছে লঙ্কা। এই দ্বীপ-শৃঙ্খল আর কিছুই নয়—একটি বিরাট ভূভাগের শেষ চিহ্ন। যখন কোন ভূখণ্ড সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হতে শুরু করে তখন স্বভাবতই নিচু জায়গাগুলি আগে ডুবে যায়—জেগে থাকে উঁচু জায়গা অর্থাৎ পর্বতশীর্ষগুলি। সুতরাং কোন্ ডুবে যাওয়া মহাদেশের ইঙ্গিত দিয়েছেন সুগ্রীব ?

সুগ্রীব বলছেন, 'মলয় পর্ব্বতের শিখরদেশে সমাসীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে দর্শন করিবে। মহাত্মা অগস্ত্য প্রসন্ন হইলে তাঁহার আদেশানুসারে গ্রাহকুলসমাকুলা মহানদী তাম্রপর্ণী পার হইবে। যেমন কোন যুবতী কামিনী তাহার পতিকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ বিচিত্র চন্দনবনদ্বারা প্রচ্ছন্নদ্বীপবতী সেই তরঙ্গিনী সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতেছে। কপিগণ! তোমরা সেই সরিৎ অতিক্রম করিয়া পাণ্ড্যনগরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাকারবেষ্টিত নগরের পুরদ্বারস্থিত মুক্তামণিভূষিত সুবর্ণময় কপাট দেখিতে পাইবে।'

সুগ্রীবের বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি কোন কাল্পনিক পথের কথা বলছেন না। ভৌগোলিক পথেরই বর্ণনা দিচ্ছেন। তাম্রপর্ণী বর্তমানের তামিলনাড়ু রাজ্যের টিনেভেল্লীর প্রধান নদী ছিল। আর পাণ্ড্যনগর হচ্ছে তামিলনাড়ুর সর্বদক্ষিণ অংশ।

এর আগে সুগ্রীব বলেছেন,—'সহস্রশৃঙ্গযুক্ত নানা তরু এবং লতা-সমূহে সমাকীর্ণ, বিন্ধ্যগিরি এবং মহাসর্পনিষেবিত মনোহর নর্ম্মদা, গোদাবরী, মহানদী, কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি নদীসকল অনুসন্ধান করিবে। পরে মেকল, উৎকল, দশার্ণনগর, আব্রবন্তী, অবন্তী, বিদর্ভ, ঋষিক, মহিষিক, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিক প্রভৃতি দেশসকল অনুসন্ধান করিয়া পর্ব্বত নদী ও গুহাবিশিষ্ট দণ্ডকারণ্য, গোদাবরী নদী এবং দণ্ডককানন মধ্যবর্ত্তী গোদাববী প্রদেশ, অন্ধ্র, পণ্ড্র, চোল, পাণ্ড্য ও কেরল প্রভৃতি স্থান অনুসন্ধান করিবে। পরে গৈরিকাদি ধাতুসমূহে বিভূষিত বিচিত্র শিখরবিশিষ্ট, নানাবিধ পুষ্পিত কাননে বিরাজিত পরম রমণীয় অয়োমুখ পর্ব্বতে যাইয়া তাহার চন্দনবনোদ্দেশবর্ত্তী মহাশৈল মলয়কে অন্বেষণ করিবে এবং তথায় অপ্সরাগণের বিহারভূমি প্রসন্নসলিলা যে কাবেরী নদী আছে, তাহা অন্বেষণ করিয়া দেখিবে।'

সবই পুরোপুরি ভৌগোলিক বিবরণ। কাবেরী নদীর দক্ষিণে পাণ্ড্যদেশ ছাড়িয়েই সমুদ্র।

'পরে সমুদ্রের অদূরবর্ত্তী হইয়া তাহা সন্তরণের উপায় স্থির করিবে। সেই সমুদ্র মধ্যে মহাত্মা অগস্ত্য কর্ত্তৃক স্থাপিত বিচিত্র সানুমান, সুবর্ণময়, পরম সৌন্দর্যাশালা মহেন্দ্র পর্ব্বত সাগরোর্ম্মিতে অবগাহনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে; নানাবিধ পুষ্পিত তরু এবং লতাপুঞ্জে পরিবৃত দেবতা, ঋষি, যক্ষ, অপ্সরা, সিদ্ধ ও চারণগণ সেবিত সেই সুরম্য পর্ব্বত-মধ্যে প্রতি পর্ব্বদিনে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র আসিয়া থাকেন।'

এইবার একটু গণ্ডগোল মনে হচ্ছে, তাই না? আসলে সুগ্রীব ভৌগোলিক বিবরণই দিয়ে যাচ্ছেন; কিন্তু এ বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল নই বলে আমাদের কাছে এবার আষাঢ়ে গল্প মনে হচ্ছে। একটু ভালো ভাবে আলোচনা করলেই এ রহস্যের সমাধান হবে বলেই মনে হয়। সুগ্রীবের কথামত লঙ্কার আগে সমুদ্রের মধ্যে মহেন্দ্র পর্বত রয়েছে। এখানে দেবতা, ঋষি ও যক্ষরা থাকে ও প্রতি পর্ব উপলক্ষে ইন্দ্র এখানে আসেন। লঙ্কার সুরম্য নগরীও তৈরি হয়েছিল ইন্দ্রের জন্য। লঙ্কা ও লঙ্কার কাছাকাছি দ্বীপে স্বর্গলোক

থেকে মাঝে মাঝেই ইন্দ্র আসতেন। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই সব পার্বত্য-দ্বীপ এক কালে লেমুরিয়ার অংশ ছিল এবং ভিন্‌গ্রহের উন্নত মানুষরা—দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ বলে আমরা যাদের জানি, এই লেমুরিয়াতে প্রথম তাদের সভ্যতা বিস্তার করেছিলেন। এখান থেকেই তারা যাতায়াত করতেন তাদের নিজেদের গ্রহে। কিন্তু লেমুরিয়া তখন জলের তলায় ডুবতে শুরু করছে। সমুদ্রের উপর তখন জেগে রয়েছে কতকগুলো পর্বতশীর্ষ আর সেই শর্বতশীর্ষগুলিতে তখন তারা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন তাদের সভ্যতা। যেহেতু পরবর্তী কালে এই সব পার্বত্য-দ্বীপও সমুদ্রগর্ভে ডুবে যায়, তাই সে সব সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই জানতে পারি না।

যাই হোক, তারপর সুগ্রীব বললেন, 'সমুদ্রের পরপারে শতযোজন বিস্তৃত, অতিশয় প্রভাশালী, মনুষ্যের অগম্য এক দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপে বিশেষ করিয়া সীতার অন্বেষণ করিবে। কারণ সেই স্থানেই আমাদিগের বধ্য সুরেন্দ্রতুল্য তেজস্বী রাক্ষসাধিপতি দুরাচার রাবণ বাস করিয়া থাকে।'

সুগ্রীব এই বিরাট দ্বীপের নাম করেন নি, তবে এটা যে লঙ্কা দ্বীপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানে রাবণ বাস করেন। সুতরাং, এখানে ভালো করে সীতার সন্ধান করতে বললেন। কিন্তু এখানেও যদি সীতার সন্ধান না পাওয়া যায় তাহলে হনুমান ও অন্যান্য বীরদের সেই দ্বীপ ছাড়িয়ে সমুদ্রের মধ্যে অন্য এক পর্বতে যেতে বললেন—'সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সেই দ্বীপ অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাইবে, সমুদ্র জলমধ্যে সিদ্ধ, এবং চারণগণ নিষেবিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় পুষ্পিতক ভূধর আছে। সেই গিরি বিপুল শিখর দ্বারা যেন স্বর্গকে ভেদকরত প্রকাশ পাইতেছে। সূর্য্য তাহার সুবর্ণময় একটি শিখর আশ্রয় করিয়া থাকেন। কৃতঘ্ন, নৃশংস বা নাস্তিকগণ সেই পর্ব্বতকে দেখিতে পায় না।'

যে গিরিশিখর স্বর্গকে ভেদ করছে সেই বিরাট গিরিশিখর নাস্তিকরা দেখতে পাবে না এ আবার কি রকম কথা? আসল ঘটনা

হচ্ছে এই বিরাট উঁচু গিরিশিখরটি তখন আর জলের উপর জেগে নেই, সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। তবে বহু কাল পূর্বে এই বিশাল গিরিশৃঙ্গ সমুদ্রের বুকে জেগে ছিল। ঘটনাটি ঐতিহাসিক। ইতিহাস পুরাণের কথা যারা বিশ্বাস করে না তারা তো নাস্তিক। তাই সুগ্রীব বলছেন নাস্তিকরা এই গিরিশিখর দেখতে পায় না।

এর পর সুগ্রীব যে বর্ণনা দিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকেই বোঝা যাবে যে লঙ্কা হচ্ছে লেমুরিয়ারই অংশ এবং সুগ্রীব সেই লুপ্ত মহাদেশের শেষের দিকের অবস্থাই বর্ণনা করছেন। সুগ্রীব বললেন, 'পরে সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সূর্য্যবান নামে আর এক পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। উহার বিস্তার চতুর্দ্দশ যোজন এবং উহার পথসকল অতিশয় দুর্গম।'

সিংহলের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে প্রায় ১৮০ কিঃমিঃ চওড়া কোন দ্বীপের অস্তিত্ব নেই বলেই আমরা জানি। সিংহল যে লঙ্কা নয় সে-কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। সুগ্রীবের বর্ণনা থেকে সে কথাই প্রমাণিত হচ্ছে। ভারতের সর্ব দক্ষিণ অংশ পাণ্ড্যদেশে যাওয়ার পর বানরদের তিনি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যেতে বলেছিলেন বলে অনুমিত হয়, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নিশ্চয় নয়।

তারপর—'ঐ সূর্য্যবান পর্ব্বত অতিক্রমপূর্বক সর্ব্বকাম ফলপ্রদ বৃক্ষরাজি পরিব্যাপ্ত সকল সময়ে মনোহর বৈদ্যুত নামক পর্ব্বতে যাইবে। তথায় উৎকৃষ্ট ফলমূল সকল ভোজন করিয়া মনস্তুষ্টিকর মধু পান করত নয়ন এবং মনের আনন্দদায়ক কুঞ্জর নামক পর্ব্বতে যাইবে। সেই কুঞ্জর পর্ব্বতে একযোজন বিস্তৃত দশযোজন উন্নত নানা রত্নে ভূষিত বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত উত্তম সুবর্ণময় অগস্ত্যের পুরী বিদ্যমান রহিয়াছে। আর তথায় বিশাল পদবীবিশিষ্ট অধর্ষনীয়, মহাবিষধর, তীক্ষ্ণদন্তশালী ভীষণ সর্পসমূহ দ্বারা পরিরক্ষিত ভোগবতী নাম্নী নাগপুরী আছে। সেই পুরীমধ্যে নাগরাজ বাসুকি বাস করেন। তোমরা সেই পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সীতার অনুসন্ধান করিবে। তাহার নিকটে যে সকল গুপ্তস্থান আছে তাহা অনুসন্ধান করিবে।'

লঙ্কার পর সূর্যবান পর্বত, তারপর বৈদ্যুত পর্বত, তারপর কুঞ্জর পর্বত। এখানে দেবতাদের ইঞ্জিনীয়র বিশ্বকর্মার তৈরি বিশাল প্রাসাদ রয়েছে। লঙ্কাপুরীও এই একই ইঞ্জিনীয়রের তৈরি। ভিন্‌গ্রহবাসী দেবতারা এই ভূখণ্ডে যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন তাতে কি কোন সন্দেহ আছে এবার? এই কুঞ্জর পর্বতেই আবার নাগরাজ বাসুকীর বাসস্থান। তার পুরীর নাম ভোগবতী। নাগরা দেবতাদের থেকেও রহস্যময়। তাদের পুরী রক্ষা করে 'বিশাল পদবীবিশিষ্ট অধর্ষণীয়, মহাবিষধর, তীক্ষ্ণদন্তশালী ভীষণ সর্পসমূহ।' এই ভয়ঙ্কর সাপ এক ধরণের ইলেকট্রনিক গার্ড—এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

যাই হোক, এবার কুঞ্জর পর্বত ছাড়িয়ে—'সর্ব্বরত্নময় পরম সৌন্দর্য্য-শালী ঋষভ পর্ব্বতে যাইবে, তাহাতে অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী গোশীর্ষক, পদ্মক, হরিশ্যাম প্রভৃতি যে সকল বিবিধ উৎকৃষ্ট চন্দন জন্মিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া কদাচ তদ্বিষয়ে কোন কথা বলিবে না। রোহিত নামক গন্ধর্ব্বগণ সেই ভয়ঙ্কর চন্দনকানন রক্ষা করিয়া থাকেন। আর সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক এবং বভ্রু এই পাঁচজন গন্ধর্ব্বপতি তথায় বাস করেন।'

ঋষভ পর্বতে শক্তিশালী গন্ধর্বরা বাস করেন। তারা বিভিন্ন ধরণের চন্দনের চাষ করেন ও সেই সব চন্দনবন রক্ষা করেন। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা' বইয়ে গন্ধর্বদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে অশ্বদের প্রসঙ্গে গন্ধর্বদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেছেন, 'অপ্‌সু যোনির্ব্য অশ্বঃ' অর্থাৎ জল থেকে অভ্যুদয় হয়েছে বলে একে অশ্ব বলা হয়। বেদ বলছেন, যম প্রথম অশ্ব দান করেন এবং গন্ধর্বগণ এদের লাগাম ধরে গতিশিক্ষা দেন। গন্ধর্বরা জল ভালোবাসতেন; তাদের পূর্বপুরুষরা সমুদ্রাঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। সোম সম্বন্ধে একটি তথ্যে বলা হয়েছে—বশা নামক উৎকৃষ্ট গোজাতিকে কলিগন্ধর্বরা সমুদ্রের অন্তর্গত কোন দ্বীপে পালন করতেন এবং তাদের দুধ বিশেষ ভাবে সোমের সঙ্গে মেশানো হত (অ ১০।১০।১৩)।

গন্ধর্বরা যে সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপে বাস করতেন তা আমরা দেখেছি। আমরা আরো আগে দেখেছি যে গন্ধর্বরাজ শৈলুষ-এর ছেলেরা পরবর্তীকালে সিন্ধুনদের দুই তীরে এক সমৃদ্ধশালী রাজ্য স্থাপন করেন। যে রাজ্য ভরত তাঁর মামা ও দুই ছেলের সাহায্যে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করেন। বর্তমান বিজ্ঞানীদের মতামত আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, তবু আর একবার উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের বিশ্বাস যে লেমুরিয়াতে প্রথম সভ্যতার জন্ম হয়। তারপর লেমুরিয়া যখন ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে ডুবতে শুরু করে তখন লেমুরিয়াবাসী পৃথিবীর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। খুব সম্ভবত এদেরই একদল মহেঞ্জোদড়োতে গিয়ে সিন্ধু-সভ্যতা গড়ে তোলে। সুতরাং সুগ্রীবের বিবরণ কি কাল্পনিক বলে মনে হচ্ছে ?

গন্ধর্বরা লাগাম ধরে অশ্বদের গতি শিক্ষা দেন এবং অশ্বের জন্ম জল থেকে। এর মধ্যেও একটু বোধ করি রহস্য আছে। বেদে শক্তিকে (Energy) অশ্বী বলা হয়েছে। সেই অশ্বী যদি অশ্ব হয় তাহলে বলতে হয় জল থেকে যে বাষ্প তৈরি হয় সেই বাষ্পই অশ্ব আর সেই শক্তিকে কাজে লাগানোর কৌশল জানতেন গন্ধর্বরা। অশ্বদের লাগাম ধরে গতিশিক্ষা দেওয়ার ব্যাখ্যা হয়তো এই। আরো একটি ছোট কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা আছে, তা হচ্ছে যম প্রথম অশ্ব দান করেন। গন্ধর্বদের বাসস্থানের কাছেই যে পিতৃলোকে যাওয়ার রাস্তা। পিতৃলোকের অধিপতি তো যম। সুগ্রীবের বর্ণনার শেষটুকু দেখা যাক।—'সেই পর্ব্বতের (অর্থাৎ ঋষভ) পর পৃথিবীর শেষ সীমায় যথায় রবি, চন্দ্র এবং অগ্নিতুল্য দেহধারী পুণ্যবান ব্যক্তিগণ বাস করেন, সেই স্থানই দুর্দ্ধর্ষ স্বর্গবিজয়ী ব্যক্তিগণের বাস।'

অর্থাৎ ঋষভ পর্বতের পরই হচ্ছে মহাকাশ ঘাঁটি। পৃথিবীর শেষ সীমা অর্থাৎ এখান থেকে মহাকাশ যাত্রা শুরু হয়। রবি, চন্দ্র সেই ইঙ্গিতই দেয়। আর 'অগ্নিতুল্য দেহধারী পুণ্যবান ব্যক্তিগণ' কারা ? তারা কি স্পেস-স্যুট পরিহিত এ্যাস্ট্রোনট বা মহাকাশচারী ? 'স্বর্গবিজয়ী ব্যক্তিগণ' বলতে কি মহাকাশচারীদের বোঝায় না ?

দিল্লীর কুতুবমিনার প্রাঙ্গনের মরিচাহীন লৌহস্তম্ভ।

বয়স আনুমানিক [illegible] বছর

রহস্যময় পিরি রেইসের মানচিত্র   এই মানচিত্রের নিচের দিকে দক্ষিণ মেরু-মহাদেশের ভূভাগ দেখানো হয়েছে। এই মানচিত্র যখন তৈরি করা হয় তখন দক্ষিণ মেরু বরফের স্তরে ঢাকা পড়েনি। কিন্তু দক্ষিণ মেরু বরফে চাপা পড়েছে ৫০ [illegible] হাজার বছর আগে

সুগ্রীব বলছেন,—'তৎপরে পিতৃলোক; সেই সুদারুণ পিতৃলোকে তোমরা যাইতে পারিবে না। ঘোর অন্ধকারাবৃত সেই পিতৃলোক পিতৃরাজ যমের রাজধানী বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাবল বানর শ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সেই পিতৃলোকে গমন বা সীতার অন্বেষণ করিতে পারিবে না; কেননা কোন গমনশীল ব্যক্তিই তথায় যাইতে পারে না। অতএব তোমরা তদ্ভিন্ন অপরাপর স্থান সকল অনুসন্ধান করত বিদেহী-রাজনন্দিনী সীতার সংবাদ জানিয়া প্রত্যাগমন করিবে।'

মহাকাশ তো 'ঘোর অন্ধকারাবৃত' হবেই। কোন 'গমনশীল ব্যক্তি' সেখানে যেতে পারে না। অর্থাৎ হেঁটে যাওয়া সেখানে সম্ভব নয়। 'পিতৃলোক পিতৃরাজ যমের রাজধানী বলিয়া কথিত হইয়াছে।' অর্থাৎ সেই পিতৃলোক সুগ্রীব নিজে দেখেন নি। কারো কাছে শুনেছেন। এ সব রহস্যের ভিতর থেকে আসল বিষয়টি কি এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে না? লেমুরিয়াতে যখন উপনিবেশ তৈরি হয়েছিল তখন এখানেই মহাকাশ ঘাঁটি থাকতে বাধ্য। সুগ্রীবের কথা থেকে বিষয়টি এখন জলের মতো পরিষ্কার।

রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা' বই থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি: 'ঋগ্বেদে বলা হয়েছে—হে মৃত্যু (অর্থাৎ যম), তোমার যে নিজস্ব পন্থা তা দেবযান* থেকে ভিন্ন (ঋ ১০।১৮।১)। পিতৃযান-সমূহের সংখ্যা বোধ করি দেবযান অপেক্ষা বেশিই ছিল এবং বহু গুপ্ত পথ পিতৃযানের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কারণ শত্রুর গতিবিধি যমের অধীনস্থ কর্মচারীরাই লক্ষ্য করতেন। দেবগণের বহু গুপ্তচর এই সব পথের উপর দৃষ্টি রাখতেন। এঁদের বলা হত স্পর্শ, যার পাশ্চাত্য আখ্যা স্পাই। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—'ন তিষ্ঠন্তি ন নিমিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পর্শ ইহ যে চরন্তি' (আ।১৮।১।৯)। এখানে দেবগণের যে সব গুপ্তচর অবস্থান করেন তাঁরা চুপ করে বসে নেই বা ঘুমন্তও নেই। অর্থাৎ, তাঁরা সদাজাগ্রত থেকে অপরের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করেন।'

---

* দেবযান হচ্ছে উত্তরমার্গ এবং পিতৃযান হচ্ছে দক্ষিণমার্গ।

মহাকাশ ঘাঁটির প্রহরীদের তো অতন্দ্র থেকেই পাহারা দিতে হয় তাই নয় কি? দেবতাদের দ্বিতীয় মহাকাশ ঘাঁটি বা রকেট-বেস নিয়ে যখন আলোচনা করা হবে তখনও দেখতে পাওয়া যাবে কি ভাবে সেই মহাকাশ ঘাঁটি সুরক্ষিত করে রাখা হত।

মিত্র মহাশয়ের বই থেকে আরো একটু উল্লেখ করা যেতে পারে: 'দেবজনের মধ্যে আর বিশেষ করে যাঁদের উল্লেখ করতে হয় তাঁরা পিতৃগণ নামে পরিচিত। এঁরা দ্যুলোকের উপরিভাগে প্রদ্যু নামক লোকে বাস করতেন। এঁদের শাসকপদে যিনি অধিষ্ঠিত থাকতেন তাঁর আখ্যা যম। প্রাচীন পিতৃগণের মধ্যে যে সব সম্প্রদায়ের নাম করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন নবগ্ব, অথর্ব্ব, ভৃগু, সৌম্য এবং অঙ্গিরস। অঙ্গিরসগণ যুদ্ধকার্য্যেও নিপুণ ছিলেন। স্বয়ং ইন্দ্রের সেনাপতি বৃহস্পতি নিজে অঙ্গিরসবংশীয় ছিলেন। এঁদের যে কেন 'পিতৃ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে সেটা স্পষ্ট নয়'

পিতৃলোক যে মহাকাশে এই পৃথিবীতে নয় এ কথা পরিষ্কার। আসলে পৃথিবীতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের জন্য যমই হয়তো নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—তাই তিনি 'পিতৃ' আখ্যা পেয়েছিলেন।

যাই হোক, সুগ্রীবের বিবরণ থেকে এ বিষয় স্পষ্ট যে লেমুরিয়ার নিচু জায়গাগুলো যখন সমুদ্রের গর্ভে ডুবে গেছে কেবলমাত্র কতকগুলি শিলাময় দ্বীপ জেগে রয়েছে সেই সময় রাবণ লঙ্কায় বাস করতেন।

Craig এবং Eric Umland তাঁদের বই Mystery of the Ancients-এ লেমুরিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: 'Lemuria could well have seperated from both India and Africa before its destruction at the end of ice ages and existed for some times as an island.'

লেমুরিয়াতে যদি প্রথম ভিনগ্রহীদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়ে থাকে তাহলে রাবণের বহু পূর্ব থেকেই তো রাক্ষসদের এখানে থাকার কথা। সে রকম কোন প্রমাণ আছে কি?

লঙ্কার রাবণ-পূর্ব রাক্ষসদের ইতিহাস

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাম অগস্ত্য মুনির কাছে 'কুবেরের বাসের পূর্বেও লঙ্কায় রাক্ষস ছিল' এ কথা শুনে খুব বিস্মিত হয়ে অগস্ত্য মুনিকে সেই রাক্ষসদের ইতিহাস বলতে অনুরোধ করলেন। অগস্ত্য মুনি বলতে আরম্ভ করলেন—ব্রহ্মা রাক্ষস ও যক্ষ সৃষ্টি করলেন। রাক্ষস বংশে হেতি ও প্রহেতি নামে দুই ভাই জন্মগ্রহণ করল। প্রহেতি ধার্মিক তাই সে তপস্যা করতে চলে গেল। হেতি কালের বোন ভয়কে বিয়ে করল। তাদের এক ছেলে হল—নাম তার বিদ্যুৎকেশ। বিদ্যুৎকেশ বড় হলে হেতি তার সঙ্গে সন্ধ্যার মেয়ের বিয়ে দিল। বিদ্যুৎকেশের সুকেশ নামে একটি ছেলে হল। বিদ্যুৎকেশের স্ত্রী কিন্তু ছেলের পরিচর্যায় মন না দিয়ে তাকে ফেলে রেখেই 'স্বামীর সঙ্গে রতিক্রিড়ায় রত হইল।' সেই সময় মহাদেব ও পার্বতী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা শিশুটিকে একা একা কাঁদতে দেখে দয়াপরবশ হয়ে তাকে অমর করে দিলেন ও 'আকাশগামী-পুব' দান করলেন। পার্বতীও বর দিলেন যে রাক্ষসরা 'সদ্যই গর্ভধারণ করিবে সদ্যই প্রসব করিবে এবং সদ্যই তাহারা মাতার তুল্য বয়স প্রাপ্ত হইবে।'

সুকেশের সঙ্গে ঋষভ পর্বতের গন্ধর্বরাজ গ্রামনী তার লক্ষ্মী-স্বরূপা মেয়ে দেববতীর বিয়ে দিল। এদের তিন ছেলে হল—মাল্যবান, সুমালী ও মালী। এরা দুর্লভ তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে অমর বর লাভ করল। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে তারা দেবদৈত্যদের উপর নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করল। এক দিন তারা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে ডেকে বলল দেবতাদের অমরাবতীর মতো আমাদের জন্য একটি নগর তৈরি করে দাও। বিশ্বকর্মা বললেন—'দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকূট ও সুবেল নামক দুইটি পর্ব্বত আছে। দুইটি পর্ব্বতই দেখিতে একরূপ। তাহার মধ্যভাগে মেঘ সন্নিভ একটি শৃঙ্গ আছে। আমি সেই শিখরে ইন্দ্রের আজ্ঞায় লঙ্কা নামে একটি নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছি। ঐ নগরী দৈর্ঘ্যে শতযোজন এবং বিস্তারে ত্রিংশৎ যোজনব্যাপী। উহা স্বর্ণময়

প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং স্বর্ণময় তোরণে ভূষিত। হে রাক্ষস শ্রেষ্ঠগণ ! স্বর্গবাসী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যেমন অমরাবতীতে বাস করেন, সেইরূপ তোমরা দুর্জ্জয় হইয়া সেই নগরে গিয়া বাস কর।'

রাক্ষসরা বিশ্বকর্মার কথা শুনে হাজার হাজার অনুচর নিয়ে সেই লঙ্কাপুরীতে গিয়ে বাস করতে লাগল। এর পর নর্মদা নামে এক গন্ধর্বী তার তিন মেয়ের সঙ্গে মাল্যবান, সুমালী ও মালীর বিয়ে দিল। এদের প্রচুর বীর সন্তান-সন্ততি হল। রাক্ষসরা 'অধিকতর বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া শত রাক্ষসপুত্র সাহায্যে' ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ, নাগগণ ও যক্ষগণকে তাড়িয়ে দিতে লাগল। তখন দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব বললেন, তোমরা বিষ্ণুর কাছে যাও। বিষ্ণু সব শুনে বললেন, ঠিক আছে—'আমি তাহাদের সংহার করিব।' রাক্ষসরা এ খবর শুনে খুব রেগে গিয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল। 'তখন প্রভু পঙ্কজনয়ন, সহস্র সূর্য্যতুল্য প্রভাবশালী দিব্য কবচে আচ্ছাদিত হইয়া বাণপূর্ণ বিমল ইষুধিদ্বয়, অসিবন্ধনরজ্জু, বিমল খড়্গ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধনু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট অস্ত্রসমূহ বন্ধনপূর্ব্বক বিনতানন্দন গিরিসদৃশ সুপর্ণে চড়িয়া রাক্ষসগণের পরাজয়ের জন্য দ্রুতগতিতে যাত্রা করিলেন'

ঘোরতর যুদ্ধ হল। বিষ্ণু চক্র দিয়ে মালীর মুণ্ডু কেটে ফেললেন। মাল্যবান ও সুমালী নিজেদের পরিবার পরিজন নিয়ে বিষ্ণুর ভয়ে পাতালে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

এর পর বিশ্বশ্রবা মুনি তার ছেলে কুবেরকে লঙ্কায় গিয়ে বসবাস করতে বললেন। মাল্যবান একদিন কুবেরকে পুষ্পক রথে করে যেতে দেখে কি করে আবার লঙ্কা উদ্ধার করা যায় এ কথা ভাবতে লাগলেন। তারপর নিজের মেয়ে কৈকসীকে বললেন, 'তুমি মুনিবর পুলস্ত্যনন্দন বিশ্বশ্রবার নিকট গমন করিয়া তাহাকে স্বয়ংপতিত্বে বরণ কর।' কৈকসি তাই করলেন। কৈকসী ও বিশ্বশ্রবার ছেলে রাবণ। রাবণ পরে কুবেরকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দেন। সুতরাং লেমুরিয়াতে রাবণেরও বহু পূর্বে উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল।

রহস্যময় ইস্টার দ্বীপবাসীরাই কি মহেঞ্জোদড়োবাসী ?

লেমুরিয়া সমুদ্রগর্ভে ডুবতে শুরু করল। লেমুরিয়াবাসীরা নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। আল-উবায়েদ, সুমের, মহেঞ্জোদড়ো-হরাপ্পা সভ্যতার আদিপুরুষরা যে লেমুরিয়া থেকে এসেছিলেন এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন একমত। এই লেমুরিয়াবাসীদের প্রধান ভাষা ছিল প্রাচীন দ্রাবিড় বা 'প্রোটো-দ্রাবিড়িয়ান' ভাষা। সম্ভবত এই লেমুরিয়াবাসীরা আরো দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রধানত সমুদ্রপথে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে মৃত আগ্নেয়গিরির শীর্ষে একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে। দ্বীপটির নাম ইস্টার দ্বীপ। দ্বীপটি ছোট হলে কি হবে, রহস্য তার কম নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপীয়ানরা এই দ্বীপে প্রথম পা দিয়েই চমকে উঠলেন। সমুদ্রের তীরে দাঁড় করানো বিরাট বিরাট পাথরের মানুষের মূর্তি দেখে তারা বিস্ময়ে অভিভূত। মূর্তিগুলির লম্বাটে কান, মুখগুলি গম্ভীর, মাথায় টুপি বা মুকুট। ৬০ মিটার দীর্ঘ এবং ৩ মিটার প্রস্থের বিশাল বিশাল পাথরের বেদীর উপর এগুলি বসানো। পরে অবশ্য মূর্তিগুলিকে কারা যেন বেদীর উপর থেকে নিচে সরিয়ে দেয়। সর্বাপেক্ষা বড় মূর্তিটির উচ্চতা ২০'৯ মিটার, মাথাটা ১১ মিটার এবং নাকের দৈর্ঘ্যই ৪ মিটার। এই মূর্তিগুলির এক একটির ওজন প্রায় ৫০ টন।

একটি মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ভিতরকার পাথর কেটে এই মূর্তিগুলি তৈরি করা হত। এখনও বেশ কিছু অসমাপ্ত মূর্তি সেই জ্বালামুখের ভিতরে পড়ে আছে। ভাবতে অবাক লাগে কি ভাবে এই সব মূর্তি-নির্মাতারা এত বড় বড় মূর্তি তৈরি করত, তারপর কি ভাবেই বা জ্বালামুখ থেকে বের করে সমুদ্রের ধারে এনে বসাতো? কি অমানুষিক শ্রমের প্রয়োজন হত এর জন্যে! সেকালে আধুনিক যুগের মতো শক্তিশালী ভারোত্তোলক যন্ত্রপাতি বা ক্রেন ছিল না বলেই মনে করা হয়—নাকি আমাদের ধারণাই ভুল।

এই মূর্তিগুলির মাথায় থাকত ভিন্ন জাতীয় পাথরের লম্বা ধরনের লাল টুপি। আর এই লাল পাথর পাওয়া যেত দ্বীপের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি ছোট আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ভিতরে। একটি মূর্তির টুপির ব্যাস প্রায় ২'৭৫ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ২ মিটার। জ্বালামুখের ভিতরে পড়ে থাকা একটি টুপির ব্যাস ৩ মিটারেরও বেশী, উচ্চতা ২'৫০ মিটার, ওজন ৩০ টন।

লিখিত ভাষা সভ্যজগতের জিনিস। এই ছোট্ট দ্বীপবাসীদেরও নিজস্ব ভাষা ছিল। কাঠের উপর খোদাই করা এই লিপি হচ্ছে চিত্রলেখ লিপির গোষ্ঠিভুক্ত। এর নাম 'কোহাই রোঙ্গো রোঙ্গো' স্থানীয় ভাষায় যাকে বলা হয় 'কথা-বলা কাঠ'। এই অজানা ভাষার পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নি। তবে সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে এই যে মহেঞ্জোদড়ো ও হরাপ্পার শীলমোহর থেকে পাওয়া লিপির সঙ্গে ইস্টারদ্বীপের লিপির আশ্চর্য মিল।

ইস্টারদ্বীপবাসী কারা? কোথা থেকে তারা এসেছিলেন? ইতিহাস সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। বহু বিজ্ঞানী বহু মতবাদ প্রচার করেছেন, কিন্তু কেউই সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। হঠাৎই যেন এদের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং হঠাৎই যেন তারা রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

মহেঞ্জোদড়ো থেকে পৃথিবী ফুঁড়ে পৃথিবীর অপর পারে পৌঁছাতে পারলে তবেই আমরা পাব ইস্টারদ্বীপ। অর্থাৎ পৃথিবীর দুই বিপরীত প্রান্তে এই দুটি দেশ—মাঝখানে হাজার হাজার কিলোমিটারের ব্যবধান। তবু দুটি দেশের লিপি এক হয় কি করে? তাহলে কি মহেঞ্জোদড়োবাসী অথবা তাদেরই কোন গোষ্ঠি লেমুরিয়া থেকে সোজা ইস্টারদ্বীপে চলে গিয়েছিলেন? নাকি ইস্টারদ্বীপবাসীরা লেমুরিয়াবাসীদের আর এক গোষ্ঠি লুপ্ত আটলান্টিসবাসী? মহেঞ্জোদড়োর ভাষা ও ইস্টারদ্বীপের ভাষার পাঠোদ্ধার হলে এ রহস্যের উপর হয়তো নতুন আলোকপাত করা সম্ভব হবে।

লুপ্ত আটলান্টিস

সক্রেটিসের শিষ্য বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, যীশুখৃষ্টের জন্মের চারশো বছর আগে তাঁর Dialogues Timaeus and Critias বইয়ে লুপ্ত আটলান্টিসের কথা উল্লেখ করেন। প্লেটো নাকি আটলান্টিসের বিষয় জেনেছিলেন মিশরীয় পুরোহিতদের কাছ থেকে। মিশরীয় পুরোহিতরা আবার নাকি বিষয়টি জেনেছিলেন আটলান্টিস-বাসীদের কারো কাছ থেকে।

সে সময় এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা না ঘামালেও পরবর্তী কালে লুপ্ত আটলান্টিস বহু গবেষকদের মধ্যে উৎসাহ জাগায়। আটলান্টিস কোথায় ছিল এ নিয়ে বহু গবেষক গবেষণা করেছেন এবং বহু প্রামাণ্য বই লিখেছেন। অধিকাংশ গবেষকই শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রাচীন কালে সত্যি সত্যি আটলান্টিস নামে একটি দেশের অস্তিত্ব ছিল। অনেকে মনে করেন আটলান্টিক মহাসাগরের কেন্দ্রে ছিল সেই লুপ্ত মহাদেশ। সেখানে গড়ে উঠেছিল এক উন্নত সভ্যতা।

আটলান্টিক মহাসাগরের দুই পারের সভ্যতার মধ্যে বহু বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন: সূর্য-উপাসনা, পিরামিড তৈরি, পাথরের উপর খোদাই করা বিভিন্ন ধরণের বিচিত্র সব সংকেত-লিপি, চিত্রলিপি ইত্যাদি। এ সব দেখে মনে হয় যে হয়তো একদা আটলান্টিক মহাসাগরের বুকের উপর আটলান্টিস নামে একটি প্রাচীন সভ্য দেশ ছিল। কালক্রমে যা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়েছে লেমুরিয়ার মতো।

১৮৭৩ সালে বৃটিশ জাহাজ 'চ্যালেঞ্জার' যখন সমুদ্রের তলদেশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিল তখন জাহাজের গবেষকরা একটি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে আটলান্টিকের গভীরতা যেখানে প্রায় ১২০০০ ফুট সেখানে আটলান্টিকের মাঝখানের গভীরতা মাত্র ৬০০০ ফুট।

প্লেটোর মতে খ্রীঃ পূঃ ৯৬০০ অব্দেও এই প্রাচীন মহাদেশের কিছু অংশ জলের উপর জেগে ছিল। বহু লেখক এ কথা বলেছেন যে আটলান্টিস মহাদেশ দশটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সে-কারণে সম্ভবত জলের তলায় বেশ কয়েকটি শহরের ধ্বংসস্তূপ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

রয়াল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য Egerton Sykes একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা জানান।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে মিত্রশক্তির উপর যখন প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তখন আমেরিকার যুদ্ধ-বিমানগুলিকে ব্রাজিলের নাটাল থেকে ফরাসী অধিকৃত পশ্চিম-আফ্রিকার ডাকারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

ডাকার থেকে মিশরে যাওয়া কোন ঝামেলার ছিল না। অধিকাংশ পাইলটই মিশরে গেলে কায়রোতে কয়েক দিন ছুটি কাটিয়ে আসত। একদিন সন্ধ্যেবেলা কায়রোর টার্ফ ক্লাবে জনৈক পাইলট তার বন্ধুর কাছে কথা প্রসঙ্গে জানাল যে সে যখন বিমান নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে আসছিল তখন একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করে সে খুব বিস্মিত হয়।

Egerton Sykes এই পাইলটটিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে আটলান্টিকের মাঝামাঝি জায়গায় নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণীর একটি পর্বতের পশ্চিম ঢালে ডুবে যাওয়া একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ তার নজরে আসে। সে আরো জানায় যে সূর্যের রশ্মি সমুদ্রের মধ্যে খাড়াভাবে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল বলেই দৃশ্যটি তার নজরে পড়েছিল।

এই ঘটনার কথা Brinsley Le Poer Trench তাঁর Secret of the Ages বইয়ে উল্লেখ করেছেন।

এই রহস্যময় আটলান্টিসের অধিবাসী কারা? কারা এখানে একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল? Craig এবং Eric Umland তাঁদের Mystery of the Ancients বইয়ে বলেছেন: Accor-

ding to ancient tradition, the Canary Islands, Madeira, and the Azores constitute the last remaining vestiges of the once great continent of Atlantis. The Guanche, an ancient people conquered by the Spanish in 1748, were descended from king Uranus, first Sovereign of the Atlantis'. They committed suicide, rathar than be ruled by a lowly race of men. The Guanche believed that they were the last people in the world, all the others having perished when they were swallowed up by the sea. The Guanche were evidently Maya who found themselves isolated when the rest of Atlantis was lost beneath the rising sea. They were unable to contact other survivors and thus believed themselves to be quite literally the lost people in the world.'

অর্থাৎ এই আটলান্টিসবাসীরাও সেই লেমুরিয়ার অধিবাসী? এদেরই কোন বংশধরদের কাছ থেকে নাকি এ্যাডমিরাল পিরি রেইস পৃথিবীর এক রহস্যময় মানচিত্রের মাল মশলা যোগাড় করেছিলেন। কি সেই রহস্যময় মানচিত্র?

পৃথিবীর রহস্যময় মানচিত্র!

কনস্ট্যান্টিনোপলের সুলতানের প্রাসাদ থেকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক তুর্কী এ্যাডমিরালের সই করা একটি মানচিত্র পাওয়া যায়। এ্যাডমিরালের নাম Piri Iben Haji Memmed. মানচিত্রটিতে তারিখ দেওয়া আছে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের। এই মানচিত্রটিই পিরি রেইস-এর মানচিত্র নামে পরিচিত।

অধ্যাপক Charles Hapgood তাঁর Maps of the Ancient Sea Kings—Evidence of advanced civilization in the Ice Age বইয়ে এই মানচিত্রটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা থেকে জানা যায় যে তুর্কী নৌবাহিনীর জনৈক পদস্থ কর্মচারী এই মানচিত্রটির একটি অনুলিপি U. S. Navy Hydrographic office এর M. I. Walter নামে জনৈক মানচিত্র বিশেষজ্ঞকে উপহার দেন। Walter মানচিত্রটি তাঁর এক বন্ধু Capt. Arlington H. Malleryকে দেখতে দেন। প্রাচীন মানচিত্র বিশেষজ্ঞ Mallery এই মানচিত্রটির মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বিষয় লক্ষ্য করে অন্যান্য বিজ্ঞানী ও মানচিত্র বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনায় বসেন।

এরপরই অধ্যাপক Hapgood এই মানচিত্রটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার জন্যে তাঁর ছাত্রদের নিয়ে একটি শিক্ষাক্রম আরম্ভ করেন। পরীক্ষা শেষে যে ফলাফল পাওয়া গেল তাতে দেখা গেল যে পিরি রেইস যে আসল মানচিত্র থেকে এই মানচিত্রটি তৈরি করেছিলেন সেই আসল মানচিত্রটি তৈরি করা হয়েছিল শেষ তুষারযুগের আগে। এবং মানচিত্রখানি তৈরি করার জন্য মানচিত্র নির্মাতারা আকাশ থেকে ছবি তুলেছিলেন। যার সরল অর্থ হচ্ছে যে দশহাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর বুকে এমন একটি সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল যাদের আকাশে ওড়ার মতো বিমান ছিল এবং আকাশ থেকে ছবি তোলার মতো শক্তিশালী ক্যামেরাও ছিল।

এই মানচিত্রে সুমেরুর (Antarctica) কুইন মডল্যাণ্ডের উপকূলের কিছু অংশ দেখানো হয়েছে যা বর্তমানে কয়েক মাইল বরফের নীচে চাপা পড়ে আছে। অর্থাৎ মানচিত্রটি আঁকা হয়েছিল ওই উপকূলভাগ বরফের নীচে চাপা পড়ার পূর্বেই। ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ সুমেরু অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। সুতরাং এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর বুকে একটি প্রচণ্ড উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল।

প্লেটোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আটলান্টিস মহাদেশের শেষ দ্বীপ 'পসিডনিস' সম্ভবত ৯৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে অর্থাৎ প্রায় ১১৫০০ বছর পূর্বে সমুদ্রের নীচে তলিয়ে যায়। খুব সম্ভবত 'পসিডনিস' ডুবে যাওয়ার সময় কিছু লোক তাদের জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পিরি রেইস হয়তো তাদেরই কারো কাছ থেকে যোগাড় করেছিলেন তাঁর রহস্যময় মানচিত্র আঁকার মাল মশলা।

প্রাচীন সভ্যতার বংশধররা কি সত্যিই পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন? Andrew Tomas তাঁর We are not the First বইয়ের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, টায়নার এপোলোনিয়াস হিমালয় পার হয়ে সর্বজ্ঞ মানুষদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। ফ্রানজ্ গ্রাফার তাঁর Memoirs of Viennaতে সেণ্ট জারমেইন* সম্বন্ধে লিখেছেন: 'আগামী কাল সন্ধ্যায় আমি যাত্রা করব। ইউরোপ থেকে চলে যাব হিমালয়ে।' গ্রাফারের স্মৃতিকথায় উল্লিখিত বিবরণে একটি স্থানের উল্লেখ আছে যেখানকার ঋষিরা নাকি হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রাচীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে রক্ষা করে আসছেন।

এই প্রসঙ্গে তিব্বতী লামা Lobsong Rampa তাঁর The Cave of the Ancient বইয়ে যে অদ্ভুত ঘটনার কথা বলেছেন তা শোনাবার লোভ দমন করতে পারছি না। অবশ্য এর সত্য মিথ্যা যাচাই করার সামর্থ আমাদের নেই।

* সেণ্ট জারমেইন সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

একদিন রামপার গুরু লামা মিঙ্গার দণ্ডুপ রামপাকে বললেন যে তিব্বতের এক দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের একটি গুহায় ঢুকে ওঁরা সব অদ্ভুত যন্ত্রপাতি দেখতে পান। লামার ভাষাতেই বলি :

'ধীরে ধীরে আমাদের সামনের কুয়াশার ভিতর থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমে আলোর রঙ হল নীলচে-গোলাপী। মনে হচ্ছিল আমাদের সামনে কোন অশরীরি যেন শরীর ধারণ করছে। সেই কুয়াশা-আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। বিরাট গুহার ভিতরে অসংখ্য যন্ত্রপাতি। গুহার মেঝের কেন্দ্রটা যা একটু ফাঁকা—আমরা সেখানেই বসে ছিলাম। আলোটার মধ্যে নানা রকম পরিবর্তন ঘটতে লাগল। অবশেষে ওটা একটা গোলাকার রূপ ধারণ করল। আমার মনে হল অতীতের যন্ত্র-পাতিগুলো যেন ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠছে। আমরা নির্বাক বিস্ময়ে বসে বসে সবকিছু দেখতে লাগলাম, এমন সময় মগজের মধ্যে কিছু যেন চকিতে ঘটে গেল। বুঝতে পারলাম টেলিপ্যাথিক যোগা-যোগ ঘটছে। মনে হল স্পষ্ট যেন কারো কথা শুনতে পাচ্ছি। সেই গোলাকার আলোর মধ্যে আমরা ছবি দেখতে পেলাম। প্রথমে অস্পষ্ট, তারপর স্পষ্ট হয়ে উঠল। মনে হল ছবি নয়, যেন বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি। হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীতে এক উন্নত সভ্যতা ছিল। তখনকার মানুষ আকাশে উড়তে পারত। এমন যন্ত্র তৈরি করতে পারত যার সাহায্যে একজনের চিন্তা আর একজনের মনে পৌঁছে দেওয়া যেত। চিন্তাগুলো ছবির মতো ফুটে উঠত। নিউক্লিয়ার ফিসানের কৌশল তারা আয়ত্ব করেছিল। তারা এমন বোমা ফাটিয়েছিল যে পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল। কোন কোন দেশ সাগরের গভীরে নিমজ্জিত হয়েছিল আবার সাগরের তলদেশ থেকে উঠে এসেছিল বিরাট ভূখণ্ড। তাই হয়তো আমরা সারা পৃথিবীর পুরাণে জল-প্লাবনের গল্প দেখি।' লামা বলতে লাগলেন, 'এই রকম গুপ্ত গুহা মিশরে আছে। ঠিক এই রকম যন্ত্রপাতি সমেত গুপ্ত গুহা আছে দক্ষিণ আমেরিকায়। কোথায় আছে তাও আমি জানি। সেই

সভ্য মানুষেরা তাদের জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের জন্য লুকিয়ে রেখে গেছেন। যখন সময় হবে তখন এগুলো আমরা খুঁজে পাব।'

এর পর রামপা, তার গুরু লামা মিঙ্গার দণ্ডুপ ও অন্য পাঁচজন লামা সেই প্রাচীনদের গুহায় গেলেন। গুরু আগে যে সব যন্ত্রপাতির কথা বলেছিলেন রামপা সেই সব অদ্ভুত যন্ত্রপাতি দেখলেন, অদ্ভুত সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন। তারপর ওঁর ভাষাতেই বলি: 'এই হলঘরটাতেও প্রচুর যন্ত্রপাতি রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে বহু শহর ও সেতুর মডেল। এক বিচিত্র ধরণের পাথর ও ধাতু দিয়ে এগুলো তৈরি। ধাতুগুলো চেনার ক্ষমতা আমাদের কারুরই ছিল না। কিছু কিছু মডেল আবার এক ধরণের স্বচ্ছ পদার্থের পাত্র দিয়ে ঢাকা ছিল। তবে এগুলো কাচ নয়। কি তাও বলতে পারব না।

একটি লাল চোখ এতক্ষণ অজান্তে আমাদের লক্ষ্য করছিল, জানতে পেরে আমরা সকলেই প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। আমি তো প্রায় ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিলাম। আমার গুরু লামা মিঙ্গার দণ্ডুপ সেই লাল চোখওলা যন্ত্রটার কাছে এগিয়ে গিয়ে যন্ত্রটার হাতলে চাপ দিলেন। লাল আলোটা নিভে গেল। পরিবর্তে আমরা একটি ছোট্ট ঘরের ভিতরকার ছবি দেখতে পেলাম। ঘরটিতে মূল হলঘর থেকে যাওয়া যায়।

মগজে টেলিপ্যাথিক নির্দেশ পেলাম। এখান থেকে বেরুবার আগে ওই ছোট্ট ঘরে যাবে। যে পথ দিয়ে এই গুহায় ঢুকেছ সেই পথ বন্ধ করে দেওয়ার মালমশলা ওই ছোট ঘরে পাবে। আমাদের এই সব যন্ত্রপাতির কলা-কৌশল বোঝার মতো স্তরে যদি তোমরা না পৌঁছে থাক তাহলে এগুলো নষ্ট কোরো না। এই গুপ্তগুহার পথ বন্ধ করে দিয়ে চলে যাও। বিবর্তনের মাধ্যমে যখন তোমাদের বংশধররা আরো উন্নত হবে এবং এই সব যন্ত্রপাতির কলা-কৌশল বুঝতে পারবে তখন এগুলো তাদের অনেক কাজে লাগবে, তাদের জন্য এ সব রেখে দাও।' হয়তো নিছক গল্পই এটি—কিন্তু এ রকম একটি আবিষ্কার ঘটে যেতেও তো পারে।

মিশরের পিরামিড কি একটি কালাধার ?

একটি প্রাগৈতিহাসিক উন্নত সভ্যতাকে প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থায় আমরা হাতে পেয়েছি। এ সভ্যতা হচ্ছে নীলনদ-সভ্যতা বা মিশর-সভ্যতা। এই সভ্যতার আশ্চর্য নিদর্শন খুফুর তৈরি গীজের বিশাল পিরামিড। অনুমান করা হয় প্রায় সাড়ে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এই পিরামিড নির্মিত হয়। মিশরে যে ৭০টি পিরামিড আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে গীজের পিরামিড সব দিক থেকে বড়। বর্তমানে যদিও এর মাথার দিক থেকে কিছু অংশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে তবুও এর উচ্চতা প্রায় ৪৫ তলা বাড়ির সমান। পঁচিশ লক্ষ পাথরের ব্লক দিয়ে এটি তৈরি। এবং এক একটি পাথরের ব্লকের ওজন প্রায় আড়াই টন থেকে বারো টন।

এই পিরামিডটি কেবল মাত্র বিশালত্বের জন্যই কিন্তু বিখ্যাত নয়। এটি যেন এক বিশাল কালাধার বা টাইম-ক্যাপসুল। প্রাগৈতিহাসিক এক সভ্যতার বিস্ময়কর জ্ঞানভাণ্ডার যেন এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যেও যার সব রহস্য আমরা ভেদ করতে পারছি না। প্রাচীন উন্নত সভ্যতার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এ যেন এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

মিশরের স্থানীয় ক্রীশ্চান, যাদের কপ্টস বলা হয়, তারা পিরামিডের গুপ্ত রহস্যের কথা জানতেন। এই কপ্টদের আদিপুরুষরাই ছিলেন প্রাচীন মিশরীয়। মাস্সুদি লিখিত কপ্টদের একটি বইয়ে পাওয়া যায় : 'সুরিদ নামে জনৈক মিশরীয় রাজা জলপ্লাবনের পূর্বে···দুটি পিরামিড তৈরি করান। সেই রাজা পুরোহিতদের হুকুম দিয়েছিলেন যে তারা তাদের সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার ও বিভিন্ন শিল্প, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যামিতির জ্ঞান যেন এই পিরামিডের মধ্যে সযত্নে রেখে দেন, যাতে ভবিষ্যতের কোন সভ্য জাতি এর মর্মোদ্ধার করে তা থেকে উপকৃত হয়।'

খ্রীঃ পূঃ ৭০০ অব্দে আরবরা মিশর জয় করে কপ্টিক উপকথা সম্বন্ধে জানতে পারে। তারা আরও জানতে পারে যে পিরামিডের

মধ্যে প্রচুর ধনরত্ন ও জলপ্লাবনের পূর্বেকার লেখা পুঁথি আছে। আরবরা আরও জানতে পারে যে এমন অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব যাতে কখনো মরিচা পড়ে না। এমন কাচ তৈরি করা সম্ভব যা কখনো ভাঙে না। আরবদের উপকথায় অভঙ্গুর কাচের বহু উল্লেখ আছে। ফারাওরা আলেকজান্দ্রিয়ায় ৬০০ ফুট উঁচু কাচের বাতিঘর তৈরি করেছিলেন সে কথা আরবরা বিশ্বাস করত।

যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম পিরামিডের রহস্যের উপর আলোকপাত হল। নেপোলিয়ানের সৈন্যরা মিশর জয় করার পর ঠিক করল যে তারা মিশরের একটি মানচিত্র তৈরি করবে। এবং গীজের বিশাল পিরামিডকে কেন্দ্র করে এই মানচিত্র আঁকার কাজ শুরু করা হবে। দেখা গেল পিরামিডের এক দিকের দেওয়াল মেরু-অক্ষের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আধুনিক কম্পাস ছাড়া মেরু-অক্ষের এ রকম নিখুঁত হিসেব বের করা তো দুরূহ ব্যাপার। এর পর লক্ষ্য করা গেল যে দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণের রেখা যদি কোণাকুণি বাড়ানো যায় তাহলে এই বর্দ্ধিত রেখা দুটিই নীলনদের ব-দ্বীপকে বেষ্টন করে ফেলে। তাছাড়া পিরামিডের শীর্ষদেশ দিয়ে যে মধ্যরেখা বা মেরিডিয়ান গেছে সেই রেখা নীলনদের ব-দ্বীপকে ঠিক দু'ভাগে ভাগ করে ফেলে।

গত ২০০ বৎসরেরও বেশি পুরাতত্ত্ববিদ, বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, মানচিত্রকার, স্থপতি, জ্যোতিষী এবং গুপ্তরহস্যবাদীরা পিরামিড নিয়ে তন্নতন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। পিরামিডের স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এর পাথরের বুকে এমন সব রহস্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে যা কেবলমাত্র উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকেই বোধগম্য হতে পারে।

আর্কিমিডিস প্রভৃতি গ্রীক গণিতবিদরা পাই (π) এর মান হিসেব করে বের করেছিলেন ৩.১৪২৮ পর্যন্ত। এর থেকে সঠিক মান তারা বের করতে পারেন নি। কিন্তু পিরামিডের চারপাশের পরিধিকে এর উচ্চতার দু'গুণ দিয়ে ভাগ করলে পাই (π) এর মান পাওয়া যায়

৩'১৪১৬। পৃথিবীর ভৌগোলিক মাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পিরামিড-ইঞ্চির হিসেব বের করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। মেরু-অক্ষের ১/১০০০০০০০ বা কোটি ভাগের এক ভাগের সমান হচ্ছে ৫০ পিরামিড-ইঞ্চি।

ফরাসী বৈজ্ঞানিকরা পরবর্তী কালে মাপের একক হিসেবে আবিষ্কার করেছিলেন মিটার, যা মধ্যরেখা বা মেরিডিয়ানের কোটি ভাগের এক ভাগের সমান। ফরাসী বৈজ্ঞানিকরা তখন পর্যন্ত অবশ্য পিরামিড-ইঞ্চির রহস্য জানতেন না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ফরাসী বৈজ্ঞানিকদের থেকেও মিশরীয়দের গণনা ছিল নির্ভুল। কারণ এক একটি মধ্যরেখার এক এক রকম মাপ আর পৃথিবীর পৃষ্ঠও সব জায়গায় সমান নয়, সেদিক থেকে মেরু-অক্ষ অধিকতর নির্ভুল হিসাব দেয়।

এই পিরামিড-ইঞ্চি আবিষ্কারের ফলে আরো বহু অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন: পিরামিডের গোড়ার চারপাশের পরিধির মাপ হচ্ছে ৩৬৫'২৪০ পিরামিড-ইঞ্চি। আমাদের পার্থিব বছর তো ৩৬৫.২৬০ দিনে। পিরামিডের উচ্চতাকে এককোটি দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্বের পরিমাণ। এক পিরামিড ইঞ্চিকে দশকোটি দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় পৃথিবীর কক্ষপথের মাপ। পিরামিডের চারপাশের দৈর্ঘ্যকে দ্বিগুণ করলে পাওয়া যায় বিষুবরেখায় উপরকার এক ডিগ্রির এক মিনিটের মাপ। পিরামিড-ইঞ্চির হিসাব মতো যা ১৮৪২'৯২ আধুনিক হিসেব মতো তা হচ্ছে ১৮৪২'৭৮। পিরামিডটি এমন ভাবে তৈরি যে এর উচ্চতার সমান ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে যদি একটি বৃত্ত আঁকা হয় তাহলে সেই বৃত্তের আয়তনের সঙ্গে পিরামিডের গোড়াকার বর্গক্ষেত্রের আয়তন সমান হবে। কি অদ্ভুত জ্যামিতিক কুশলতা!

পৃথিবীর মেরু-অক্ষরেখা স্থির থাকে না। প্রতি ২৫৮২৭ বছরে তা আবার পূর্বেকার স্থানে ফিরে যায়। পিরামিডের গোড়ার কোণগুলো থেকে টানা কোণাকুণি রেখাগুলোর যোগফল হচ্ছে ২৫৮২৬'৬। পিরামিডের ওজন ৬,০০,০০০ টন।

কায়রোর আয়েন সামস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Amr Gonied আই বি এম ১১৩০ কমপিউটারের সাহায্যে খেফ্রেন পিরামিডের গুপ্তকক্ষের সন্ধানে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর ফলে যে সব নথিপত্র জমা হয়েছিল সেই সব নথিপত্র বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন, 'বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে এ ঘটনা অসম্ভব বলেই মনে হয়। তবু এর মধ্যে এমন একটি রহস্য লুকিয়ে আছে যা আমাদের ব্যাখ্যার অতীত···পিরামিডের মধ্যে এমন একটি শক্তির উৎস আছে যা বিজ্ঞানের সব নিয়মকে অগ্রাহ্য করে চলেছে।'

সেই সে যুগে মহাজাগতিক রশ্মির চেয়েও কোন শক্তিশালী শক্তির কথা কি পিরামিড-নির্মাতারা জানতেন? Andrew Tomas ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোর এক সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার শিরোনামা ছিল—Is there a Generator under the Khufu Pyramid?

এই সব কারণে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে পিরামিডগুলি ফারাওদের মৃতদেহ রাখার জন্য নির্মিত হয় নি, এগুলি নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। Erich Von Daniken তাঁর Chariots of the Gods? বইয়ে মন্তব্য করেছেন: 'কে বিশ্বাস করবে যে পিরামিড শুধু রাজাদের কবরখানা? এত গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যার নিদর্শন তারা কি এমনি এমনি রেখে গেছেন?'

মিশরের সব পিরামিডে কিন্তু ম্যমি পাওয়া যায় নি। মিশরের ফারাওদের সংখ্যার থেকে পিরামিডের সংখ্যা অনেক কম। বিখ্যাত ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস যিনি Abu Simbel-এ আস্ত পাহাড় কেটে ৬৫ ফুট উঁচু নিজের মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন তার ম্যমি কিন্তু কোন পিরামিডে খুঁজে পাওয়া যায় নি। খুব সম্ভবত মিশরের অন্যান্য পিরামিড গীজের পিরামিডের নকল, কারণ এগুলি মোটেই রহস্যময় নয়।

মিশরের প্রাচীন ইতিহাস কি রকম যেন গোলমেলে। মনে হয় এই উন্নত সভ্যতা যেন হঠাৎই প্রায় ৪০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বিকশিত হয়ে উঠেছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে। এর আগের ইতিহাস তো প্রস্তর যুগের ইতিহাস। বিবর্তনের কোন ধারাবাহিক নিদর্শনই খুঁজে পাওয়া যায় না মিশরে। তাহলে কোথা থেকে এরা এসেছিলেন?

অনেকে বলেন মিশর সভ্যতার আগে সাহারা ছিল শস্যশ্যামলা দেশ—আজকের মতো ভয়ঙ্কর মরুভূমি নয়। তাহলে সেই শস্যশ্যামলা দেশ হঠাৎ কি করে মরুভূমিতে পরিণত হল? পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার জন্যই কি? মিশর সভ্যতার আদিপুরুষরা কি সরাসরি মহাকাশের কোন গ্রহ থেকে পারমাণবিক মহাকাশযানে চড়ে সাহারায় এসে নেমেছিলেন? তাই কি সাহারার টাসিলিতে প্রাচীনকালের মহাকাশচারীর ছবি আঁকা আছে? নাকি এরাও প্রথম নেমেছিলেন লেমুরিয়াতে তারপর চলে এসেছিলেন নীল নদের তীরে? এখুনি এ কথার সরাসরি জবাব দেওয়া হয়তো সম্ভব নয়; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এ রহস্যেরও সমাধান হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মায়া রহস্য

মেক্সিকো রাজ্যের যুকটান উপদ্বীপের রাজধানী মেরিডা শহরকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর আর একটি প্রাচীন রহস্যময় সভ্যতার নিদর্শন। এ হচ্ছে মায়া-সভ্যতা। এও আর এক পিরামিড-কৃষ্টি তবে এরা মিশরের মতো পিরামিড তৈরি করতেন না—এদের পিরামিড হচ্ছে স্টেপ পিরামিড বা থাক-পিরামিড। মেরিডার কাছাকাছি আর কয়েকটি উপকেন্দ্রের নাম হচ্ছে লাবনা, শায়লী, কাবা, ইজমাল, চিচেনইৎজা, জীবিল স্থূলতুন ইত্যাদি।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে Stephen বিরচিত ও Catherwood বিচিত্রিত Incidents of travel in Central America, Chiapas and Yucaton নামে বইটি প্রকাশিত হবার পর মায়া-সভ্যতা সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য জগৎ সজাগ হল। Stephen মায়া-সভ্যতার অনুসন্ধানে জীবনপাত করেন। সেইজন্য তাঁকে মায়া-প্রত্নতত্ত্বের জনক বলা হয়।

মায়া অঞ্চলের স্থাপত্য দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ দক্ষিণ আমেরিকার বুকে এ সভ্যতা কি করে সৃষ্টি হয়েছিল? যেখানে রাস্তাঘাট নেই সেখানে বিশাল বিশাল পাথর দিয়ে কি করে সেই প্রাচীন সভ্যতার আদিপুরুষরা ধাপে ধাপে তোলা উঁচু পিরামিড এবং এই পিরামিডের মাথার চাতালের উপর বিরাট বিরাট প্রাসাদ বা মন্দির গড়ে তুলেছিলেন? এই পিরামিডের গঠন পদ্ধতি প্রযুক্তিবিদ্যার এক স্থায়ী নিদর্শন যা ভূমিকম্পেও ধসে পড়ে না।

এই সব উঁচু প্রাসাদ বা মন্দির থেকে প্রধান পুরোহিত জনগণের জীবনযাত্রার নানা আদেশ ও উপদেশ জারী করতেন। এ ছাড়া ছিল সাধারণ স্নানাগার, ধর্মাধিকরণ, বৃদ্ধাদের অবসরভবন, নভোবীক্ষণাগার, বীরমন্দির, ঐন্দ্রজালিক ভবন, রাজভবন, বাজার, সাধারণের জল সরবরাহের জন্য কূয়া ইত্যাদি। চিচেনইৎজার কূয়া নাকি কোন পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।

বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ মনে করেন মায়া-সভ্যতার আদিপুরুষরা এসেছিলেন মিশর থেকে, সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন পিরামিড তৈরির কলা-কৌশল। আবার আর একদল বিজ্ঞানীর ধারণা মিশর-সভ্যতার আদিপুরুষরা গিয়েছিলেন মায়া-সভ্যতার দেশ থেকে। হয়তো মিশর ও মায়া-সভ্যতার পূর্বপুরুষরা একই জায়গা থেকে দুই দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ থেকে জাহাজে করে যেমন ভারতীয়রা ছড়িয়ে পড়েছিলেন যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি জায়গায়, তেমনই তারাই আরো দূরে পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছিলেন মধ্য আমেরিকার ভূখণ্ডে। তারপর সেখানে তারা গড়ে তোলেন গোপুরমের মতো বিরাট বিরাট স্তূপ। এখানকার আদিম অধিবাসীদের চেহারার সঙ্গে বাঙালী ও কেরলবাসীদের চেহারার যথেষ্ট মিল আছে। কেউ কেউ বলেন এরা লুপ্ত আটলান্টিসের অধিবাসী ছিলেন এবং আটলান্টিস সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার সময় সেখান থেকে পালিয়ে মধ্য আমেরিকায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

মায়ারা গণিত, জ্যোতিষ ও শিল্পকলায় যথেষ্ট উন্নত ছিলেন। মহেঞ্জোদড়োর মানুষদের মতো এরাও চাকার ব্যবহার জানতেন। মায়াদেরও লিখিত ভাষা ছিল। মহেঞ্জোদড়ো-হরাপ্পা এবং ইস্টার দ্বীপের ভাষার মতো এ ভাষারও পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি আজো। 'সাইবেরিয়ান অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স'-এ রাশিয়ানরা কমপিউটারের সাহায্যে এর পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেও সফল হন নি।

মায়ারা এক ধরণের সুড়ঙ্গ তৈরি করতেন। এই সুড়ঙ্গগুলিকে বলা হয় 'ললটান'। মাটির নিচে বহু দূর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। Michael D'Obrenovic এবং Manson Valentine নামে দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানী একটি ললটানে অভিযান চালান। D'Obrenovic ললটানের ভিতরের ছবি তোলার চেষ্টা করেন। নটি ছবির মধ্যে আটটি ছবিই নষ্ট হয়ে যায়। একটি ছবি প্রিন্ট করে দেখা যায় উজ্জ্বল কোন একটি বস্তুর ছবি উঠেছে। উজ্জ্বল বস্তুটি যে কি তা ওরা বুঝতে পারেন নি, তবে ওঁরা এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে মায়া

পুরোহিতরা হয়তো এক শক্তিশালী ফোর্স-ফিল্ডের আড়ালে কোন গুপ্ত রহস্য সুরক্ষিত করে রেখে গিয়েছেন। এই ফোর্স-ফিল্ডের শক্তির উৎস কি বা তার আসল প্রকৃতিই বা কি তা ওঁরা বুঝে উঠতে পারেন নি। খুফুর পিরামিডের মধ্যে যে রকম এক অজানা শক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে—এখানেও তাই। যাই হোক, D'Obrenovic কোন রকমে মরতে মরতে বেঁচে লনটান থেকে বেরিয়ে আসেন। তারপর ওই সুড়ঙ্গ গবেষণায় আর কেউ বেশী দূর এগুতে সাহস করেন নি।

মাদ্রিদের রয়াল এ্যাকাডেমীতে Accounts of things in Yucaton নামে একটি বই গত তিনশো বছর ধরে পড়ে ছিল। যুকাটনের দ্বিতীয় বিশপ দিয়াগো দি লাণ্ডু এটির লেখক। এই বইয়ে মায়া সভ্যতার নানা তথ্য চিত্রায়িত ও লিপিবদ্ধ করা আছে। তিনি মায়াদের ২০ দিনে একমাস ও ১৮ মাসে এক বছর হিসেব করার কথা লিখে গেছেন। দীর্ঘসূত্রতা বোঝাতে এখনো আমরা 'আঠারো মাসে বছর' বলি। ব্যাপারটা কৌতূহলোদ্দীপক নয় কি?

মায়াদের পঞ্জিকা এক বিস্ময়কর জিনিস।

২০ কিন (দিন) = ১ উইনাল (মাস)
১৮ উইনাল = ১ টুন (বৎসর ৩৬০ দিন)*
২০ টুন = ১ কাটুন (৭,২০০ দিন = ২০ বৎসর)
২০ কাটুন = ১ বাকটুন (১,৪৪,০০০ দিন = ৪০০ বৎসর)
২০ বাকটুন = ১ পিকটুন (২৮,৮০,০০০ দিন = ৮,০০০ বৎসর)
২০ পিকটুন = ১ কালাবটুন (৫,৭৬,০০,০০০ দিন = ১,৬০,০০০ বৎসর)
২০ কালাবটুন = ১ কিঞ্চিলটুন (১,১৫,২০,০০,০০০ দিন = ৩২,০০,০০০ বৎসর)
২০ কিঞ্চিলটুন = ১ আলাউটুন (২৩,০৪,০০,০০,০০০ দিন = ৬,৪০,০০,০০০ বৎসর)

* ভারতীয়রা দৈবী বছর ও ব্রহ্মার দিনের হিসেব করার সময় ৩৬০ দিনে পার্থিব বৎসর ধরেছেন। এই প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে।

মায়ারা সময়ের হিসেব করতে ২৩ এর পিঠে নটি শূন্য বসাতো। সময়ের এ রকম বিশাল একক কি কাজে লাগত মায়াদের? মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ও মহাকাশ গবেষণার জন্যই বিজ্ঞানীরা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব বোঝাবার জন্য আলোক-বর্ষ ইত্যাদি বিশাল একক ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন।

প্রাচীন ভারতীয়রাও বিশাল ও সূক্ষ্ম হিসাবে পারদর্শী ছিলেন। We are not the first বইয়ে Andrew Tomas উল্লেখ করেছেন: '১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের আম্বাটুরের কন্যাযোগীর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম। তাঁর মতে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের সময় মাপবার পদ্ধতি ছিল বৈজ্ঞিক। এই প্রসঙ্গে তিনি 'বৃহৎ শতক' এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনকালে সময়ের সূক্ষ্মভাগ করা হত এই ভাবে:

১ দিন	=৬০ কাল (২৪ মিনিটের সমান)
১ কাল	=৬০ বিকাল (২৪ সেকেণ্ডের সমান)
১ বিকাল	=৬০ পার
১ পার	=৬০ তাৎপার
১ তাৎপার	=৬০ বিতাৎপার
১ বিতাৎপার	=৬০ ইমা ইত্যাদি

এইভাবে শেষ এককের নাম হচ্ছে 'কাস্ত' অর্থাৎ এক সেকেণ্ডের তিরিশ কোটি ভাগের একভাগ। সময়ের এ রকম সূক্ষ্মতম ভাগ তো দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজে লাগে না। লাগে গাণিতিক গবেষণা, কমপিউটার গণনা ও মহাকাশযান পাঠাবার সময়। এগুলি নিশ্চয় কাজে লাগত, তা না হলে অযথা কেউ এগুলো তৈরি করে নি।

Daniken তাঁর Chariots of the Gods? বইয়ে সুমেরীয়দের গাণিতিক দক্ষতার কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন: 'On the hill of Kuyundjik (former Nineveh) a calculation was found with the final result in our notation of 195,955,200,000,000. A number with fifteen digits!'

প্রাচীন ভারতীয়রা এর থেকেও বড় সংখ্যা খুব সাধারণ ভাবে ব্যবহার করতেন। ব্রহ্মার জীবৎকালের সময়কে বলা হয় পরা, পরার অর্ধেক হচ্ছে পরার্দ্ধ। পরার্দ্ধ প্রকাশ করা হয় একের পিঠে সতেরোটা শূন্য দিয়ে।

লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের দূত শুক রাবণকে জানাচ্ছেন রাম কত সৈন্য নিয়ে লঙ্কায় এসেছেন। তিনি যা হিসেব দিচ্ছেন তা প্রকাশ করতে হলে মোটামুটি একের পিঠে ছেষট্টিটি শূন্য বসাতে হয়। রীতিমত astronomical figure!

যাই হোক, আবার মায়াদের কথায় ফিরে আসি। মায়াদের পুরোহিতরা কিন্তু অন্য একটি সময়পঞ্জী ব্যবহার করতেন, যাকে বলা হয় জোলকিন (Tzolkin)। এতে দেখা যায় ২০ দিনে মাস ও ১৩ মাসে বৎসর—অর্থাৎ ২৬০ দিনে বৎসর। পার্থিব বৎসর অপেক্ষা ১০০ দিন কম। এইরূপ অদ্ভুত একটি সময়পঞ্জী ব্যবহার করতেন কেন পুরোহিতরা? অহেতুক খেয়ালের বশে? বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয় এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল সেইজন্য একমাত্র পুরোহিতরাই এর ব্যবহার জানতেন। তবে কি মায়ারা যে গ্রহ থেকে এসেছিলেন এ সময়পঞ্জী সেই গ্রহের? নিজেদের গ্রহের সময়ের হিসাব রাখবার জন্য এটিকে ব্যবহার করা হত?

দেব-গন্ধর্বরা কি গ্রহান্তরের মানুষ ?

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হল তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—তা হচ্ছে এই যে পৃথিবীতে সভ্য মানুষের অস্তিত্ব মাত্র ৬০০০ বৎসরের পুরাতন নয়, তার থেকেও বহু পুরাতন—হয়তো কয়েক হাজার নয়, কয়েক লক্ষ বৎসরের পুরাতন। শেষ তুষার যুগের পূর্বেও পৃথিবীতে সভ্য মানুষের বাস ছিল। আমরা আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির সাহিত্য শিল্প-কীর্তি ও স্থাপত্যের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের গণিতবিদ্যা, মহাকাশ-বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রগাঢ় জ্ঞান। এ থেকে স্বভাবতই মনে হয় যে পৃথিবীতে সভ্যতা সৃষ্টিকারী মানুষেরা পৃথিবীর আপন সন্তান নয়—তারা তার সপত্নী সন্তান—তারা ভিন্‌গ্রহবাসী।

আমেরিকান জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী Carl Sagan-এর মত হচ্ছে, 'অন্যান্য ছায়াপথের আগন্তুকরা হয়তো বহুবার পৃথিবী ভ্রমণ করে গেছেন, তাদের ভ্রমণের কোন চিহ্ন যে পৃথিবীর বুকে পড়ে নেই সে কথা কে হলফ করে বলবে?' Carl Sagan আরও বিশ্বাস করেন যে '৫৫০০ বৎসর অন্তর অন্তর খুব সম্ভবত ঐ গ্রহান্তরের জীবরা পৃথিবীতে আসে।' সোভিয়েত বিজ্ঞানী জিওলকোভ্‌স্কি বলেছেন, 'আমাদের ইতিহাস এত অল্পকালের যে ইতিমধ্যে গ্রহান্তরের প্রাণীরা কতবার পৃথিবী অভিযানে এসেছে তা বলা শক্ত।'

প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্বে ভারতে আবির্ভূত হল আর্য নামে একটি জাতি। আমরা পূর্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে ঐতিহাসিক আর্য এবং বেদ-সৃষ্টিকারী আর্যরা এক নয়। মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের কোন অংশে অথবা রুশ দেশের উরাল পর্বতমালার দক্ষিণের সমতল ভূভাগে অর্থাৎ নিজেদের দেশে যে আর্যরা ছিল সভ্যতার নিম্ন স্তরে তারা ইরাণ, গ্রীস, ব্যাবিলনে ছড়িয়ে পড়তেই সভ্যতার চরম শিখরে আরোহন করল—সৃষ্টি করল বেদের মতো গ্রন্থ—এ তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহলে কি হতে পারে?

আসলে লেমুরিয়াতে ভিন্‌গ্রহবাসীরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। এই ভিন্‌গ্রহবাসীরা ছিল কয়েকটি গোষ্ঠিতে বিভক্ত। যেমন: দেবতা, দানব, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব, নাগ, যক্ষ ইত্যাদি। পরবর্তী কালে রাক্ষস গোষ্ঠি শক্তি সঞ্চয় করে সবার উপরে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করলে দেবতাদের সঙ্গে লাগে অসুরদের ঝগড়া (ইন্দ্র-বৃত্র), তারপর যক্ষদের সঙ্গে (কুবের-রাবণ) ইত্যাদি। দেবতারা লেমুরিয়া অঞ্চল ত্যাগ করে খুব সম্ভব ভারতের উত্তরে বিশাল হিমালয়ের বুকে আশ্রয় নেন। এখানে সহজে রাক্ষসরা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তাই দেখি রাবণ যখন কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দিলেন তখন কুবের দেবতাদের পক্ষে চলে গেলেন ও হিমালয়ের কৈলাসে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। যে নাগদের আমরা ঋষভ পর্বতে (অর্থাৎ লেমুরিয়াতে) দেখেছি তারাও পরবর্তী কালে দেবতাদের পক্ষে যোগ দেন ও হিমালয়ে চলে আসেন। রাক্ষসদের পরাজিত করতে হলে নিজেদের গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ না করে উপায় নেই। ফলে হিমালয়ে গড়ে উঠল মহাকাশ ঘাঁটি—সৃষ্টি হল দেবলোকের। এর জন্য সময় লাগল প্রচুর। ইতিমধ্যে লেমুরিয়া ডুবতে শুরু করেছে। লেমুরিয়াবাসী অসুর, গন্ধর্ব ইত্যাদিরা ছড়িয়ে পড়েছে সুমের, মহেঞ্জোদড়ো-হরাপ্পা, ইস্টার দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি জায়গায়। যারা রয়ে গেল তারা বাস করতে লাগল সুউচ্চ পর্বতশীর্ষগুলিতে। ইতিমধ্যে দেবতাদের যোগাযোগ হয়েছে নিজেদের গ্রহের সঙ্গে—আমদানী হয়েছে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার। এবার সঙ্গে করে কেউ নিয়ে এসেছেন উপনিষদ। বেদ আগেই এসেছিল। বেদ লিখিত গ্রন্থ নয়। বেদ এসেছিল অলিখিতভাবে বীজাকারে। কণ্ঠস্থ করে রাখার ফরমূলাও তৈরি করা হয়েছিল, যাতে বংশপরম্পরায় মনে রাখা সম্ভব হয়। বেদ গুরুমুখী বিদ্যা। গুরু না শেখালে বেদের জ্ঞান জন্মায় না। বেদ অপৌরুষেয়। ব্রহ্মা তপস্যাবলে বেদ দর্শন করেন তারপর তা শিষ্যদের শেখান। পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণীই নাকি বেদ। তাই বলা হয়, যেদিন থেকে সৃষ্টির শুরু বেদেরও শুরু সেইদিন থেকে।

আসলে দেবতাদের নিজেদের গ্রহের মনীষিরাই এই বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডারের সৃষ্টিকর্তা। ভূত অর্থাৎ ম্যাটারের অন্তর্নিহিত শক্তি তারা আবিষ্কার করেছিলেন। এবং যজ্ঞের মাধ্যমে সেই সব ভূতের শক্তিকে কাজে লাগাতেন। যেমন আমরা বয়লারে জল থেকে বাষ্প তৈরি করি, যেমন সৃষ্টি করি নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টরে পরমাণু শক্তির। দেবতাদের বিজ্ঞান খুব সম্ভবত ঠিক আমাদের বিজ্ঞানের মতো ছিল না; কিন্তু তার ফলাফল ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের ফলাফলের মতোই এই কথাটি ভালো করে মনে রাখলেই দেবতাদের বহু অতি-মানবিক কার্যকলাপ পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

পরবর্তী কালে যখন দেবতারা জাগতিক জীবনে ম্যাটারকে কাজে লাগিয়ে চরম ভোগসুখ করায়ত্ত করে ফেললেন তখন স্বভাবতই একটি দলের মনে প্রশ্ন জাগল—যে বস্তুকে কাজে লাগিয়ে এত সুখ ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া যায় সে বস্তু কোথা থেকে এলো? কে সেই বস্তু-সমূহের সৃষ্টিকর্তা? তখন সেই চিরন্তন প্রশ্নের পিছনে ছুটতে গিয়ে তারা মুখোমুখি হলেন এক আশ্চর্য সত্বার—যার নাম দিলেন তারা পরমব্রহ্ম। সৃষ্টি হল উপনিষদের। সেই পরমব্রহ্মকে যদি পাওয়া যায় তাহলে তো অনন্ত সুখ। কিন্তু কে তিনি? কি করে তাকে পাওয়া যায়? প্রশ্নের পর প্রশ্ন। উত্তর পেতেও দেরি হল না। সেই পরমব্রহ্মকে পাওয়ার পথও আবিষ্কার হল। অনেকেই সাক্ষাৎ পেলেন সেই অনন্ত মহাশক্তিমান পুরুষের। যোগ হচ্ছে সেই পথ। এবং এই যে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটল তা ঘটল সেই নিজেদের গ্রহে। তাই আগেই যে অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্বরা পৃথিবীতে নেমে এসেছিল তারা এই আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল না এবং এই কারণেই দেবতারা বা আর্যরা পূর্ববর্তী কালে গ্রহ ছেড়ে আসা নিজেদের গোষ্ঠিদের একটু করুণার চোখে দেখতে লাগলেন এবং তাদের অনার্য, রাক্ষস বলে অভিহিত করলেন।

অনার্য রাবণও কি বেদ বিশারদ ছিলেন?

ঐতিহাসিকরা বলেন বেদ আর্যদের সৃষ্টি, তাহলে অনার্য রাক্ষস রাবণের তো বেদ সম্বন্ধে কিছু জানবার কথা নয়। অথচ রামায়ণে দেখি রাবণ বেদবেত্তা ছিলেন এবং লঙ্কায় রাক্ষসরা বেদ পাঠ করতেন।

সুন্দরকাণ্ডে হনুমান সীতার খোঁজে লঙ্কায় গিয়ে 'স্থানে স্থানে বাহ্বাস্ফোট, সিংহনাদ এবং স্বাধ্যায়নিরত রাক্ষসদিগের মন্ত্রধ্বনিও শুনিতে পাইলেন। পরে তিনি বেদধ্যায়ী পূজা-নিরত এবং রাবণের স্তুতিপাঠক নিশাচরদিগকে দেখিতে পাইলেন।'

লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ একদিন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে সীতাকে কেটে ফেলার জন্য অশোকবনে ছুটে গিয়েছিলেন তখন মন্ত্রী সুপার্শ্ব তাঁকে এই বলে শান্ত করেছিলেন—'হে দশানন! আপনি বৈশ্রবণের (কুবেরের) সাক্ষাৎ অনুজ সহোদর হইয়াও কি প্রকারে ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈদেহীকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? হে বীর রাক্ষসেশ্বর! যথাবিধি ব্রত ও বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া এবং তদনুরূপ অগ্নিহোত্রাদি স্বকর্ম্মে অনুরক্ত থাকিয়াও আপনি কি নিমিত্ত স্ত্রীবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? মহারাজ! আপনি এই বরবর্ণিনী মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সহিত রণমধ্যে সেই রামচন্দ্রের উপর কোপ প্রকাশ করুন।'

যজ্ঞ ও হোমও রাক্ষসদের অজানা ছিল না।—'ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধজয় সাধনভূত নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়া আপন রথের চারিদিকে রাক্ষসগণকে সংস্থাপন পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা যথাবিধি হোম করিলেন। সেই প্রতাপশালী রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ অগ্রে অগ্নিতে মাল্য ও গন্ধ প্রদান করিয়া তৎপরে লাজাদিদ্বারা তদীয় সংস্কার সম্পাদন করত ঘৃতাহুতি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শাস্ত্র সকলই আস্তরণভূত শরপত্রস্বরূপ হইল। সেই যজ্ঞে বিভীতক কাষ্ঠ, রক্তবর্ণ বস্ত্র এবং কৃষ্ণলৌহ নির্ম্মিত স্রুব সমাহৃত হইলে, ইন্দ্রজিৎ তোমররূপ শরপত্রদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিয়া, সেই প্রজ্বলিত

হুতাশনে একবার হোম করিবামাত্র অগ্নি ধূমবিহীন হইলেন এবং তদী: উদ্গত শিখাসকল বিজয়সূচক চিহ্নসমূহ প্রকাশ করিল।' (লঙ্কাকাণ্ড

শিব হচ্ছেন রুদ্র। তাঁর এক নাম যোগেশ্বর। শিবপত্নী হচ্ছে শক্তি বা মহাকালী। শিব ও শিবপত্নী হচ্ছেন তন্ত্রের আদি দেবদেবী তন্ত্র নাকি শিব-মুখনিঃসৃত। অনেকে মনে করেন তান্ত্রিক পুঁথি বে অপেক্ষাও প্রাচীন। তাই বেদ ও পুরাণেও শিব-শক্তির যথেষ্ট প্রভাব ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ সাহিত্য, উপনিষদ প্রভৃতিতে শক্তিবাদে যথেষ্ট প্রভাব। ঋগ্বেদের গৌরী (১.১৬৪), গায়ত্রী (৩.৬২.১), নব মণ্ডলের 'সোম', দেবীসূক্ত (১০.১২৫) এবং রাত্রিসূক্ত (১০.১২৭ প্রভৃতি মন্ত্র শক্তিতত্ত্বের দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বশীকরণাদি ষট্‌কর্ম তান্ত্রিক ক্রিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট—তাও ঋগ্বেদে ইতস্তত ছড়ানো। অথর্ববেদ তো 'শান্তি-পৌষ্টিকাভিচারাদি কর্ম প্রতিপাদকত্বে অত্যন্ত বিলক্ষণ এব।' কেনোপনিষদের উমা-হৈমবতী উপাখ্যান তে বহু বিখ্যাত।

তন্ত্র হচ্ছে সাধন শাস্ত্র। এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা ফলিত সাধনা। তন্ত্রে তাই সাধনা, সাধনক্রম ও সাধন প্রণালীর বর্ণনা থাকে। তন্ত্র প্রধানত উপাসনা পদ্ধতি। যন্ত্র, মণ্ডল, আসন, মন্ত্র, ন্যাস, ধ্যান, যোগ, মুদ্রা ও পূজা—এই সব তন্ত্র উপাসনার অঙ্গ। জীব সত্তার সুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করে সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতালাভ ও পরিশেষে মোক্ষলাভ তন্ত্র সাধনার লক্ষ্য। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ গুহ্য, গুরুমুখী ও রহস্যময়।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে তন্ত্রাচারের উৎস অতি আদিম। সেই আদিম উৎস থেকে দর্শন বা তত্ত্ব-বিরহিত তন্ত্রাচার অবিস্মরণীয় কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে।

তন্ত্র কি তাহলে বেদের আদিরূপ? প্রথম যখন দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষসরা পৃথিবীতে এসেছিলেন তখন তাদের গ্রহেও কি তন্ত্রের প্রচলন ছিল—পরবর্তী কালে যা পরিণতি লাভ করে বেদে ও উপনিষদে?

কারণ আমরা দেখি রাবণ বেদ অধ্যয়ন করেন আবার শিবপূজাও করেন। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎও শিবের বরে বলিয়ান। আবার মহেঞ্জো

দড়োর গন্ধর্ব বা অনার্যরাও শিব-কালীর পূজা করেন। উত্তরকাণ্ডে একস্থানে আমরা দেখি—'রাক্ষসপতি রাবণ যে যে স্থানে যায়, রাক্ষসেরা প্রতিদিন সেই সেই স্থানে জাম্বুনদময় লিঙ্গ লইয়া যায় রাবণ বালুকাবেদীমধ্যে সেই লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক অমৃতের ন্যায় সুগন্ধি গন্ধ এবং পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে লাগিল। পরে সাধুদিগের ক্লেশহারক বরদ চন্দ্রচূড় প্রভু মহাদেবকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া সেই রাক্ষস রাবণ হস্তসকল প্রসারণপূর্ব্বক নাচিতে এবং গান করিতে লাগিল'

উত্তরকাণ্ডে আরো এক স্থানে দেখি রাবণ চন্দ্রালোকে গিয়ে চন্দ্রকে পীড়ন করতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মা সেখানে এসে দশাননকে অনুরোধ করলেন চন্দ্রকে কষ্ট না দিতে, বিনিময়ে তিনি এক অমোঘ মন্ত্র রাবণকে দান করলেন। এই মন্ত্র হচ্ছে মহাদেবের স্তুতিমন্ত্র।

লঙ্কাকাণ্ডে দেখি হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করে চলে যাওয়ার পর রাবণ রাক্ষসদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসেছেন। রাক্ষসরা রাবণের শক্তির প্রশংসা করে বললেন, মহারাজ, আপনাকে যুদ্ধে যেতে হবে কেন? 'আপনি বিশ্রাম করুন, এই ইন্দ্রজিৎ একাকীই বানরগণকে জয় করিবেন' রাজন! ইন্দ্রজিৎ উত্তম মাহেশ্বর যজ্ঞ করিয়া মহেশ্বরের নিকট হইতে দুর্লভ বর প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

আর্যরা এ দেশে আসার পূর্বে ভারতে শিবপূজার প্রচলন ছিল মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া একটি শীলমোহরে দেখা যায় যে একজন দেবতা যোগাসনে বসে আছেন। মাথায় তার মোষের শিং লাগানো মুকুট হাতে তাগা, অনন্ত, গলায় হার, মুখে রঙ লাগানো। দু'পাশে হিংস্র পশু। ডানদিকে একটি গণ্ডার, একটি মেষ এবং বাঁদিকে একটি হাতি ও বাঘ। সিংহাসনের নিচে খুব সম্ভবত একটি ঊর্ধ্বমুখী ছাগল।

John Marshall-এর মতে এটি পশুপতি বা শিবের মূর্তি। এই ধরণের আর একটি শীলমোহরে একটি দেবতার মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় যিনি উচ্চাসনে বসে আছেন। এর মাথায় অবশ্য শিংওলা মুকুট নেই, তবে এর দু'পাশে দুজন লোক যোগের ভঙ্গিতে বসে আছে। লোক দুটির পিছনে বিরাট দুটি সাপ ফণা তুলে রয়েছে। সিন্ধুবাসীদের

শীলমোহরের বহু চিহ্নের সঙ্গে তান্ত্রিক সাংকেতিক চিহ্নের যথেষ্ট মিল আছে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মহেঞ্জোদড়ো ও হরাপ্পায় আবিষ্কৃত মৃন্ময়ী স্ত্রীমূর্তিগুলি প্রমাণ করে যে বৈদিকযুগের বহু পূর্বে অতি প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে শক্তি সাধনা প্রচলিত ছিল

Alexandar Kondratov তাঁর The Riddles of the Three Oceans বইয়ে মন্তব্য করেছেন: 'The tantric scriptures may have been developed and systematised by Proto-Indian priests, for a long number of Proto-Indian signs and symbols are identical with the tantric.'

মধ্য ও উত্তর ভারতে মুসলমান আক্রমণের সময় বহু প্রাচীন তান্ত্রিক পুঁথি বিনষ্ট হয়েছে। ভারতীয় তান্ত্রিকদের বহু পুঁথি তিব্বতে বৌদ্ধ মঠ ও গুম্ফায় রক্ষিত আছে। এগুলি সবই তিব্বতী ভাষায় অনূদিত। কিছু সংস্কৃতে লেখা তান্ত্রিক পুঁথিও আছে। সংস্কৃতে লেখা পুঁথি 'কাঙুর' এখন কেবলমাত্র তিব্বতীয় অনুবাদেই রক্ষিত আছে। 'কাঙুর' হচ্ছে বুদ্ধের বাণীর ব্যাখ্যা। এতেও হাজারের উপর শ্লোক আছে। এগুলির লেখক কিন্তু সকলেই ভারতীয়। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্মের জন্ম ভারতে হলেও মুসলমান আক্রমণের পর এ সব ভারত থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

সম্প্রতি ভারতীয় শিল্প গবেষক শ্রীএম. সিং ইউনেস্কোর সহায়তায় 'হিমালয়ের শিল্প' নামে একটি বই প্রকাশ করেছেন। নেপালের মহারাজা, ভারত সরকার, এবং দালাই লামার সহযোগিতায় ও সিকিম-ভূটানের মহারাজের অনুগ্রহে শ্রীসিং গুম্ফায় রক্ষিত বহু প্রাচীন পুঁথি দেখবার সুযোগ পান, কিন্তু ওই সব পুঁথি নকল করে আনা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই সব পুঁথি নিয়ে ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদরা যদি গবেষণা চালাবার সুযোগ পান, তাহলে হয়তো এমন বহু সত্য উদ্ঘাটিত হবে যার দ্বারা আমাদের এত দিনের সমস্ত ধ্যান ধারণা ওলোট পালোট হয়ে যাবে।

বেদ কত প্রাচীন ?

বেদ পরমেশ্বরের সৃষ্টি অর্থাৎ অপৌরুষেয়। অথর্ববেদ তাঁর মুখ, সামবেদ তাঁর লোম, যজুর্বেদ তাঁর হৃদয় এবং ঋগ্বেদ তাঁর প্রাণ। সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর বেদ সৃষ্টি করে প্রকাশ করেন, প্রলয়কালে তিনিই বেদকে নিজ অনন্ত জ্ঞানের মধ্যে সঙ্কিত করে রাখেন। বেদ ঈশ্বরের জ্ঞানে বিরাজমান, এর কখনও বিনাশ হয় না। কারণ বেদ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বিদ্যা তাই বেদ হচ্ছে নিত্য।

বেদ ঈশ্বর সৃষ্টই হোক আর মানুষের সৃষ্টই হোক তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। তবে বেদ থেকেই জানা যায় যে বেদমন্ত্রগুলি ঋষি-প্রণীত, ঋষি-দৃষ্ট নয়। ঋষিরাই বলেছেন 'আমরা মন্ত্র করেছি, গড়েছি ইত্যাদি।' সে যাই হোক, বেদ যে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত।

বেদের দুটি অংশ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ পদ্যে রচিত এবং ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। এক শ্রেণীর মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতার স্তব করা হয়েছে, আর এক শ্রেণীর মন্ত্রে স্বর্গ, আয়ু, ধন, পুত্র প্রভৃতি প্রার্থনা করা হয়েছে। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও মন্ত্রগুলির বিভিন্ন যজ্ঞে প্রয়োগের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। মন্ত্রভাগ হচ্ছে বেদের জ্ঞানকাণ্ড এবং ব্রাহ্মণভাগ হচ্ছে কর্মকাণ্ড।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন 'প্রাচীনত্বে, এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মর্য্যাদায়, পৃথিবীর পাঁচ-ছয়খানি গ্রন্থের মধ্যে ঋগ্‌বেদ সর্বপ্রাচীন।'

তিলকের মতে খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ শতক ঋগ্বেদের আবির্ভাবকাল। Jacobi-র মতে খ্রীঃ পূঃ ৪৫০৪ শতক। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন বেদের কাল খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ১০০০। অর্থাৎ বেদ প্রায় ৩০০০ থেকে ৬০০০ বৎসরের পুরাতন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঋগ্‌বেদ সংকলিত হয় ১০০০-৯০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। অর্থাৎ গবেষকরা কেউই সঠিক সময়ের হিসেব দিতে পারেন নি।

'ঋগ্‌বেদ' প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন : 'বৈদিক সাহিত্যকে—ঋগ্‌বেদকে—অনেকে এক অসম্ভব প্রাচীন যুগে লইয়া যাইতে চাহেন। কেহ কেহ ইহাকে ভূতাত্ত্বিকগণ দ্বারা নির্ধারিত Pliocene 'বহু-নবীন' ও Miocene 'অল্প-নবীন' যুগের গ্রন্থ বলেন —যে যুগ এখন হইতে কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বেকার, তখন পূর্ণ মানুষের উদ্ভব-ই হয় নাই। ৫০,০০০, ৪০,০০০, ৩০,০০০, ২৫,০০০ বৎসরের কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন।'

Maxmulerও বলেছেন : পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা ঋগ্বেদের কালকে সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে পারে।

বায়ুপুরাণের ৫৭ অধ্যায়ে আছে :

'ত্রেতাদৌ সংহিতা বেদাঃ কেবল ধর্মশেষতঃ
সংরোধাদায়ুষশ্চৈব ব্যস্যন্তে দ্বাপরাযুতো। ৪৭॥'

অর্থাৎ ত্রেতাযুগে বেদ অতি সংক্ষিপ্তভাবে সার ধর্মময় ছিল। দ্বাপর যুগে জনগণের আয়ুর যখন অল্পতা ঘটল তখন বেদকে বিভক্ত করা হয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ত্রেতাযুগেও বেদ ছিল। তাহলে বেদের বয়স দাঁড়াচ্ছে :

ত্রেতাযুগের সময় কাল—	১২,৯৬,০০০ বৎসর
দ্বাপরযুগের „ „ —	৮,৬৪,০০০ „
কলিযুগের কেটেছে প্রায়—	৫,০০০ „
মোট	২১,৬৫,০০০ বছর

অথাৎ বেদের বয়স কমপক্ষে একুশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার বৎসর। তখন তো পৃথিবীতে সভ্য মানুষের জন্মই হয় নি। তা হলে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডারের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকে কি করে? এর একটিই সহজ ও অনিবার্য উত্তর আছে—তা হল এই জ্ঞানভাণ্ডারের সৃষ্টি এই পৃথিবীর বুকে হয় নি। হয়েছে অন্য কোন গ্রহে এবং তারপর তা নিয়ে আসা হয়েছে এই পৃথিবীতে।

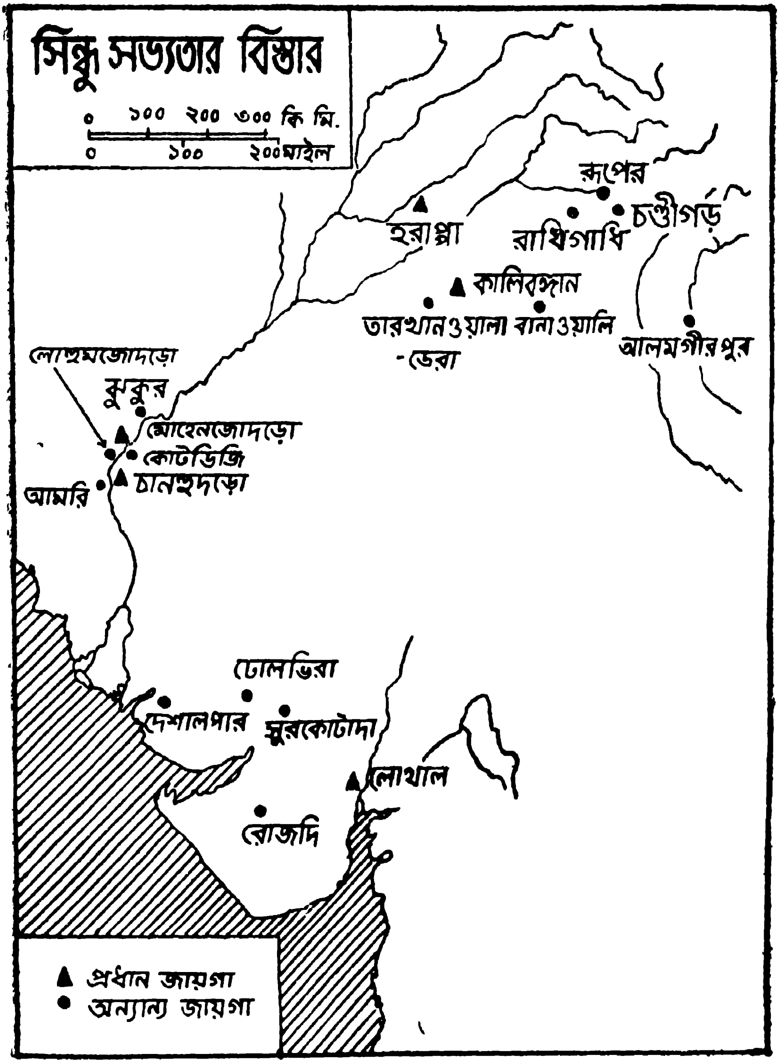

সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তার শুধুমাত্র মোহেঞ্জোদড়ো ও হরাপ্পার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না

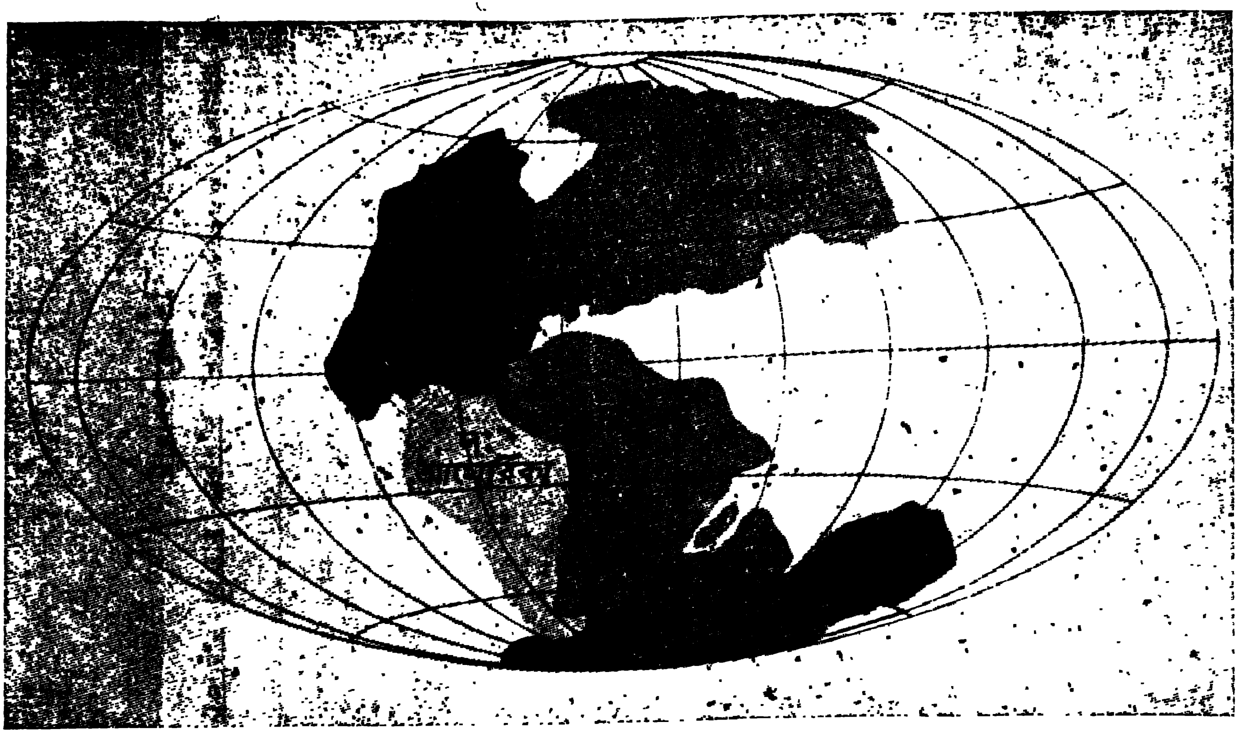

বিশ কোটি
বছর আগে
পৃথিবীর
ভূপৃষ্ঠের
অবস্থা
যে রকম
ছিল বলে
বিজ্ঞানীরা
অনুমান
করে থাকেন

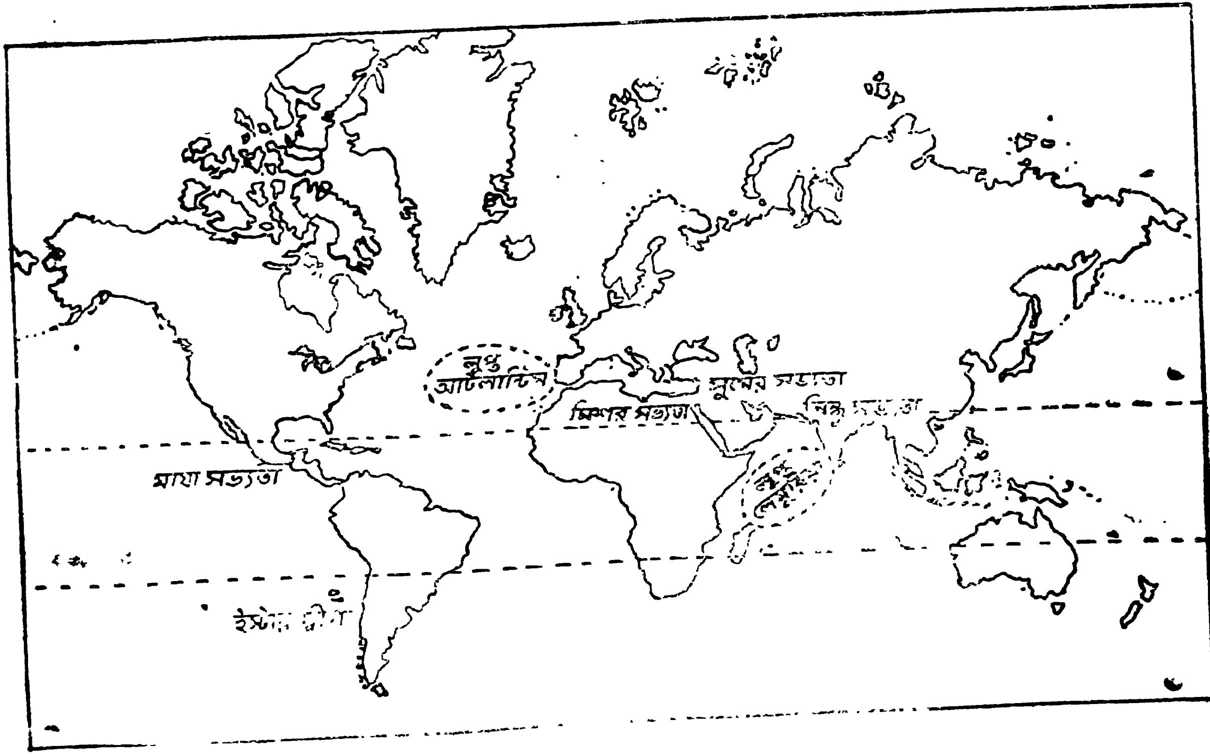

পৃথিবীর প্রাচীন রহস্যময় সভ্যতা-গুলির ভৌগোলিক অবস্থান

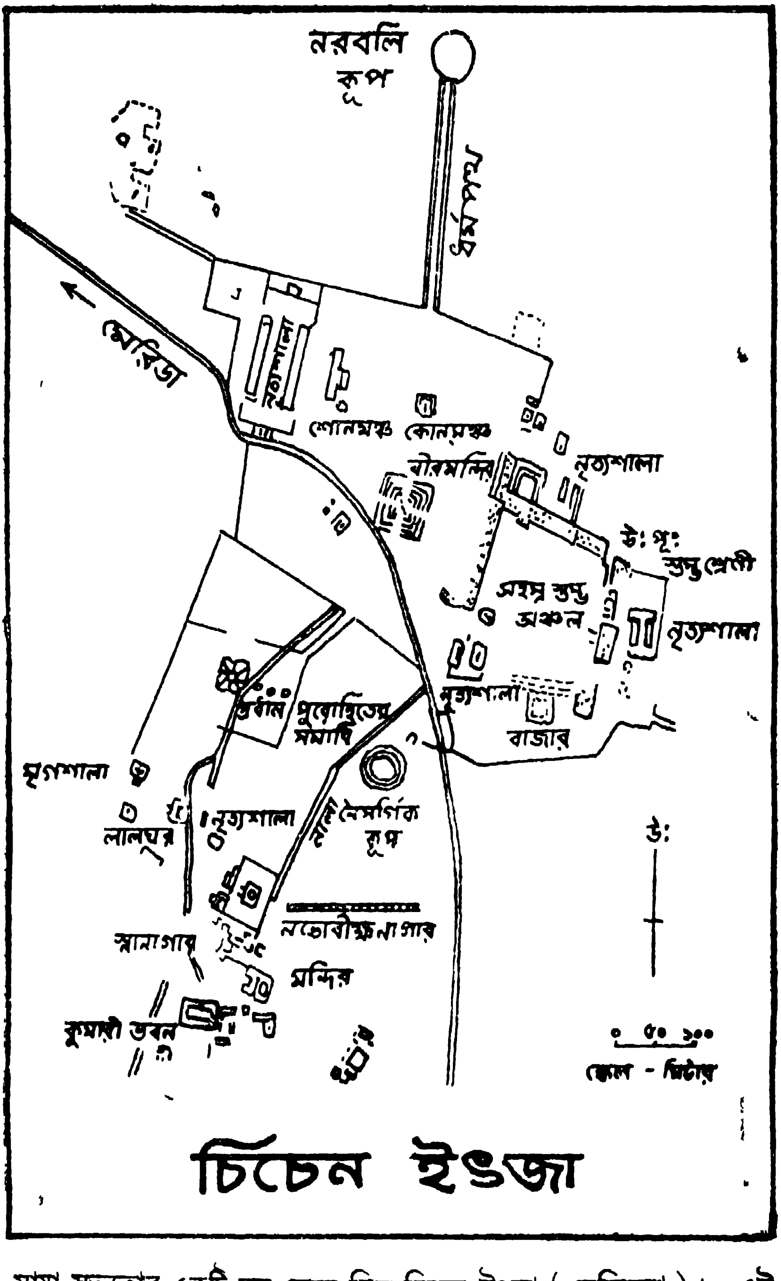

চিচেন ইৎজা

মায়া সভ্যতার একটি বড় কেন্দ্র ছিল চিচেন ইৎজা (মেক্সিকো)। এই মানচিত্র দেখলেই বোঝা যায় কি ধরণের সভ্য মানুষের বাস ছিল এখানে

পুরাণ রচনাকারীরা কি আপেক্ষিক তত্ত্ব জানতেন?

পুরাণে সময় হিসাব করবার তিন রকম মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়েছে: যুগ, মন্বন্তর ও কল্প।

যুগ হচ্ছে চারটি। যাদের মোট সময়ের পরিমাণ হচ্ছে ১২,০০০ দিব্য বৎসর।

সত্যযুগ	= ৪৮০০ দিব্য বৎসর
ত্রেতাযুগ	= ৩৬০০ " "
দ্বাপরযুগ	= ২৪০০ " "
কলিযুগ	= ১২০০ " "
	মোট ১২,০০০ দিব্য বৎসর

মানুষের (অর্থাৎ পার্থিব) এক বৎসর দেবতাদের এক দিনের সমান। মানুষের এক বৎসর ধরা হয়েছে ৩৬০ দিনে। তাই দিব্য বৎসরকে পার্থিব বৎসরে পরিবর্তিত করলে এক একটি যুগের সময় কাল দাঁড়াবে:

সত্যযুগ	= ৪৮০০ দিব্য বৎসর	× ৩৬০ =	১৭,২৮,০০০ পার্থিব বৎসর
ত্রেতাযুগ	= ৩৬০০ " "	× ৩৬০ =	১২,৯৬,০০০ " "
দ্বাপরযুগ	= ২৪০০ " "	× ৩৬০ =	৮,৬৪,০০০ " "
কলিযুগ	= ১২০০ " "	× ৩৬০ =	৪,৩২,০০০
	মোট ১২,০০০	মোট	৪৩,২০,০০০ পার্থিব বৎসর

চার যুগে এক মহাযুগ। অর্থাৎ ১২,০০০ দিব্য বৎসর বা ৪৩,২০,০০০ পার্থিব বৎসরে এক মহাযুগ। ১০০০ মহাযুগে ব্রহ্মার এক দিন বা রাত্রি। অর্থাৎ ৪৩২ কোটি পার্থিব বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন বা এক রাত্রি। ব্রহ্মার দিন বা রাত্রিকেই বলা হয় কল্প।

প্রত্যেক কল্পে চোদ্দজন মনু রাজত্ব করেন। এক এক মনুর শাসন কালের সময়কে বলা হয় মন্বন্তর।

পুরাণের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান কল্পে ছ'জন মনুর রাজত্বকাল শেষ হয়ে গেছে। এই কল্পের প্রথম মনুর নাম ছিল স্বয়ম্ভু। এখন চলছে সপ্তম মনু বৈবস্বতের শাসনকাল। ২৮ চতুর্যুগীতে কলিযুগের প্রায় ৫০০০ বৎসর কেটেছে। অর্থাৎ এই কল্পে প্রায় ১৯৭ কোটি বৎসর কেটে গেছে, বাকি আছে এখনো ২৩৫ কোটি বৎসর।

অতএব দেখা যাচ্ছে পার্থিব এক বৎসর হচ্ছে দেবতাদের এক দিনের সমান এবং পার্থিব ৪.২ কোটি বৎসর ব্রহ্মার এক দিনের সমান। সুতরাং পৃথিবী, দেবলোক এবং ব্রহ্মলোক এক হতে পারে না। এক হলে কখনই সময়ের এ রকম অদ্ভুত পার্থক্য থাকত না। তাহলে দেবলোক ও ব্রহ্মলোক কি মহাকাশের কোথাও?

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানাচার্য আইনস্টাইনের যুগান্তকারী 'থিওরি অব রিলেটিভিটি'র সাহায্যে বিষয়টি হয়তো ব্যাখা করা সম্ভব। জটিল গাণিতিক হিসেবের মধ্যে না গিয়ে বিষয়টি নিয়ে সাধারণ ভাবে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

কল্পনা করুন আপনি একটি 'আইনস্টাইন ট্রেনে' চেপেছেন। আরো মনে করা যাক রেলপথটি অসীম। দুটি স্টেশনের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ৮৬ কোটি ৪০ লক্ষ কিলোমিটার। এই বিশেষ ট্রেনটির গতি যদি প্রতি সেকেণ্ডে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার হয় তাহলে পরের স্টেশনে পৌঁছাতে ট্রেনটির সময় লাগবে একঘণ্টা।

এবার মনে করুন দুটি স্টেশনে দুটি ঘড়ি আছে এবং দুটি ঘড়িই ঠিক সময় দেয় অর্থাৎ একটুও ফাস্ট বা স্লো যায় না। ঘড়ি দুটির সময়ও মেলানো আছে। আপনি ট্রেনে উঠে স্টেশনের ঘড়ি দেখে আপনার ঘড়ি মিলিয়ে নিলেন। পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছে আপনি অবাক হয়ে দেখলেন যে আপনার ঘড়ি স্টেশনের ঘড়ি থেকে ২৪ মিনিট স্লো—কি করে এই ২৪ মিনিট স্লো হয়ে গেল?

মজা হচ্ছে এই যে ট্রেনের গতিবেগ যদি আরো বাড়িয়ে দেওয়া হত তাহলে আপনার ঘড়ি আরো বেশী স্লো হয়ে যেত। ট্রেনের গতি বৃদ্ধি করতে করতে যদি আলোর গতি অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০

কিলোমিটারের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যেত তাহলে বাইরে একঘণ্টা কেটে গেলেও ট্রেনের মধ্যে সময় কাটত মাত্র এক মিনিট!

মহাকাশে নক্ষত্রেরা আমাদের থেকে এত দূরে আছে যে কোন একটি নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে সময় লাগে প্রায় ৪০ আলোকবর্ষ। এ কথা আমরা জানি যে আলোর গতির থেকে বেশী গতিতে যাওয়া কোন বস্তুর পক্ষেই সম্ভব নয়, কারণ তাহলে ওই বস্তু তখন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ঐ নক্ষত্রে কোন মহাকাশযানের পক্ষেই ৪০ বৎসরের আগে যাওয়া সম্ভব নয়। এবার আপনি যদি একটি 'আইনস্টাইন রকেটে' সেকেণ্ডে ২,৪০,০০০ কিলোমিটার বেগে ঐ নক্ষত্রলোকে পাড়ি দেন তাহলে পৃথিবীর মানুষদের হিসেবে ঐ নক্ষত্রে পৌঁছাতে আপনার সময় লাগবে $\left(\frac{৩,০০,০০০ \times ৪০}{২,৪০,০০০}\right)$ = ৫০ বৎসর। কিন্তু যারা ওই রকেটে থাকবেন অর্থাৎ আপনার হিসাব মতো কিন্তু ৫০ বৎসর হবে না, কারণ পূর্বেকার ট্রেনের মতো মহাকাশযানের ভিতরকার ঘড়ি স্লো হতে আরম্ভ করবে অর্থাৎ সময় সংকুচিত হবে। এবং মহাকাশযানের ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী সময় কাটবে মাত্র ৩০ বৎসর।

'আইনস্টাইন রকেটে'র গতি যতই বাড়ানো যাবে ওই নক্ষত্রে পৌঁছুতে ততই কম সময় লাগবে। অবশ্য এই 'আইনস্টাইন রকেটে'র গতি আলোর গতির চেয়ে কখনই বাড়ানো যাবে না। কিন্তু তত্ত্বগত-ভাবে যদি 'আইনস্টাইন রকেটে'র গতি প্রচণ্ড রকম বাড়িয়ে দিয়ে রকেটের এক মিনিট সময়ের মধ্যে ঐ নক্ষত্র ঘুরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছানো যায় তাহলে দেখা যাবে 'আইনস্টাইন রকেটে'র মধ্যে যখন এক মিনিট সময় কেটেছে পৃথিবীতে সেই সময়ের মধ্যে কেটে গেছে সুদীর্ঘ ৮০ বৎসর। অর্থাৎ রকেটের এক বছর সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে কেটে যাবে ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৪৮ হাজার বৎসর! সুতরাং দেখা যাচ্ছে পার্থিব বৎসর ও রকেটের ভিতরের বৎসরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

আশা করি এবার দিব্য-বৎসর এবং ব্রহ্মবৎসরের সঙ্গে পার্থিব বৎসরের অমিলের কারণটা বুঝতে পেরেছেন।

আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্পর্কে প্রাচীন মানুষদের যথেষ্ট ধারণা ছিল বলেই মনে হয়। The vision of Isiah (২য়-৩য় শতাব্দী) বইয়ে সুন্দর একটি গল্প আছে—ইজিয়াকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হল। স্বর্গলোকে তিনি ঈশ্বরকে দেখতে পেলেন। এবার দেবদূত তাকে বললেন, 'চল, পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে।' ইজিয়া খুব অবাক হয়ে বললেন, 'এত তাড়া করছেন কেন? মাত্র তো দু'ঘণ্টা হল এখানে এসেছি।' দেবদূত বললেন, 'দু'ঘণ্টা নয়, বত্রিশ বছর।' ইজিয়ার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। অর্থাৎ পৃথিবীতে ফিরে গেলেই তো তিনি বুড়ো হয়ে যাবেন।

এর থেকে সহজ ভাষায় আপেক্ষিক তত্ত্বের গল্প বলা যায় বলে মনে হয় না।

সুতরাং এর পরও দেবতারা যে অন্য গ্রহ থেকে এসেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে কি?

বিমান তৈরির কলা-কৌশল কি বেদেই আছে?

দেবতারা যদি গ্রহান্তরের মানুষ হন তাহলে তারা বিমান বা মহাকাশযান তৈরির কলা-কৌশল জানতেন—এর কোন প্রমাণ কি আমাদের হাতে আছে? ঋগ্বেদাদিভাষ্য-ভূমিকা গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করে দেখা যাক। বেদ বলছেন:

তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাং

অবাহাঃ। তমূহথুর্ণাভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষ প্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ। ১।

তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিরহাতিব্রজদ্ভির্নাসত্যা ভুজ্যুমূহথুঃ পতঙ্গৈঃ।

সমুদ্রস্য ধন্বন্নার্দ্রস্য পারে ত্রিভীরথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষড়শ্বৈঃ ॥ ২ ॥

ঋ. অ. ১। অ. ৮। বঃ ৮ মং. ৩। ৪ (ঋ. ১। ১১৬। ৩-৪-হরফ)

ভাষার্থ: যে জন শত্রুকে হিংসা বা হনন করিয়া নিজ বিজয় ও পরাক্রম দ্বারা বলবান হইয়া ধনাদি পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যিনি অশ্ব, রথ, নৌকা ও বিমানাদি যান সকলকে প্রাপ্ত হইবার স্থান (অর্থাৎ প্রাপ্তিযুক্ত হইতে) ইচ্ছা করেন। যিনি উত্তম বিদ্যা ও সুবর্ণাদি পদার্থের কামনাকারী, তাহার পক্ষে ধনাদি পদার্থের কিরূপে পালন ও ভোগ সাধন করিতে হয়, তাহারই বর্ণনা করা যাইতেছে।

যে কেহ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, পিত্তল ও কাষ্ঠাদি পদার্থ দ্বারা বিবিধ প্রকারের কলাযুক্ত নৌকাদি যান ও বিমানাদি প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অগ্নি, বায়ু, ও জলাদি দ্রব্য প্রয়োগপূর্ব্বক তন্মধ্যে বাণিজ্য দ্রব্যাদি পূর্ণ করিয়া বাণিজ্যার্থে সমুদ্র ও নদীতে যাত্রা করিয়া দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমন করেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটে।

অগ্নি, বায়ু ও পৃথিব্যাদি পদার্থে শীঘ্র গমন করিবার গুণ আছে। এই গুণকে অশ্বি বলে। ইহাদের দ্বারা নৌ-ও যানাদি প্রস্তুত করিলে ঐ সমস্ত পদার্থের স্বভাবতঃ শীঘ্র গমনাগমনাদি করিবাব গুণ থাকায়, ঐ সমস্ত যানও বেগবান হইয়া থাকে। বেদোক্ত বিদ্যা ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ এইরূপ নৌ-বিমান রথাদি যান দ্বারা পুরুষ সুখে দেশ দেশান্তরে গমনাগমন করিতে সক্ষম হন। ***এই রূপে যদ্বারা আকাশে গমনা-

গমনের কার্য্য সিদ্ধি হয়, যাহাকে বিমান বলে, তাহা এরূপ শুদ্ধ ও চিক্কণ হওয়া উচিৎ, যে উহাতে জল লাগিলে গলিয়া বা ফাটিয়া না যায় বা কোনরূপ ছিদ্রযুক্ত না হয়। এই বিষয়ে নিরুক্তের অর্থ এইরকম ঃ

বায়ু ও অগ্নিকে অশ্বি বলে। বায়ু ধনঞ্জয়রূপ ধারণ করিয়া, সমস্ত পদার্থ মধ্যে ব্যপ্ত রহিয়াছে। এইরূপে জল এবং অগ্নিকেও অশ্বি বলা যায়। অগ্নি জ্যোতিঃ দ্বারা ও জল রসদ্বারা যুক্ত হইয়া ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহারা বেগাদি গুণ-যুক্ত। যাহার বিমানাদি যানের সিদ্ধির ইচ্ছা হইবে, তাহার পক্ষে বায়ু, অগ্নি, ও জলদ্বারা তাহা সিদ্ধি করা কর্ত্তব্য। অশ্বি বিবিধ প্রকার ভোগকে প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। উক্ত যানাদিতে অগ্নি ও জলাদির জন্য ছয়টি গৃহ অর্থাৎ পৃথক পৃথক স্থান নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য, যাহাতে ঐ যান দ্বারা অনেক প্রকারে গমনাগমন করিতে সমর্থ হওয়া যায় এবং যদ্দ্বারা তিন প্রকার মার্গে যথাবৎ গমন করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

অনারম্ভণে তদবীরয়েথামনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে।
যদশ্বিনা উহথুর্ভুজ্যমস্তং শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসম। ৩।
যমশ্বিনা দদথুঃ শ্বেতমশ্বমঘাশ্বায় শশ্বদিৎ স্বস্তি।
তদ্বাং দাত্রং মহি কীর্ত্তেন্যং ভূৎপৈদ্বো বাজী সদমিদ্ধব্যো অর্য্যঃ॥ ৪॥
ঋ. অ. ১ অ. ৮ ব. ৮। ১ মং. ৫। ১ (ঋ. ১। ১১৬। ৫-৬-হরফ)
ত্রয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে সোমস্য বেনামনু বিশ্ব ইদ্বিদুঃ।
ত্রয়ঃ স্কম্ভাসঃস্কভিতাস আরভে ত্রির্নক্তং যাথস্ত্রির্বশ্বিনা দিবা॥ ৫॥
ঋ অ. ১ অ. ৩ বর্গ ৪ মং. ১ (ঋ. ১। ৩৪। ২—হরফ)

ভাষার্থ: হে মনুষ্যগণ ঃ তোমরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনারম্ভণে অর্থাৎ আলম্বরহিত সমুদ্রে নিজ কার্য্য সিদ্ধিকরণ যোগ্য যান রচনা করিবে। যে যান পূর্ব্বোক্ত অশ্বিদ্বারা যাতায়াতের জন্য সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ আকাশে ও সমুদ্র মধ্যে বিনালম্বে কিছুই স্থিত থাকিতে পারে না। এরূপে পৃথিবীতে যে জলপূর্ণ সমুদ্র প্রত্যক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং অন্তরীক্ষরূপী যে আকাশ তাহাকেও সমুদ্র বলে, যেহেতু উহাও বর্ষার জলদ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহাতে ও তথায় বিনাবলম্ব অর্থাৎ নৌকা বা

বিমান ব্যতিরেকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইজন্য এইরূপ যান সকলকে পুরুষাকার দ্বারা তৈরী করা কর্ত্তব্য। যে যান বায়ু প্রভৃতি অগ্নিদ্বারা নির্ম্মাণ করা হয় তাহা উত্তমভোগ সকলকে প্রাপ্ত করায়।

এইরূপে চালিত যানদ্বারা সমুদ্র, ভূমি ও অন্তরিক্ষে উত্তমরূপে সকল প্রকার কার্য্যসিদ্ধি হয়। ঐ সমুদ্রযান বা নৌকায় শতপ্রকার লৌহময় কল থাকিবে, যদ্দ্বারা বন্ধন ও স্তম্ভন আদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ ঐ নৌকাতে জলের মাপ লইবার অর্থাৎ কোন স্থানে কত গভীর জল আছে তাহার পরিমাণ লইবার যন্ত্র ও যদ্দ্বারা ঝড় ও অন্যান্য প্রকার প্রবল বায়ু ও উর্ম্মাদির বিঘ্ন হইতে নৌকাকে রক্ষা করিবার জন্য লৌহের নঙ্গর ও অন্যান্য যন্ত্রাদি প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা যথা ইচ্ছা তথায় ঐ নৌকাকে বন্ধন ও স্তম্ভন করিয়া রাখিতে পারা যায়।

জল ও অগ্নিরূপী অশ্বির সংযোগদ্বারা শুক্লবর্ণ বাষ্পরূপী অশ্ব * অত্যন্ত বেগশালী হইয়া থাকে, যদ্দ্বারা শিল্পীগণ যানাদিকে শীঘ্র গমন-জন্য বেগযুক্ত করিয়া দেন, যে বেগের হানি বা হ্রাস হয় না, বরং যত ইচ্ছা, ততই বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। এইরূপ যানে বসিলে সমুদ্র ও অন্তরিক্ষ মধ্যে নিরন্তর স্বস্তি বা নিত্যসুখ উৎপন্ন হয়।

এইরূপ যানের তিনটি চক্র বা নেমি থাকিবে, যদ্দ্বারা উহা জল ও পৃথিবীর উপর দিয়া যাতায়াত করিতে পারে এবং যেন প্রচুর বেগশালী হয়। উহার সমান অঙ্গগুলি বজ্রের ন্যায় দৃঢ় অর্থাৎ কঠিন হইবে। কলাযন্ত্রও অত্যন্ত দৃঢ় থাকিবে, যদ্দ্বারা শীঘ্র গমন করিতে সক্ষম হয়। পুনশ্চ ইহাতে তিন তিনটি করিয়া স্তম্ভ এরূপভাবে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য, যাহার আধারে সমস্ত কলাযন্ত্রগুলি সংযুক্ত থাকে এবং ঐ স্তম্ভ পুনঃ অপর কাষ্ঠ বা লৌহের সহিত সংলগ্ন থাকিবে, যাহা নাভির সমান মধ্যকাষ্ঠ হইয়া থাকে এবং উহাতেই সমস্ত কলাযন্ত্র সংযুক্ত থাকে। †

---

* এই থেকেই বোধ হয় Horse Power বা অশ্বশক্তির আমদানী।

† এটা হচ্ছে কণ্ট্রোল প্যানেল।

এরূপ যানের আরম্ভ (অর্থাৎ প্রস্তুতকরণে) অশ্বি অর্থাৎ অগ্নি ও জলই মুখ্য বস্তু হইয়া থাকে এবং এই যানদ্বারা তিন দিবস ও তিন রাত্রিতে লোকে দ্বীপ দ্বীপান্তরে যাইতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

ত্রির্নো অশ্বিনা যজতা দিবে দিবে পরিত্রিধাতু পৃথিবী মশায়তম।

ত্রিস্রো নাসত্যা রথ্যা পরাবত আত্মেব বাতঃ স্বসরাণি গচ্ছতম ॥ ৬ ॥

ঋ. অষ্ট. ১অ. ৩ব. ৫মং (ঋ. ১।৩৪।৭-হরফ

অরিত্রং বাংদিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধুনাং রথঃ। ধিয়া যুযুজ ইন্দ্রবঃ ॥ ৭ ॥

ঋ. অষ্ট. ১অ. ৩ব. ৩৪মং (ঋ. ১ ৪৬।৮-হরফ)

বি যে ভ্রাজন্তে সুমখাস ঋষ্টিভিঃ প্রচ্যাবয়ন্তো অচ্যুতা চিদোজসা।

মনো জুবো যন্মরুতো রথেষ্বা বৃষব্রাতাসঃ পৃষতীরযুগধ্বম ॥ ৮ ॥

ঋ. অ. ১অ ৬ব. ৯মং. (ঋ. ১৮৫।৪-হরফ)

ভাষার্থ: যে যানাদি দ্বারা আমরা ভূমি, জল ও আকাশে প্রতিদিন আনন্দে বিচরণ করিতে পারি, উহা লৌহ, তাম্র, রৌপ্য আদি তিন প্রকার ধাতুদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং যেরূপ নগর বা পল্লিগ্রামের গলি রাস্তাদ্বারা কোন স্থানে অতি সহজে ও শীঘ্র যাতায়াত করিতে পারা যায়, তদ্রূপ দূরদেশে উপরোক্ত যানদ্বারা শীঘ্র যাতায়াত করিতে সক্ষম হওয়া যায়। এইরূপে যানাদি প্রস্তুতকরণ বিষয়ক শিল্পবিদ্যা প্রয়োগদ্বারা ও পূর্ব্বোক্ত অশ্বি বলে অতি বৃহৎ কঠিন মার্গেও শীঘ্র ও সুগমতার সহিত বিচরণ করা সম্ভব। পূর্ব্বোক্ত অরিত্র অর্থাৎ স্তম্ভন সাধনজন্য যে যন্ত্র প্রস্তুত করা হয় তাহা বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্রের এক পার হইতে অপর পারে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। ঐ রথ অত্যন্ত বিস্তৃত এবং আকাশ তথা সমুদ্রে যাতায়াত করিবার জন্য অতি উত্তম হইয়া থাকে। এইরূপ তিন প্রকার যানমধ্যে বাষ্পবেগ জন্য এক জলাশয় প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে জল সেচন করা কর্ত্তব্য যাহাতে ঐ যান অত্যন্ত বেগবানরূপে সিদ্ধ হয়। হে মনুষ্যগণ! যেরূপ মনের বেগ আছে তদ্রূপ যোগশালী যান প্রস্তুত কর। ঐ রথে বায়ু ও অগ্নিকে মনোবেগের ন্যায় চালয়মান কর এবং উহাদের যোগে জলের ও স্থাপন কর, যেরূপ জলের বাষ্প ধূমের কলা সকলকে বেগশালী করিয়া দেয় তদ্রূপ

তুমিও উহাকে সর্ব্বপ্রকারে যুক্ত কর। * * * যিনি কলা ও কৌশলযুক্ত বায়ু ওঅগ্ন্যাদি পদার্থের কলাযন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ একস্থান হইতে) অপরস্থানে মনোবেগরূপী যানারোহণপূর্ব্বক যাতায়াত করেন, তিনি সর্ব্বাধিক সুখী হন।

আনো নাবা মতীনাং যাভং পারায় গন্তবে। যুঞ্জাথামশ্বিনা রথম ॥৯॥

ঋ. অষ্ট. ১অ. ৩ব. ৩৪মং ৭ (ঋ. ১।৪৬।৭-হরফ)

কৃষ্ণং নিযানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎপতন্তি।

ত আববৃত্রন্ত্সদনাদৃতস্যাদিদ্ ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে ॥ ১০ ॥

দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উতচ্চিকেত।

তস্মিন্তসাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলস্যঃ ॥ ১১ ॥

ঋ. অষ্ট. ২অ. ৩ব. ২৩।২৪মং ৪৭।৪৮ ॥ (ঋ. ১।১৬৪।৪৭-৪৮-হরফ)

ভাষার্থঃ যেহেতু বুদ্ধিমান মনুষ্যদ্বারাকৃত নৌকাদিরূপ যানদ্বারা অত্যন্ত সুগমতার সহিত সমুদ্র ও অন্তরীক্ষ পারাপার করিতে পারা যায় তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত বায়ু আদিরূপ অশ্বির যথাবৎ সংযোগ করিবে, যদ্বারা উক্ত যানদ্বারা সমুদ্রের পারে ও তীরে যাইতে সমর্থ হও। হে মনুষ্যগণ! আইস পরস্পর সম্মিলিত হইয়া এরূপ যান রচনা করি যদ্দারা সমগ্র দেশ দেশান্তরে যাইতে আমরা সক্ষম হই।

অগ্নিজলযুক্ত যে নিশ্চিত যান আছে তাহার বেগাদিগুণ সম্পন্ন উত্তম-রূপে গমনশীল যে পূর্ব্বোক্ত অগ্ন্যাদিরূপী অশ্বি আছে তাহাতে জলসেচন-যুক্ত বাষ্পকে প্রাপ্ত করাইয়া ঐ কাষ্ঠ, লৌহ আদি দ্বারা কৃত বিমানকে আকাশে উড্ডীয়মান করিয়া চালাইয়া থাকে। যখন উহা চারিদিক হইতে জলদ্বারা বেগযুক্ত হয় তখনই উহা যথার্থ সুখদায়ক হয়। যখন জল ও কালাদিদ্বারা পৃথিবীকে জলদ্বারা যুক্ত করা যায় তখন তদ্দারা উত্তমোত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইসকল যানের অন্তর বাহিরে এরূপ কল প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য যাহা ঘুরাইলে সমস্ত কলা সকল ঘুরিতে থাকিবে। তৎপরে উহার মধ্যে তিনটি চক্র রচনা করিবে, যাহার মধ্যে একটি চলিলে অন্যান্য সমস্তগুলি রুদ্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয়টিকে চালাইলে অগ্রে গমন করিবে ও তৃতীয়টিকে চালাইলে পশ্চাৎদিকে

গতিশীল হইবে। উহাতে তিনশত করিয়া বড় বড় কীল অর্থাৎ পেরেক বা পেঁচ সংযুক্ত করিবে, যদ্দারা উহার সমগ্র অঙ্গ একত্রিত হইয়া যায় বা থাকে, এবং ঐগুলি বাহির করিয়া লইলে সকলগুলিকে আবার পৃথক পৃথক করিতে পারা যায়। ইহাতে ষাটটি করিয়া কলাযন্ত্র রচনা করিবে, যাহার মধ্যে কতকগুলি চলিবে ও কতকগুলি বন্ধ বা স্থির থাকিবে। অর্থাৎ যখন বিমানকে উর্দ্ধে চালাইবার অর্থাৎ আকাশাভিমুখে চালাইবার আবশ্যক হইবে তখন বাষ্পকে ধরিয়া অর্থাৎ একত্রিত করিয়া উর্দ্ধদিকের মুখ বন্ধ রাখিবে এবং যখন উর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে অর্থাৎ পৃথিবীর দিকে চালাইবার আবশ্যক হইবে তখন উর্দ্ধদিকের মুখ অনুমানাযায়ী খুলিয়া দিবে আর নিম্নদিকের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। এইরূপে পূর্ব্বদিকে চালাইবার সময় পূর্ব্বের মুখ বন্ধ ও পশ্চিমদিকের মুখ খুলিয়া দিবে ও পশ্চিমে চালাইবার সময় পশ্চিমের মুখ বন্ধ করিয়া পূর্ব্বদিকের মুখ খুলিয়া দিবে। এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে চালাইবার সময় যেদিকে চালাইবে সেই দিকের মুখ বন্ধ করিবে ও অপর দিকের মুখ খুলিয়া দিবে। এইরূপ ব্যবহারে কোনরূপ ভ্রম করিবে না।

এই মহাগভীর শিল্পবিদ্যাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞাত হইতে পারে না। কিন্তু যিনি মহাবিদ্বান ও হস্তক্রিয়ায় (অর্থাৎ প্রযুক্তিবিদ্যায়) নিপুণ ও যাহারা পুরুষার্থশীল তাহারাই এই বিদ্যায় সিদ্ধ হইতে সমর্থ হন।

উদাহরণ আর বাড়িয়ে লাভ নেই। পাঠক এ থেকেই বুঝতে পারবেন যে প্রাচীন দেবাসুররা বিমান তৈরির কলা-কৌশল খুব ভালো ভাবেই জানতেন। আর এই বিদ্যা যে, যে কেউ শিখতে পারত না তাও স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে। বিমান, রথ ও জাহাজ তৈরি করতে হলে জ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষ হতে হত।

ঐতিহাসিক আর্যরা বেদের মতো গ্রন্থ রচনা করতে পারে না কেন সে কথাও নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝতে পারছেন।

এবার আমরা রামায়ণ ও মহাভারত থেকে বিমান, আকাশ-ভ্রমণ ও মহাকাশ ভ্রমণের দৃষ্টান্তগুলি একটু খুঁটিয়ে দেখব। ঘটনাগুলি এখন নিশ্চয় ততটা অবিশ্বাস্য হয়ে উঠবে না।

ইন্দ্র কি উড়ন্ত-চাকী করে পৃথিবীতে আসতেন?

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা থেকে এ বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার যে ইতিহাসের উষাকালে বিমানের অস্তিত্ব ছিল। বেদ ছাড়াও ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ 'সমরাঙ্গন সূত্রধর'-এ আকাশ-বিহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থটি ঘটনাভিত্তিক। এই গ্রন্থে দুশো তিরিশটি শ্লোকে উড্ডীনযন্ত্রের নির্মাণ-কৌশল বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে আকাশে উঠে যাওয়া, স্বাভাবিক ও বাধ্যতামূলক অবতরণ এবং হাজার হাজার কিলোমিটার ভ্রমণ সম্বন্ধেই বলা হয়েছে তা নয়, বরং উড়ন্ত-পাখির সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। কেবল তাই নয়, এই গ্রন্থে রাসায়নিক ও জৈব বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ পদ্ধতিরও বর্ণনা আছে। 'সংহার' এক ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র যা মানুষকে পঙ্গু করে ফেলে এবং 'মোহ' এমনই একটি অস্ত্র যা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিতে পারত।

প্রাচীন ভারতের ছ'জন যুবক একটি উড়োজাহাজ তৈরি করেছিল যেটি উড়তে পারত এবং ধীরে ধীরে মাটিতে অবতরণ করতে পারত। পঞ্চতন্ত্রে এই উড্ডীনযন্ত্রের পরীক্ষার সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক জেপলীন চালানো হত অত্যন্ত জটিল নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে, যার ফলে যন্ত্রটি নিরাপদে দ্রুতগতিতে উড়তে পারত এবং নিখুঁত কলা-কৌশল দেখাতে পারত।

এ সবই কি প্রাচীন ভারতীয় লেখকদের অলীক বিজ্ঞান কাহিনী, না কোন হারিয়ে যাওয়া প্রযুক্তিবিদ্যার দলিল? এ প্রশ্ন করেছেন Andrew Tomas তাঁর We are not the first বইয়ে। তিনি আরো বলেছেন—'পৃথিবীর সব দেশের উপকথায় উড্ডীনযন্ত্রের কাহিনী দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউট আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারতের পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার যে ফলাফল প্রকাশ করে তাতে দেখা যায় যে দশ হাজার

বৎসর আগে এস্কিমোরা মধ্য এশিয়ায় বাস করত। তারা গ্রীনল্যাণ্ডে গেল কেমন করে? এস্কিমোদের পুরাকাহিনীতে আছে উত্তর মেরুতে তারা এসেছিল 'লোহার তৈরি বিশাল পাখি'তে চড়ে। উইস্কনসিনে ম্যাসিডনের কাছে পাথরের তৈরি যে বিরাট পাখিটি আছে উপর থেকে সেটিকে ঠিক এরোপ্লেনের মতো দেখায়। পাখিটির ডানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দৈর্ঘ্য ৬২ মিটার।

যাই হোক, এবার আমরা রামায়ণ নিয়ে আলোচনা করে দেখি। অরণ্যকাণ্ডের পঞ্চম সর্গে আমরা দেখি রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে ঢুকলেন। সেখানে রাম এক বিরাট রাক্ষসকে বধ করলেন। এই রাক্ষস আসলে অভিশপ্ত গন্ধর্ব তুম্বুরু। তুম্বুরু রামকে শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে যেতে বললেন। শরভঙ্গের আশ্রমের কাছে গিয়ে রাম এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন—'সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য দ্যুতিমান দেদীপ্যমান শরীর, উজ্জ্বল অলঙ্কারসমূহে ভূষিত এবং নির্ম্মল বস্ত্র পরিধায়ী দেবরাজ ইন্দ্র, দেবগণসহ ভূতলস্পর্শ না করিয়া রথারোহণে শূন্যমার্গে অবস্থিত রহিয়াছেন এবং তদ্রূপ আভরণাদিভূষিত অনেক মহাত্মা তাঁহাকে পূজা করিতেছেন।'

রাম খুব বিস্মিত হয়ে লক্ষ্মণকে এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়ে বললেন 'লক্ষ্মণ! সন্তাপদায়ক সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট ঐ অন্তরীক্ষে শোভাযুক্ত অদ্ভুত রথ দেখ। আমরা পূর্ব্বে বহু যজ্ঞঅনুষ্ঠায়ী মহেন্দ্রের যেরূপ অশ্বগণের বিষয় শুনিয়াছি ঐ অন্তরীক্ষস্থ দিব্য অশ্বগণ যে সেইরূপ ইহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐ যে ব্যাঘ্রতুল্য দুরাক্রমণীয় কুণ্ডলধারী ও যৌবনসম্পন্ন শত শত পুরুষেরা খড়্গহস্তে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রহিয়াছেন উঁহাদের বক্ষঃস্থল সুবিশাল ও অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হারে ভূষিত, বাহু পরিখের ন্যায় বিস্তৃত, বস্ত্র রক্তবর্ণ এবং রূপ পঞ্চবিংশতিবর্ষ-বয়স্ক পুরুষের রূপের ন্যায়। উঁহারা নিশ্চয়ই দেবতা হইবেন।'

ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি অদ্ভুত বিষয় আমাদের নজরে পড়বে। যথা—

ইন্দ্র 'সন্তাপদায়ক সূর্য্যের ন্যায়' জ্যোতির্বিশিষ্ট' একটি অদ্ভুত রথে অর্থাৎ মহাকাশযানে চড়ে শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে এসেছিলেন। ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের বিচিত্র পোশাক স্পেস-স্যুট ছাড়া আর কিছু নয়। তাই সকলেরই পোশাক একই ধরণের। মুনির আশ্রমে খড়্গ-ধারী দেবতাদের মানায় না। আসলে দেবতারা ইন্দ্রের মহাকাশ-যানকেই পাহারা দিচ্ছিলেন। আমাদের আধুনিক যুগের কোন বিমান বা মহাকাশযান কিন্তু ইন্দ্রের রথের মতো শূন্যে এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তবে আধুনিক হেলিকপ্টারের পক্ষে শূন্যে কোন একটি জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ; কিন্তু হেলিকপ্টার প্রচণ্ড শব্দ করে।

রাম ইন্দ্রের পোশাকের, দেবতাদের পোশাকের ও রথের বিশদ বর্ণনা দিলেন অথচ হেলিকপ্টার জাতীয় যানের প্রচণ্ড শব্দের কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেলেন এটাই বা কি রকম কথা ? আসলে ইন্দ্রের যান হেলিকপ্টার জাতীয় যান হলেও তা থেকে কোন শব্দই হয় নি, তাই রাম শব্দের কথা উল্লেখ করেন নি।

মাঝে মাঝে আকাশে সব অদ্ভুত দর্শন বিমান দেখা যায় বলে কাগজে সংবাদ বেরোয়, অনেক পাঠকই হয়তো এ সম্বন্ধে জানেন। কোনটি গোল, কোনটি হয়তো চুরুটের মতো লম্বা, কোন কোনটি আবার দুটি গামলা উল্টে মুখোমুখি জোড়া দিলে যে রকম দেখায় সেই রকম দেখতে। এই সব রহস্যময় বিমান নিয়ে বিভিন্ন দেশে বহু আলোচনা হয়েছে কিন্তু এদের রহস্য ভেদ করা যায় নি। সাধারণ ভাবে এগুলিকে উড়ন্ত-চাকী বলা হয়। বিজ্ঞানীরা এগুলির নাম দিয়েছেন Unidentified Flying Objects সংক্ষেপে UFO বা 'উফো'। কেউ কেউ বলেন এগুলি এক ধরণের দৃষ্টিভ্রম বা optical illusion, আবার কেউ কেউ বলেন এগুলি ভিন্‌গ্রহবাসীদের মহাকাশযান।

মার্কিন বিমানবহর এ বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে ১৯৬৯ সালে একটি বিবরণ পেশ করেন। ২১৯৯টি ঘটনা নিয়ে বিশদ ভাবে অনুসন্ধান করে এরা লক্ষ্য করেন যে বেশীর ভাগ ঘটনাই আবহাওয়া

বেলুন, গ্যাসের পুঞ্জ, কিম্বা বিদ্যুতের চমক অথবা স্বাভাবিক কোন প্রাকৃতিক ঘটনা দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়েছে। কিন্তু ৪৪০টি ঘটনা সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। এর পরই মার্কিন বিমান বহর এ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো বন্ধ করে দেন বলে শোনা যায়।

বিখ্যাত উফোলজিস্ট Brinsley Le Poer Trench এর Secret of the Ages থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ তুলে দিচ্ছি।—

হ্যারল্ড ডাহ্ল একজন বন্দর-পুলিশ। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন মাওরি দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব কূলে তিনি তার নৌকা নিয়ে পাহারা দিতে বেরুলেন। সঙ্গে দুজন লোক, নিজের ছেলে আর পোষা কুকুর। ডাহ্ল নৌকা চালাতে চালাতে হঠাৎ দেখতে পেলেন ছ'টি বড় বড় গামলার মতো বিমান জলের উপর থেকে ২০০০ ফুট উপরে ঠিক মাথার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবার ডাহ্ল-এর ভাষায় বলি, 'ওগুলি যেভাবে আকাশে স্থির হয়ে ভাসছিল তাতে প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ওগুলি হয়তো বেলুন। কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম যে ওগুলি বেলুন নয়, অদ্ভুত ধরণের বিমান একটি বিমান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং অন্য পাঁচটি বিমান খুব ধীরে ধীরে ওটার চারপাশে ঘুরছে। নৌকার সবাই আমরা খুব উৎসুক হয়ে ওই বিমানগুলিকে লক্ষ্য করছিলাম। বাইরে থেকে বিমানগুলির মোটর বা প্রপেলার এ সব আছে বলে মনে হচ্ছিল না আমরা খুব ভালো করে কান পেতে শোনার চেষ্টা করেও কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পাই নি।'

ইন্দ্রের রথ আসলে এই ধরণের একটি 'উফো' বা উড়ন্ত-চাকী—যা শব্দ না করেও আকাশের এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

যাই হোক, এর পরের অংশটুকু শুনলে পাঠক আরো নিঃসন্দেহ হবেন। সীতা ও লক্ষ্মণকে রেখে রাম একাই শরভঙ্গ মুনির আশ্রমের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইন্দ্র রামকে আসতে দেখে শরভঙ্গ মুনিকে

বললেন রামের সঙ্গে এখন আমি দেখা করতে চাই না। রাবণ বধের পর আমি নিজে এসে রামকে দেখা দেব। 'অনন্তর বজ্রপাণি অরিন্দম মহেন্দ্র সেই তপস্বী শরভঙ্গকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া অশ্বযোজিত রথারোহণে স্বর্গে গমন করিলেন।'

পরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে এসে মুনিকে প্রণাম করলেন। রাম ইন্দ্রের কথা মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন শরভঙ্গ মুনি বললেন, 'রাম! অবিশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিগণ যাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু আমি কঠোর তপস্যা দ্বারা সেই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি, আমাকে সেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া ঐ বরপ্রদ ইন্দ্র এখানে আসিয়াছিলেন; কিন্তু নরশার্দ্দূল! তুমি আমার পরম প্রিয় অতিথি, তুমি আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছ ইহা জানিতে পারিয়া আমি গমন করিলাম না।'

শরভঙ্গ মুনিকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই ইন্দ্র মহাকাশযান নিয়ে এসেছিলেন; সঙ্গে ছিল বহু মহাকাশচারী রক্ষা, যারা সাময়িক ঘাঁটিটি রক্ষা করছিলেন।

এর পর শরভঙ্গ রামকে মহর্ষি সুতীক্ষ্ণর কাছে যেতে উপদেশ দিলেন। পরে রামের সামনেই 'সেই মহাতেজা শরভঙ্গ মুনি যথাবিধি অগ্নিসমাধান পূর্ব্বক মন্ত্রপূত হবির্দ্বারা আহুতি দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন অগ্নি সেই মহাত্মার রোম, কেশ, জীর্ণত্বক, মাংস, রক্ত ও অস্থি—সমস্তই দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পরে সেই মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী কুমার হইলেন। তৎপরে সেই অগ্নি হইতে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করত আহিতাগ্নিদিগের, মহাত্মা ঋষিদিগের এবং দেবতাদিগের লোকসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।'

শেষটুকু একটু যেন ধাঁধা সৃষ্টি করে। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে ঘটনাটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইন্দ্রের পোশাক অগ্নির মতো দ্যুতিমান তা আমরা আগেই দেখেছি, আসলে মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নির মতো দ্যুতিমান 'স্পেস-স্যুট' পরে নিলেন—তাই মনে

হল অগ্নি যেন মুনির সবকিছু দগ্ধ করে ফেললেন। এবং 'পরে সেই মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী কুমার হইলেন।' বিষয়টি পরিষ্কার নয় কি? আগুন যাকে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে ফেলে তিনি পরমুহূর্তে কি করে 'অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী কুমারে' পরিণত হন? ইন্দ্র যাওয়ার সময় 'তপস্বী শরভঙ্গকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সম্মানিত' করে চলে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি মহর্ষি শরভঙ্গের জন্য নিশ্চয় কোন মহাকাশযান রেখে গিয়েছিলেন। মহর্ষি শরভঙ্গ আগুনের মতো দীপ্তিশালী স্পেস-স্যুট পরে সেই মহাকাশযানে ঢুকলেন—ব্লাস্ট অফ হল—তাই আমরা দেখি 'তৎপরে সেই অগ্নি (অর্থাৎ ব্লাস্ট অফের আগুন) হইতে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণকরত আহিতাগ্নি-দিগের, মহাত্মা ঋষিদিগের এবং দেবতাদিগের লোকসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।'

আর কোন সন্দেহ আছে কি?

অথঃ পুষ্পকবিমান কথা

সুন্দরকাণ্ডের নবম সর্গে পুষ্পকবিমান তৈরির ইতিহাস পাওয়া যায়—'বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার জন্য নানাপ্রকার রত্নদ্বারা বিভূষিত করিয়া পুষ্পক নামক যে উৎকৃষ্ট শূন্যগামী রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যক্ষরাজ কুবের উত্তম তপস্যাবলে যাহা পিতামহের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ পরাক্রম প্রভাবে কুবেরকে পরাস্ত করিয়া তাহা পাইয়াছিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সুকৌশলে নির্ম্মিত ঐ বিমানের স্তম্ভসকল রজত, কার্ত্তস্বর এবং বিশুদ্ধ সুবর্ণ নির্ম্মিত; তাহাতে ঈহামৃগ খচিত থাকায় ঐ বিমান যেন শোভায় সমুদ্ভাসিত হইতেছে; সুমেরু ও মন্দর-গিরির ন্যায় গগনস্পর্শী, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কূটগৃহ এবং বিহার গৃহে সর্ব্বত্র শোভিত রহিয়াছে। তাহার সোপানপংক্তি কাঞ্চন-নির্ম্মিত, বেদিকা সকল সুচারু ও উৎকৃষ্ট ছিল। জলারন্ধ্র এবং গবাক্ষ সকল কাঞ্চন ও স্ফটিক-নির্ম্মিত। তথায় ইন্দ্রনীল, মহানীল প্রভৃতি মণিময় বেদিকা ছিল। তাহার কুট্টিম-বিচিত্র প্রবাল ও অতুলনীয় মহামূল্য রত্নরাজিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া অতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। তাহাতে সুগন্ধি রক্তচন্দন লিপ্ত থাকায়, তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছে।'

পুষ্পকরথের আকৃতি, প্রকৃতি, গতি সম্বন্ধে আমরা আরো জানতে পারি সুন্দরকাণ্ডের সপ্তম ও অষ্টম সর্গ থেকে। সাগর পেরিয়ে হনূমান লঙ্কায় গিয়ে সীতার খোঁজ করতে করতে রাবণের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। এখানেই—'একস্থানে রাবণের পুষ্পক নামক রথ বিবিধ রত্নে খচিত থাকায় বহু ধাতুসমূহে পর্ব্বতশিখর সকল যেমন নানাবর্ণ ধারণ করে ও নভোমণ্ডল যেমন গ্রহগণ এবং চন্দ্রদ্বারা বিচিত্ররূপ ধারণ করে, সেইরূপ নানাবর্ণে সুশোভিত সুন্দর মেঘের ন্যায়, বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে। উহা দেবতাদিগের আশ্রয়ভূত অতি উচ্চ দিব্য-গৃহ অপেক্ষাও উন্নত ও রত্নপ্রভায় সমুজ্জ্বল ছিল; তাহাতে পর্ব্বতরাজি বিরাজিত পৃথিবী, বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ শৈল, কুসুমসমূহে

পরিপূর্ণ বৃক্ষশ্রেণী, কেশর এবং পত্রে পূর্ণ পুষ্প, পাণ্ডুরবর্ণ গৃহ, সুপুষ্পে সুশোভিত পুষ্করিণী, কেশরসহ পদ্ম, বন ও বিচিত্র সরোবর নির্ম্মিত ছিল। কোন স্থানে বৈদূর্য্যমণিখচিত বিহঙ্গম, রূপ্য ও প্রবালময় পক্ষী, নানাবিধ রত্নময় বিচিত্র ভূজঙ্গ, জাত্যনুরূপ সুশোভনঅঙ্গ বিশিষ্ট অশ্ব আর যাহাদের পক্ষ প্রবাল ও সুবর্ণনির্ম্মিত পুষ্পদ্বারা সুশোভিত, এবং অনায়াসে সঙ্কুচিত ও বক্র হয় তদ্রূপ কামোদ্দীপক পক্ষের ন্যায় যাহাদের পক্ষ প্রতিভাত হয় সেইরূপ শোভনপক্ষ ও মুখসম্পন্ন বিহঙ্গগণ নির্ম্মিত ছিল।'

পুষ্পকবিমানের আকার ছিল বিরাট, আমাদের আধুনিক এয়ার-বাস সে তুলনায় খেলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর প্রবাল, বৈদুর্যমণি, সোনা প্রভৃতির দ্বারা নানাবিধ যন্ত্রপাতি ছিল বলেই মনে হয়। রথ বা বিমান চালনার অশ্বি হচ্ছে জল, সেই জলাধারও রয়েছে।

আরো দেখা যাক—'তাহার (অর্থাৎ পুষ্পকবিমানের) গবাক্ষ-সমূহ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-নির্ম্মিত। সূর্য্য যে পথ দিয়া গমন করিয়া থাকেন, এই পুষ্পকরথেরও সেই আকাশস্থ বায়ুপথে গতিশক্তি থাকা বশতঃ ইহা যেন সৌরপথের চিহ্নস্বরূপ হইয়া শোভিত রহিয়াছে। বহুমূল্য রত্নময় বস্তুসমূহ এবং বিশেষ বিশেষ দ্রব্যসমূহও তাহাতে বিন্যস্ত ছিল। উহা তপস্যালব্ধ বিক্রমদ্বারা অর্জ্জিত, শিল্প-বিনির্ম্মিত অনেক প্রতিকৃতিদ্বারা সুশোভিত। ইহা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিমানের ব্যবহারোপযোগী বিশেষ বিশেষ বহুমূল্য দ্রব্যরাজীদ্বারা রচিত হইয়াছিল। এবং চালকের মনের সঙ্কল্পানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারিত। *** মহাবেগবান শূণ্যগামী সহস্র সহস্র নিশাচর ভূতগণ উহা বহন করিত; তাহাদের মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বারা অলঙ্কৃত এবং নেত্র পলকহীন, ঘূর্ণায়মান ও বিশাল।'

পুষ্পকবিমান 'প্রভুর মনের গতি বুঝিয়া মারুতের ন্যায় দ্রুততর গমন করিতে পারিত।' চালকের মনের সঙ্কল্পানুসারে আমাদের আধুনিক যুগের রোবট-চালিত মহাকাশযানও তো সর্বত্র যেতে পারে। তাহলে পুষ্পকবিমানও কি অটো-পাইলট বা রোবট-চালিত ছিল? এই বিমানের বহনকারী ছিল 'মহাবেগবান শূণ্যগামী সহস্র সহস্র

নিশাচর ভূতগণ।' তাদের 'মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বারা অলঙ্কৃত' ও চোখ 'পলকহীন, ঘূর্ণায়মান ও বিশাল।' এরা যে স্পেস-স্যুট পরিহিত মহাকাশযান পরিচালক ছিল তাতে কি কোন সন্দেহ আছে? স্পেস-স্যুট পরিহিত আধুনিক মহাকাশচারীদের অদ্ভুত দেখায় নাকি?

রাবণবধের পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে বিভীষণকে পুষ্পকরথ আনতে বললেন। রথ এলে 'রামচন্দ্র সেই কামগামী পর্ব্বততুল্য পুষ্পকরথ দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন।' (লঙ্কাকাণ্ড: ১২৩ সর্গ)। এর পর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সেই রথে উঠলেন। তখন বানরগণ ও বিভীষণ বললেন আমরাও আপনার সঙ্গে অযোধ্যায় যাব; রাম খুশি হয়ে বললেন 'হে সুগ্রীব! শীঘ্র বানরগণের সহিত রথে উঠ। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ! তুমিও অমাত্য ও বান্ধববর্গের সহিত রথের উপরে উঠ।' সবাই রথে উঠে পড়লেন। তারপর 'কুবেরের সেই রথ রামচন্দ্রের অনুমত্যানুসারে আকাশে উঠিল।'

আকাশে উঠবার পর রাম একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে সীতাকে নিচের দৃশ্য দেখাতে লাগলেন—'বৈদেহি! ঐ দেখ লঙ্কানগরী, কৈলাসশিখরতুল্য ত্রিকূট শিখরে অবস্থাপিত রহিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা এই লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সীতে! বানর এবং রাক্ষসগণের বধ্যভূমি ঐ রণভূমির দিকে দৃষ্টিপাত কর। উহা মাংস ও রক্তে কর্দ্দমপূর্ণ হইয়াছে। হে বিশাললোচনে! ঐ দেখ প্রথমনশীল রাক্ষসেশ্বর রাবণ, তোমার নিমিত্তই আমার হস্তে নিহত হইয়া রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছে। এই দেখ, এই স্থানে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ, এইস্থানে রাক্ষস সেনাপতি প্রহস্ত এবং এই স্থানে বানরবর হনূমানের হস্তে ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছে।' (লঙ্কাকাণ্ড: ১২৫ সর্গ)

পুষ্পকবিমানের অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। রাবণের কেবলমাত্র একটি পুষ্পকরথই ছিল না, তার আরো বিমান ছিল এবং সেই সব বিমানে চড়ে তিনি আকাশপথে চলাফেরা করতেন। পুষ্পক বিমান ছিল সর্বাপেক্ষা ভালো ও শক্তিশালী প্রমোদ বিমান।

অর্জুন কি মহাকাশ পাড়ি দিয়েছিলেন ?

অরণ্যকাণ্ডে দেখি লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাক কান কেটে দিতে তার ভাই খর ও দূষণ রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে রামের হাতে মারা পড়ল। তখন অকম্পন নামে এক রাক্ষস জনস্থান থেকে লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে সব জানাল। সে রাবণকে বলল রামকে যুদ্ধে পরাস্ত করা অত্যন্ত কঠিন সেক্ষেত্রে রামের সুন্দরী স্ত্রীকে কৌশলে হরণ করতে পারলে স্ত্রীর বিরহে রাম বেশী দিন বাঁচবেন না। অকম্পনের কথা রাবণের যুক্তিসঙ্গত মনে হল। তিনি ঠিক করলেন সীতাকে হরণ করবেন। 'রাবণ তখনই খর-যোজিত সূর্য্যতুল্যবর্ণ রথদ্বারা দশদিক উদ্ভাসিত করত চলিল। পরে রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই গমনকারী বৃহৎ রথ নক্ষত্রপথবর্ত্তী হইয়া মেঘমধ্যস্থ চন্দ্রকান্তির ন্যায় দেখাইতে লাগিল।'

রাবণ রথে করে তাড়কারাক্ষসীর ছেলে মারীচের আশ্রমে গিয়ে মারীচকে বললেন, রাম খর দূষণকে বধ করেছে, আমার দুর্গ নষ্ট করেছে, জনস্থান ছারখার করে দিয়েছে তাই আমি সীতাকে হরণ করব। তুমি আমাকে সাহায্য কর। মারীচ ভালো ভাবেই রামের শক্তির কথা জানতেন, তিনি রাবণকে ভালো কথায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে লঙ্কায় ফেরৎ পাঠালেন। এর পর সূর্পনখা রাবণের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল। রাবণ এবার স্থির করলেন তিনি সীতাকে হরণ করবেনই। এই ভেবে 'মনোহর যান গৃহে গমন করিলেন এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে সারথিকে রথ সংযোজিত কর এরূপ আদেশ করিলেন। রাবণের আদেশক্রমে সারথিও দ্রুতপদে অবিলম্বে তাঁহার মনোমত এক উৎকৃষ্ট রথ যোজনা করিল। পরে কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ শ্রীমান রাবণ সুবর্ণ-ভূষিত পিশাচের ন্যায় মুখবিশিষ্ট খরসমূহে যোজিত মেঘের ন্যায় শব্দকারী ইচ্ছাগামী রথে আরোহণ করিয়া নদনদীপতি সাগরের অভিমুখে প্রস্থান করিল।'

কেবলমাত্র তাই নয় 'রাবণ কামগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইয়া, মণ্ডলাকার বিদ্যুৎপুঞ্জে ভূষিত বলাকাযুক্ত

মেঘের ন্যায় শোভা পাইল।' তারপর 'যাইতে যাইতে তপঃপ্রভাবে উচ্চলোকপ্রাপ্ত মহাত্মাদিগের তূর্য্যধ্বনিসহ গীতশব্দে মুখরিত, সুবিস্তৃত, দিব্যমাল্যভূষিত বহুতর স্বেচ্ছাগামী পাণ্ডুরবর্ণ বিমান এবং অনেক গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাকে দেখিল।'

অর্থাৎ রাবণ আকাশ ছাড়িয়ে মহাকাশে চলে গেছেন তাই তিনি খুব সম্ভবত কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে দেখতে পেয়েছেন। স্বেচ্ছাগামী অর্থে যা আপনা আপনি চলে। কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকেও স্বেচ্ছাগামী বলা চলে, তাই নয় কি ?

এরপর অরণ্যকাণ্ডের ৪৯ সর্গে রাবণ 'যশস্বিনী জনকনন্দিনী সীতাকে পরুষবাক্যে গম্ভীরস্বরে ভর্ৎসনা করত ক্রোড়মধ্যে স্থাপন করিয়া রথে উঠিল। ***পরে সেই কামপীড়িত রাবণ, পন্নগরাজ বধূর ন্যায় বিচেষ্টমানা অকামা সীতাকে লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিল। তখন সীতাদেবী রাক্ষসেন্দ্র রাবণ কর্ত্তৃক আকাশপথে অপহৃতা হইয়া যেন উন্মাদিনী ও পীড়িতা হইলেন ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।'

হনুমান রাবণের প্রাসাদের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে 'পুষ্পকরথ দেখিবার সময় অন্য উৎকৃষ্ট রথও দেখিলেন।' (সুন্দরকাণ্ড : ৮ সর্গ)

রামায়ণের মতো মহাভারতেও বিমানের ছড়াছড়ি। এবার মহাভারত থেকে কিছু উল্লেখ করছি।

জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞে তক্ষককে উদ্দেশ্য করে আহুতি দেওয়া হল। তক্ষক ইন্দ্রলোকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তখন রাজা জনমেজয় বললেন যে ইন্দ্রসমেত তক্ষককে উদ্দেশ্য করে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হোক। যজ্ঞের হোতা তাই করলেন। তখন 'দেবরাজ বিমানারোহণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। নাগরাজ তক্ষক ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার উত্তরীয় বসনে নিবদ্ধ ছিল। শেষ আহুতি প্রদান করিবামাত্র ইন্দ্র তক্ষকের সহিত ব্যথিতহৃদয় হইয়া আকাশমণ্ডলে দৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। পুরন্দর সেই যজ্ঞ দেখিয়াই অতিশয় ভীত ও ত্রস্ত হইয়া তক্ষককে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভবনে পলায়ন করিলেন।' (আদিপর্ব : ৫৬ অধ্যায়)

উপরিচর রাজা একবার কঠিন তপস্যা শুরু করলেন। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা ভাবলেন উপরিচর সিদ্ধিলাভ করলে হয়তো ইন্দ্রত্বপদ নিয়ে নেবেন। ইন্দ্র তখন উপরিচরকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য লোভ দেখাতে লাগলেন—'আমি তোমাকে দেবোপভোগ্য আকাশ-গামী, দিব্য, স্ফটিকময় মহৎ বিমান প্রদান করিতেছি, ইহা সর্ব্বদা তোমার নিকট উপস্থিত থাকিবে। এই মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে তুমিই একজন বিমানে আরোহণ করিয়া সাক্ষাৎ-শরীরে বিশিষ্ট দেবতার ন্যায় উপরি বিচরণ করিবে।' (আদিপর্ব, ৬৩ অধ্যায়)

ইন্দ্রের এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বক্তব্য থেকেই জানা যাচ্ছে যে বিমানের অধিকার ছিল একমাত্র দেবতাদের। মর্তের মানুষ বিমানে চড়ে বেড়াবার কথা ভাবতেও পারত না। সে-কারণেই ইন্দ্র বলছেন যে মর্তের মধ্যে একমাত্র রাজা উপরিচর সশরীরে এই বিমানে চড়ে দেবতাদের মতো আকাশমার্গে ঘুরে বেড়াতে পারবেন।

আদিপর্বের ১২৩ অধ্যায়ে দেখি বৈশম্পায়ন বলছেন, 'হে জনমেজয়! যখন গান্ধারী এক বৎসর গর্ভধারণ করিয়াছেন, তখন কুন্তী গর্ভের নিমিত্ত অক্ষর ধর্ম্মকে আহ্বানপূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া পূজা প্রদান করিলেন এবং পূর্ব্বে দুর্ব্বাসাকর্ত্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রপ্রভাবে ধর্ম্মদেব সূর্য্যসদৃশ বিমানে আরোহণ করিয়া যেখানে কুন্তী জপ করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।'

বনপর্বের ৪১ অধ্যায়ে অর্জুন কিরাতরূপী মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে পাশুপত অস্ত্র লাভ করলেন। এর পর ইন্দ্র অর্জুনকে দেখা দিয়ে বললেন দেবতাদের প্রয়োজনীয় কাজ সিদ্ধ করার জন্য—'হে মহাত্মাতে! তুমি স্বর্গারোহণ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হও, তোমার নিমিত্ত মাতলির সহিত রথ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমন করিবে।'

তাহলে স্বর্গে যাওয়ার জন্য সজ্জীভূত হতে হয়। চাঁদে বা মহাকাশে যেতে আমাদের মহাকাশচারীদেরও তো অনেক সাজসজ্জা করতে হয় অর্থাৎ 'স্পেস-স্যুট' পরতে হয়। ইন্দ্র কি অর্জুনকে 'স্পেস-স্যুট' পরে সজ্জীভূত হবার ইঙ্গিত করেছিলেন? আমরা পূর্বেও লক্ষ্য

করেছি দেবতারা এবং দেব-মহাকাশচারীরা স্বর্গে বা মহাকাশে যেতে হলে 'স্পেস-স্যুট' পরেন।

অর্জুনের 'স্পেস-স্যুট' পরার কোন বিশদ বিবরণ আমরা পাই না। তবে দেখি তিনি রথে ওঠার আগে 'গঙ্গায় অবগাহন করত শুচি হইয়া জপ্য মন্ত্র যথাবিধি জপ করিলেন, পরে বিধিপূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া মন্দরগিরিকে যথান্যায়ে সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।' তারপর 'বীর শক্রহন্তা অর্জুন এইরূপে শৈলরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া ভাস্করের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ করত দিব্যরথে আরোহণ করিলেন।' এর মধ্যে 'স্পেস-স্যুটে'র যে ইঙ্গিত রয়েছে আশা করি তা বুঝতে অসুবিধা নেই।

যাই হোক, অর্জুন ইন্দ্রের রথের জন্য অপেক্ষা করছেন এমন সময়, 'মাতলির সহিত মহাপ্রভাবান্বিত রথ যেন জলদ-পটল দ্বিধাকরণ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল তিমিরশূন্য ও মহামেঘ-রব-তুল্য শব্দে দিক সকল পূরণ করিয়া তথায় আগমন করিল। *** বায়ুতুল্য বেগশালী দশ-সহস্র অশ্ব সেই মায়াময় দিব্য রথ বহন করিয়া এমতবেগে আগমন করিতেছে যে তাহা নেত্রদ্বারা লক্ষ্য করা যায় না। *** মহাবাহু পার্থ ঐ রথে অবস্থিত, তপ্তহেমভূষিত মাতলি নামক ইন্দ্রের সারথিকে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন।' (বন, ৪৩ অধ্যায়)

এই রথ টানছে দশহাজার অশ্ব! অর্থাৎ রথের চালক-শক্তি—সেই অশ্বি, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। ইন্দ্রের সারথিকে অর্জুন ইন্দ্র বলে ভুল করেছেন—কিন্তু কেন? কারণ নিশ্চয় মাতলি ইন্দ্রের মতো পোশাক পরে এসেছিলেন, তাই! 'স্পেস-স্যুট' পরিহিত মহাকাশচারীদের তো প্রায় একই রকম দেখায়। শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামও তো ইন্দ্রের মতো আভরণাদি-ভূষিত বহু মহাত্মাকে দেখেছিলেন।

ইন্দ্রের এই রথ প্রমোদ-বিমান নয়—এটি একটি যুদ্ধ বিমান। কারণ দেখা গেল এই 'রথের উপরিভাগে ইন্দীবর সদৃশ শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল প্রভান্বিত কণকভূষণ ভূষিত বংশদণ্ড নির্ম্মিত মহানীলসদৃশ বৈজয়ন্ত

নামক ধ্বজ দৃষ্ট হইতে লাগিল। * * * সেই রথে ভীষণ অসি, শক্তি, ভয়ানক গদা, দিব্য-প্রভাবান্বিত প্রাস, মহাপ্রভাবান্বিত বিদ্যুৎ, অশনি, নির্ঘাৎ ও মহামেঘ সদৃশ নিঃস্বনকারী বায়ুস্ফোটক চক্রযুক্ত পাষাণাদি গোলক নিক্ষেপ-যন্ত্র, প্রজ্জ্বলিতমুখ মহাকায় সুদারুণ সর্পগণ ও শুভ্র মেঘরাশির ন্যায় শিলারাশি এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে।'

বিদ্যুৎ, অশনি এ সবের ব্যবহার দেবতারা জানতেন তার প্রমাণ বেদ। পুনরায় 'ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা' গ্রন্থ থেকে সামান্য আলোচনা করে দেখা যেতে পারে—

যুবং পেদব পুরুবারমশ্বিনা স্পৃধাং শ্বেতং তরুতারং দুবস্যথঃ।

শর্যৈরভিদ্যুং পৃতনাসু দুষ্টরং চর্কৃত্যমিন্দ্রমিব চর্ষণীসহম ॥ ৮ ॥

ঋ. অষ্ট. ১অ. ৮ ব. ২১ মং. ১০ (ঋ. ১। ১১৯। ১০—হরফ)

ভাষার্থঃ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন ধাতু ও কাষ্ঠাদির যন্ত্র ও বিদ্যুৎ এই দুই পদার্থের প্রয়োগদ্বারা তারবিদ্যা সিদ্ধ হইয়া থাকে। নিরুক্তের প্রমাণ দ্বারা ইহারা অশ্বি নামে পরিচিত। অর্থাৎ ইহা শীঘ্র গমনাগমনের হেতু হয়। এই তারবিদ্যার দ্বারা অনেক উত্তম ব্যবহারের ফল মনুষ্য প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। সৈনিক বিভাগের রাজপুরুষদিগের পক্ষে এই তারবিদ্যা বিশেষ হিতকারী হইয়া থাকে। উপরোক্ত তারগুলি শুদ্ধ ধাতু দ্বারা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। * এবং তাহাতে বিদ্যুৎ দ্বারা যুক্ত করিতে হয়। ইহা সমস্ত সেনাগণের মধ্যে দুঃসহ প্রকাশযুক্ত হয় এবং কেহই উহাকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না।† ইহা সকল প্রকার কার্য্যকেই বারম্বার চালাইবার যোগ্য। এজন্য অনেকপ্রকার কলা যন্ত্রাদি চালাইতে সক্ষম ও অন্যান্য অনেক উত্তম ব্যবহার বিষয় সিদ্ধি করিবার জন্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া তাহার তাড়ন করা কর্ত্তব্য। পরমোত্তম ব্যবহার সকল সিদ্ধির হেতু এবং দুষ্ট শত্রুগণকে পরাজয় ও শ্রেষ্ঠ

* শুদ্ধ ধাতুর তারের Conductivity বেশী।

† তারের ভিতর দিয়ে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহিত হলে সেই তার ডিঙিয়ে যাওয়া নিশ্চয় বিপদজ্জনক—কিন্তু এখানে কি কোন ফোর্স-ফিল্ড তৈরির কথা বলা হয়েছে?

পুরুষের বিজয় হেতু তারবিদ্যা সিদ্ধি করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যের যে সকল সেনাগণকে যুদ্ধাদিরূপ কষ্টকর অনেক কার্য্য করিতে হয় তারযন্ত্র-বিষয়ক যন্ত্রাদি তাহাদিগের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। *

যেরূপ কি সমীপস্থ কি দূরস্থ সমস্ত পদার্থকেই সূর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে তদ্রূপ তারযন্ত্র দ্বারাও দূর ও সমীপের সকল প্রকার ব্যবহার প্রকাশ হইয়া থাকে। এই তারযন্ত্র পূর্বোক্ত অশ্বির গুণ দ্বারাই সিদ্ধ হয়, ইহাকে বিশেষ প্রযত্ন দ্বারা সিদ্ধি করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য।'

যাই হোক, মাতলি অর্জুনকে বললেন, 'আপনি পাকশাসনের (ইন্দ্রের) আদেশানুসারে আমার সহিত মনুষ্যলোক হইতে স্বর্গলোকে আরোহণ করুন; তথায় অস্ত্রলাভ করিয়া পুনর্ব্বার মর্ত্তলোকে আগমন করিবেন।' অর্জুন বিমানে উঠতে ভয় পেলেন। তিনি মাতলিকে বললেন, 'হে মাতলে! তুমি শত শত রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ও সুদুর্লভ এই উৎকৃষ্ট রথে শীঘ্র গিয়া আরোহণ কর। এই উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করা সুমহাভাগ্যবান ভূরিদক্ষিণাপ্রদ যাজ্ঞিক নৃপতিদিগের বা দেব-দানবদিগেরও দুর্লভ। যাহারা কখনো তপোনুষ্ঠান করে নাই, তাহাদিগের এই দিব্য মহারথে আরোহণ করিতে পারা দূরে থাকুক, তাহারা ইহা স্পর্শন বা দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। হে সাধো! তুমি রথে আরূঢ় হইয়া অধিষ্ঠিত হইলে অশ্বসকল স্থির হইবে, তখন আমি সুকৃতী পুরুষের সৎপথে আরোহণের ন্যায় ঐ রথে আরোহণ করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইন্দ্রসারথি মাতলি অর্জুনের উক্ত বাক্য শ্রবণমাত্র ত্বরাপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া রশ্মিদ্বারা অশ্বগণকে সংযত করিলেন।'

মাতলি ইন্দ্রের আজ্ঞায় অর্জুনকে স্বর্গে অর্থাৎ মহাকাশের কোন গ্রহে অথবা কৃত্রিম উপগ্রহে নিয়ে যাওয়ার জন্য শক্তিশালী মহাকাশযান নিয়ে এসেছিলেন। এর পর মাতলি রথে উঠে 'রশ্মিদ্বারা অশ্বগণকে সংযত করিলেন।' এই রশ্মি কি বল্গা নাকি কোন শক্তিশালী রশ্মি?

এখানে কি লেসার রশ্মির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে?

এর পর 'ধীমান কুরু-নন্দন সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত আদিত্যসদৃশপ্রভ'-বিশিষ্ট অদ্ভুতকার্য্য দিব্যরথে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিলেন। তিনি ভূমিচারী মনুষ্যদিগের দর্শনপথের অতীত হইয়া সহস্র সহস্র অদ্ভুত-দর্শন বিমান অবলোকন করিলেন। সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রবেশ করেন না। লোকসকল স্ব স্ব পুণ্যলব্ধ প্রভাদ্বারাই প্রকাশ পান। যে সকল অতি বৃহৎ পদার্থ ইহলোক হইতে দূরতাপ্রযুক্ত দীপের ন্যায় ক্ষুদ্র তারারূপ দৃষ্ট হয়, পাণ্ডুনন্দন তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব জ্যোতিদ্বারা দীপ্যমান রূপবান ও সাতিশয় প্রভাসম্পন্ন দেখিলেন।'

অর্জুন মহাকাশযানে চড়ে পৃথিবীর আবহমণ্ডল ছাড়িয়ে এমন এক অসীম মহাশূন্যে চলে গেছেন যেখানে সূর্য বা চাঁদ কাউকেই দেখতে পাচ্ছেন না। অগ্নিও প্রবেশ করেন না অর্থাৎ কোন আলোও নেই। সেই ঘন অন্ধকারে লোকসকল অর্থাৎ নক্ষত্রসকল স্ব স্ব প্রভাদ্বারাই প্রকাশ পান। পৃথিবী থেকে যে তারাদের ছোট ছোট প্রদীপের শিখার মতো মিট মিট করতে দেখা যায় অর্জুন এখন তাদের 'স্ব স্ব জ্যোতিদ্বারা দীপ্যমান, রূপবান ও সাতিশয় প্রভাসম্পন্ন দেখিলেন' — অর্থাৎ নক্ষত্রগুলিকে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। এ যদি মহাকাশের বর্ণনা না হয় তাহলে কোথাকার বর্ণনা? মহাকাশ সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী উরি গ্যাগারিন লিখেছিলেন: 'The sky is perfectly black. Against this background the stars look brighter and are outlined more sharply.' দুটি বর্ণনার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে কি?

এরপর অর্জুন অমরাবতী নামে ইন্দ্রপুরীতে পৌছালেন। 'সেখানে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল। তিনি পুষ্প-সৌরভান্বিত পবিত্র বায়ুদ্বারা অনুবীজিত হইতে লাগিলেন এবং তথায় দেখিলেন, সহস্র সহস্র কামগ দেববিমান অবস্থিত আছে, অযুত অযুত কামগ দেববিমান যাতায়াত করিতেছে।* * * তিনি চতুর্দ্দিকে স্তূয়মান হইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞায় সুরবীথি নামে প্রসিদ্ধ বিপুল নক্ষত্রমার্গে গমন করিলেন। অরিন্দম কুরুনন্দন সেখানে সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ,

মরুদগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ; পবিত্র ব্রহ্মর্ষিগণ দিলীপ প্রভৃতি বহু রাজর্ষিগণ, তুম্বুরু, নারদ ও হাহা-হূহূ নামে গন্ধর্ব্ব-দ্বয়ের সহিত যথাবিধি সমাগত হইয়া পশ্চাৎ দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন।' (বনপর্ব, ৪৩ অধ্যায়)

এই অমরাবতী কোন গ্রহ অথবা বিরাট কোন কৃত্রিম উপগ্রহও হতে পারে। তবে এখান থেকেই দেবতারা যে গ্রহ-গ্রহান্তরে যাতায়াত করতেন তাতে কোন সন্দেহই নেই কারণ অর্জুন 'রকেট-বেস' বা গ্রহান্তর স্টেশন চাক্ষুস দেখে ছিলেন। আমরা অত বড় না হলেও স্কাই-ল্যাবের মতো বিরাট কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছি।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৪র্থ সর্গে দেখি রাবণের পূর্বপুরুষ সুকেশ মহাদেবের কাছ থেকে বর পেয়ে অত্যন্ত গর্বিত হল ও 'প্রভু হরের নিকট রাজ্যসম্পদ এবং আকাশগামী পুর পাইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিল।' এই বিরাট আকাশগামী পুর কৃত্রিম উপগ্রহও হতে পারে।

পাঠক হয়তো লক্ষ্য করেছেন পুরাকালের দেবতারা রথকেও বিমান বলতেন। এই রথ অবশ্য কেবল মাটিতেই চলত না, কোন কোন রথ স্থলে ও জলেও চলতে পারত। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৪৬ তম অধ্যায়ে আমরা দেখি রাম রথে করে তমসানদী পার হলেন। রামের আজ্ঞায় সারথি সুমন্ত্র বললেন, 'রথিপ্রবর মহাবাহো! এই রথ যোজিত হইয়াছে, আপনি সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত ইহাতে আরোহণ করুন। পরে রঘুনন্দন রাম সেই রথে অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল রাখিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তাহাতে আরোহণ করিয়া তদ্দারা দ্রুত-গামিনী আবর্ত্ত-সমাকুলা তমসানদীর পরপারে গেলেন।' যদিও এই রথ জলপথে অথবা শূন্যপথে তমসানদী পার হয়েছিল সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয় নি। তবে খুব সম্ভব জলপথেই পার হয়েছিল অন্যথায় 'দ্রুতগামিনী আবর্ত্ত-সমাকুলা' তমসানদীর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

দেবতাদের গ্রহান্তর-স্টেশনটি কোথায় ছিল ?

গ্রহান্তরবাসী আর্যরা বিমান বা মহাকাশযান তৈরির কলা-কৌশল জানতেন, বিদ্যুতের ব্যবহার জানতেন। যখন তখন তাই তারা স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক ও মর্তলোকে যাতায়াত করতেন। মর্তলোকে অবতরণের জন্য নিশ্চয় একটি গ্রহান্তর-স্টেশন ছিল। কোন গোপন সুরক্ষিত জায়গায় এই গ্রহান্তর-স্টেশন থাকার সম্ভাবনাই বেশী। কোথায় ছিল এই স্টেশন ?

এই গ্রহান্তর-স্টেশনের কোন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া না গেলেও বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে এর একটি সম্ভাব্য স্থান নিশ্চয় খুঁজে বের করা সম্ভব।

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৪৩ সর্গে সুগ্রীবের কাছ থেকে এই দেবভূমি ও গ্রহান্তর-স্টেশনের সংবাদ পাওয়া যায়। সুগ্রীব সীতার সন্ধানে পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে বানরদের পাঠাবার পর এবার উত্তরদিকে হিমালয়ে খোঁজ করবার জন্য পাঠাচ্ছেন। পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বানরদের বলে দিচ্ছেন, 'পরে সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাক ভূধর অতিক্রম করিয়া উত্তর সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী কনকময় সুমহান সোমগিরি দেখিবে। সেইস্থান সূর্য্যকিরণ শূন্য হইলেও পর্ব্বতের প্রভাদ্বারা এরূপ প্রকাশিত হয় যেন প্রভাকরকিরণে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সেই সোমপর্ব্বতে বিশ্বব্যাপী ভগবান বিষ্ণু, একাদশরুদ্র-রূপী শম্ভু এবং ব্রহ্মর্ষি পরিবেষ্টিত দেবেশ ব্রহ্মা বাস করিয়া থাকেন। তোমরা কদাচ তথায় যাইও না, অন্য কোন প্রাণীই তথায় যাইতে পারে না। কারণ সেই সোমগিরি দেবতাগণেরও দুর্গম সুতরাং সেই ভূধর দূর হইতে দেখিয়া সত্বর প্রত্যাগমন করিবে। কপিগণ! তোমরা এই স্থান পর্য্যন্তই যাইতে পারিবে, ইহার পর যে স্থান আছে, তাহা সূর্য্যবিহীন এবং অসীম, তোমরা তথায় যাইতে পারিবে না, তাহার বিষয় আমিও জানি না।'

দক্ষিণমার্গে পিতৃযান অর্থাৎ পিতৃরাজ যম যে গ্রহান্তর-স্টেশন তৈরি করেছিলেন সে কথা সুগ্রীবই বলেছেন, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সেখানে সুগ্রীব বলেছিলেন 'ঘোর অন্ধকারাবৃত সেই পিতৃলোক পিতৃরাজ যমের রাজধানী বলিয়া কথিত হইয়াছে।' এখানে কিন্তু 'কথিত হইয়াছে' এ-কথা বলেন নি। অর্থাৎ দেবযান বা দেবভূমির গ্রহান্তর-স্টেশন যমের গ্রহান্তর-স্টেশন থেকে বহু পরের। দেবভূমিতে অর্থাৎ হিমালয়ে দেবতাদের ঘাঁটি সুগ্রীব ও রাবণের সমসাময়িক। অর্থাৎ লেমুরিয়া সমুদ্রে ডুবতে শুরু করার পরের ঘটনা।

এই হিমালয় পর্বতে একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর এই সংরক্ষিত এলাকার পর সূর্যহীন অসীম দেশ। যার সোজা অর্থ এই সংরক্ষিত এলাকা থেকে এমন স্থানে যাওয়া সম্ভব যেখানে সূর্যের আলো নেই ও যে দেশ অসীম। এ মহাকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই হিমালয়েই হচ্ছে দেবতাদের দ্বিতীয় গ্রহান্তর-স্টেশন।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা' বইয়ে এই গ্রহান্তর-স্টেশনেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা দেবগণের পরমনিবাস স্বর্গলোকের উল্লেখ আবহমানকাল থেকেই শুনে আসছি। এই লোকটি একটি কল্পনার জগৎ নয়, একটি যথার্থ ভৌগোলিক ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডটি হিমালয় পর্বতের উচ্চতর বিস্তীর্ণ ভূভাগকে অধিকার করে ছিল এবং এই অঞ্চলটিই হচ্ছে তথাকথিত স্বর্গভূমি। এই স্বর্গভূমিকে এমন ভাবে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল যে নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীরা কোন ক্রমেই আসতে সমর্থ হতেন না।'

মিত্র মহাশয় আরো লিখেছেন, 'বহু মর্ত্যবাসী বিবিধ প্রয়োজনে অথবা কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য স্বর্গলোকের এই সব গুপ্তপথের অনুসন্ধান করতেন।' তিনি অনেকগুলি আখ্যায়িকার কথাও বলেছেন। এখানে একটি ঘটনা তুলে দিচ্ছি—'ঔর্ণায়ব সামের ঘটনাটি এইরূপ। একদা অঙ্গিরসগণ একটি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ স্বর্গরাজ্যে পৌঁছাতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু স্বর্গলোকে দেবতাদের আবাসস্থল তাঁরা নির্ণয় করতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে কল্যাণ নামক একজন তাঁর সঙ্গীদের থেকে

আলাদা হয়ে নিজে সেই পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি ঊর্ণায়ু নামক এক গন্ধর্বের দেখা পেলেন। উক্ত গন্ধর্ব তখন অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়ায় রত ছিলেন। তিনি কল্যাণকে দেখে সম্বোধন করে বললেন, তুমি তো দেখছি যেন একটি দলবল নিয়ে স্বর্গরাজ্যে এসে পড়েছ ; তবে দেবতাদের বাসস্থান যে কোন্ পথে তা খুঁজে পাচ্ছ না। এই বলে তিনি তাঁকে একটি বিশেষ সাম গাইতে উপদেশ দিলেন যার ফলে অভীষ্ট স্থানে পৌঁছানো সম্ভব হবে। তবে তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বললেন—তুমি যেন তোমার সঙ্গীদের বোলো না যে তুমিই এই সামটি প্রত্যক্ষ করেছ। কল্যাণ তাঁর সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসে বললেন—স্বর্গরাজ্যের যে পথে দেবগণ অধিষ্ঠান করেন সেটি আমি জানতে পেরেছি। তোমরা এই সামটি আচরণ কর তাহলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তাঁর সঙ্গীরা তখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন—এই সাম সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দিলেন কে ? কল্যাণ কিন্তু সত্য গোপন করে বললেন—আমিই এই সামটি প্রত্যক্ষ করেছি। অতঃপর সকলেই সেই সামটি আচরণ করে দেবপথে প্রস্থান করলেন, কিন্তু মিথ্যাচারণের জন্য কল্যাণ নিজে সেখানে যেতে সমর্থ হলেন না। তিনি পৃথিবীতে শ্বেতকুষ্ঠে আক্রান্ত হয়েছিলেন।'

আখ্যায়িকাটির মধ্যে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ স্বর্গরাজ্যের পথ অত্যন্ত গোপনীয়, দ্বিতীয়তঃ সাম আচরণ (পাঠ নয়) করলে দেবপথ দেখতে পাওয়া যায় এবং তৃতীয়তঃ কল্যাণ শ্বেতকুষ্ঠে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

তাহলে দেবতারা কি কোন শক্তিশালী ফোর্স ফিল্ডের আড়ালে তাদের স্বর্গরাজ্যের পথ সুরক্ষিত করে রাখতেন ? সাম আচরণের অর্থ কি কোন বিশেষ প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ফোর্স ফিল্ড নষ্ট করা যেত ? কল্যাণ কি অন্য কোন কারণে শ্বেতকুষ্ঠে আক্রান্ত হয়েছিলেন ? অথবা একাকী দেবপথের সন্ধান করাকালীন অজান্তে কোন তেজস্ক্রীয় এলাকায় ঘুরে বেড়াবার জন্য শ্বেতকুষ্ঠে আক্রান্ত হয়েছিলেন ? নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না।

পাণ্ডবরা যখন কাম্যকবনে বনবাসকাল কাটাচ্ছেন তখন যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অর্জুন ইন্দ্রের কাছ থেকে অস্ত্র আনতে হিমালয়ে গেলেন। 'মহাত্মা অর্জ্জুন যোগযুক্ত হইয়া বায়ুতুল্য বা মনঃসদৃশ দ্রুত গতিতে এক দিবসের মধ্যেই দেবগণ সেবিত অতি পবিত্র দিব্য হিমালয় পর্ব্বতে উপনীত হইলেন।' (বনপর্ব, ৩৭ অধ্যায়)

এরপর অর্জুন ইন্দ্রকীল পর্বতে গেলেন 'তখন তিনি অন্তরীক্ষ হইতে 'তিষ্ঠ' এই বাক্য স্পষ্টরূপে শুনিলেন।' অর্জুন চারদিকে তাকিয়ে এক তপস্বীকে দেখতে পেলেন। তপস্বী অর্জুনকে 'ধনু পরিত্যাগ' করতে বললেন। অর্জুন শুনলেন না, তখন সেই তপস্বী নিজেকে ইন্দ্র বলে পরিচয় দিয়ে বললেন, 'তুমি যখন এখানে আগমন করিয়াছ তখন তোমার অস্ত্রে আর প্রয়োজন কি? তুমি সম্প্রতি পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছ অতএব উত্তমলোকে বাস প্রার্থনা কর।'

আসলে অর্জুন দেবতাদের সংরক্ষিত এলাকায় এসে পড়েছেন তাই এত ঝামেলা। অর্জুন যাতে এখানকার খবর নিয়ে আর মর্তলোকে ফিরে যেতে না পারেন তাই তাঁকে উত্তমলোকে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। অর্জুন উত্তমলোকে যেতে সম্মত হলেন না। তখন সেই ইন্দ্র বললেন শিবকে সন্তুষ্ট করতে পারলে অর্জুন প্রার্থিত অস্ত্র পাবেন। অর্জুন উগ্র তপস্যা করলেন। মহাদেব কিরাতবেশে অর্জুনকে দেখা দিলেন। দুজনের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেল। অর্জুনের অস্ত্রে কিরাতের কিছুই হল না দেখে বিস্মিত অর্জুন ভাবতে লাগলেন, 'কি আশ্চর্য্য! এই ব্যক্তি হিমালয়-শিখরবাসী, ইহার শরীর অতি সুকুমার, এ ব্যক্তি আমার গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত নারাচ-সমূহ অব্যাকুল চিত্তে স্বীকার করিতেছে; এ ব্যক্তি কে? সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, কি অন্য কোন দেবতা, কিম্বা যক্ষ বা কোন অসুর, কেননা এই গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়-পৃষ্ঠে দেবতাদিগেরও সমাগম হইয়া থাকে।'

অর্জুন আগে থেকেই জানতেন যে হিমালয়ে 'দেবতাদিগেরও সমাগম' হয়ে থাকে। অর্থাৎ দেবতারা স্বর্গলোক বা ব্রহ্মলোক থেকে এখানেই এসে নামেন।

এর পর অর্জুন বুঝতে পারলেন ঐ কিরাতই মহাদেব। তখন তিনি মহাদেবের স্তব করতে লাগলেন, 'হে দেবনাথ! আমি তোমার দর্শনাভিলাষেই তোমার প্রিয় তাপসালয় এই উত্তম মহাগিরিতে আগমন করিয়াছি।' মহাদেব অর্জুনের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র দান করে, 'উমার সহিত মহাদেব শুভ্রবর্ণ তট, সানু ও কন্দরবিশিষ্ট, অন্তরীক্ষচর মহর্ষিগণ সেবিত শুভ সেই গিরিবর পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের সমক্ষেই আকাশপথে গমন করিলেন।' (বনপর্ব, ৪০ অধ্যায়)

পরবর্তী ঘটনাও লক্ষ্য করবার মতো। মহাদেব চলে যাওয়ার পর অর্জুন যখন নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করছেন সেই সময়, 'যাদোগণের ভর্ত্তা ও নিয়ন্তা বরুণদেব নদ, নদী, নাগ, দৈত্য ও সাধ্যদেবগণের সহিত তৎপ্রদেশে সমাগত হইলেন। অনন্তর যক্ষগণের সহিত সুবর্ণবর্ণদেহধারী অদ্ভুতোপমো রূপবান ধনাধিপতি শ্রীমান কুবের মহাপ্রদীপ্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক যেন আকাশমণ্ডলকে বিদ্যোতিত করত অর্জ্জুনকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। সেইরূপ লোকান্তকর শ্রীমান প্রতাপবান সর্ব্বপ্রাণী সংহারক সূর্য্যসুত অচিন্ত্যাত্মা ধর্ম্মরাজ সাক্ষাৎ দণ্ডপাণি যম মূর্ত্তিমান ও অমূর্ত্তিমান পিতৃগণের সহিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, গন্ধর্ব্ব, গুহ্যক ও পন্নগলোক প্রকাশিত করত যুগান্তকালীন উদিত দ্বিতীয় মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারা সকলে মহাগিরির বিচিত্র ও দীপ্যমান শিখরসকল আশ্রয় করিয়া তথা হইতে তপস্বী অর্জ্জুনকে দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে সুরগণ পরিবৃত ভগবান মহেন্দ্র মহেন্দ্রাণীর সহিত ঐরাবতোপরি আরোহণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার মস্তকে পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্রধৃত হওয়াতে তিনি যেন শুভ্রবর্ণ মেঘস্থিত নক্ষত্রপতি সুধাকররূপে শোভমান হইয়াছেন এবং গন্ধর্ব্ব ও তপোধন ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন। তিনি গিরিশৃঙ্গের আশ্রয়ে উদিত আদিত্যের ন্যায় উপস্থিত হইলেন।'

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা হচ্ছে সুমের সভ্যতা। সেখানকার মন্দির 'জিগ্‌গুরাট' তো পিরামিডেরই আর এক সংস্করণ। এগুলো শুধু মন্দিরই ছিল না, ছিল এক ধরনের মান-মন্দির

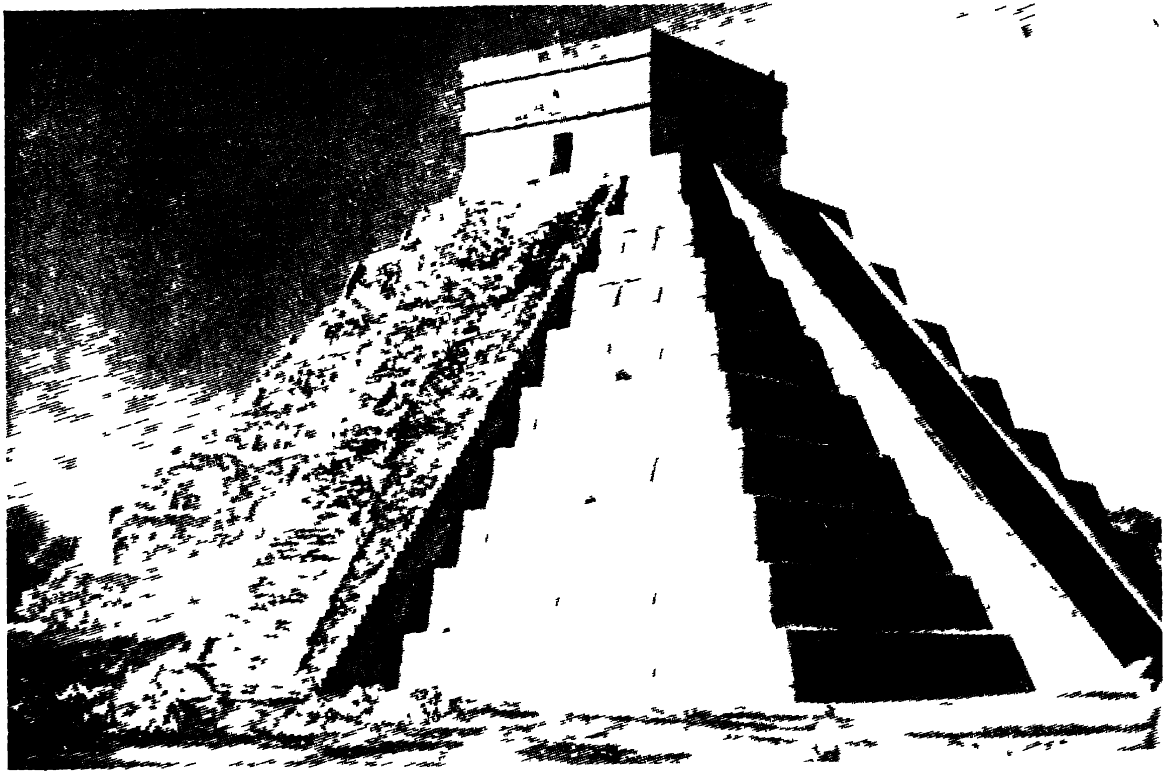

চিচেনইৎজার (…সা …ভ্যতা) 'এল ক্যাস্টিলো' …স্টেপ-পিরামিড। প্রত্যেক …দিকে ১টি করে সিঁড়ি। …চারপাশের সিঁড়ির …যোগফল ৩৬৪ আর …উপরের চাতাল নিয়ে … ।

…শরের সমরে আছে …স্টেপ-পিরামিড …টি- …দিকের দুই তীরেই গড়ে উঠেছিল রহস্যময় …পিরামিড সভ্যতা

[illegible] ফারাও [illegible] তৈরি গীজার বিস্ময়কর পিরামিড। বয়স সাড়ে চার হাজার বছর থেকে পাঁচ হাজার বছর। এর অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী [illegible] ফিল্ড আছে বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন

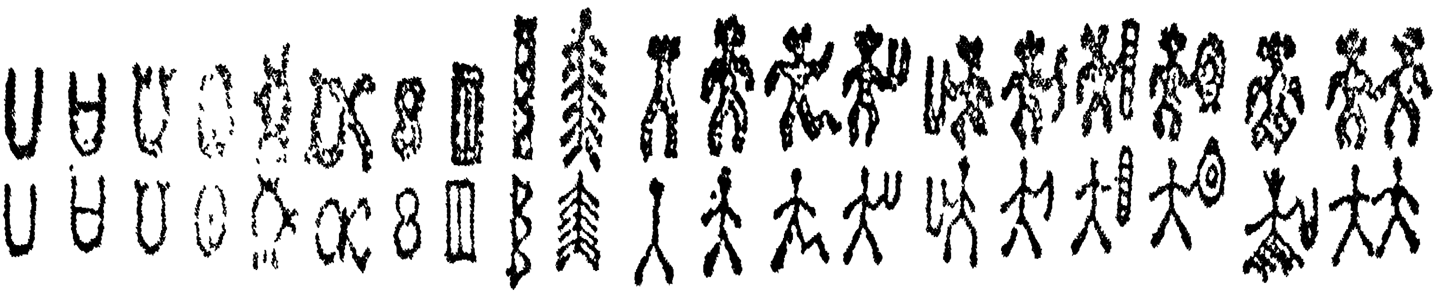

উপরে ইস্টার দ্বীপের লিপি ও নীচে মোহেঞ্জোদাড়োর শিলমোহরের লিপি। দুটো লিপিরই অবশ্য এখনো পাঠোদ্ধার হয়নি। পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই রহস্যময় সভ্যতার লিপির মধ্যে এত চমৎকার মিল হয় কি করে?

বরুণ, কুবের, যম ও ইন্দ্র সবাই অর্জুনকে দেখার জন্য এলেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত অর্জুন কিছুই জানতে পারেন নি। তখন যম 'মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে' (মাইক্রোফোনের সাহায্যে নাকি!) অর্জুনকে সম্বোধন করে বললেন, 'অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! তুমি দর্শন কর, অদ্য আমরা লোকপাল সকল সমাগত হইয়াছি, তোমাকে চক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি আমাদিগকে দর্শন করিতে ক্ষমতা লাভ কর।'

দৈবী ব্যাপার সবই ঘটে এই হিমালয় পর্বতে। কৈলাসে বাস মহাদেবের। তার কাছেই বাস কুবেরের। নর ও নারায়ণ তপস্যা করেন বদরিকাশ্রমে। শকুন্তলার জন্ম হয় এই হিমালয় পর্বতে মালিনী নদীর কূলে। পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম হল হিমালয়ে। বশিষ্ঠের আশ্রম হিমালয়ের সুমেরু পর্বতের কাছে। নারদ তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করলেন বিষ্ণুপ্রয়াগে অলকানন্দা ও ধবলী গঙ্গার সঙ্গমে। কর্ণ পিতা সূর্যের দেখা পেয়েছিলেন কর্ণপ্রয়াগ, অলকানন্দা ও পিণ্ডার-গঙ্গার সঙ্গম স্থলে। মুনি-ঋষিরা তীর্থ ও তপস্যা করতেও আগে ছোটেন হিমালয়ে।

আবার লঙ্কাকাণ্ডে দেখি হনুমান বিশল্যকরণী আনতে গেলেন হিমালয়ে। সেখানে দেখলেন, 'দেবর্ষিগণ সেবিত বহু পবিত্র দিব্য মহাশ্রয়। * * * যেস্থানে ব্রহ্মাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকেন সেই সকল আশ্রম এবং যম-অনুচরগণকে দেখিতে পাইলেন। অগ্নি এবং কুবেরের আলয়, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী সূর্য্যগণের সম্মিলন স্থান, ব্রহ্মালয়, হরের পিনাক নামক ধনু এবং ভূনাভিসংজ্ঞক প্রাজাপত্য স্থানসকল দেখিলেন।'

হিমালয় কি রকম গুরুত্বপূর্ণ স্থান এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। হনুমান যম অনুচরদেরও দেখতে পেয়েছিলেন, যাদের কাজ হচ্ছে দেবতাদের সংরক্ষিত এলাকা পাহারা দেওয়া। হনুমান বিশল্যকরণী আনতে যেখানে গিয়েছিলেন সেই জায়গাটি খুব সম্ভবত নন্দনকানন বা ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স, কারণ এই পাহাড়ে বহু ওষধি আছে—ভালো ভাবে সন্ধান করলে এর মধ্যে বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনী লতার খোঁজ

পাওয়া যেতে পারে—এ কথা বলেছেন হিমালয়-প্রেমিক শ্রদ্ধেয় শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। নন্দনকাননে যেতে হলে বদরিকা আশ্রমের আগে গোবিন্দঘাট থেকে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে হয়।

বার বার রামায়ণ মহাভারতে যে সুমেরু পর্বতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার বাস্তব অস্তিত্ব বদরিকাশ্রমের কাছাকাছি। নীল পর্বত হয়তো বদরিকাশ্রমের পিছনের নীলকণ্ঠ পর্বত। দেব-গঙ্গা বা অলকানন্দার উৎপত্তি বদরিকাশ্রম থেকে অল্প দূরে বসুধারা নামে এক জলপ্রপাত থেকে।

স্বর্গ নয়, এ হচ্ছে দেবলোক। বিরাট একটি কলোনী বসানো হয়েছে এখানে। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল, সুতরাং স্বভাবতই সুরক্ষিত (এখন অবশ্য ঋষিকেশ থেকে বাসে করেই এই দেবলোকে পৌঁছানো যায়)। এখানেই বসেছে গ্রহান্তর-স্টেশন। নিজেদের গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছে। পৃথিবীর মানুষদের সংস্পর্শে আসতেই হচ্ছে। তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে কিছু কিছু দৈবী জ্ঞান। তারা হয়ে যাচ্ছেন ঋষি, মুনি ও জ্ঞানী ব্যক্তি। কিন্তু এই সুরক্ষিত এলাকা সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ।

মহাভারতের বনপর্ব আর একটু উল্টে পাল্টে দেখা যাক। যুধিষ্ঠির লোমশ মুনির সঙ্গে ভীম, দ্রৌপদী, নকুল সহদেবকে নিয়ে বহু তীর্থ ঘুরে এবার চললেন বদরিকাশ্রমে। স্বর্গ থেকে অস্ত্র নিয়ে ফিরবেন কৃতী ভাই অর্জুন—তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এগিয়ে আসছেন যুধিষ্ঠির।

লোমশ বললেন, 'তোমরা বহুতর পর্ব্বত, নগর, কানন, নদী ও অনেক শ্রীমন্ত তীর্থদর্শন এবং করদ্বারা অনেক তীর্থোদক স্পর্শন করিলে; এক্ষণে প্রশান্ত-চিত্ত ও সমাহিত হও। এই পথ মন্দর পর্ব্বতের দিকে যাইবে; এই পথ দিয়া তোমাদিগকে দেবগণ ও পুণ্যকর্ম্মা দিব্য ঋষিদিগের নিবাসস্থলে গমন করিতে হইবে। হে রাজন! এই দেবর্ষিগণ সেবিতা শিবজলান্বিকা পুণ্যজনিকা সৌম্যা অলকনন্দা প্রবাহিতা হইতেছেন; ইঁহার আদ্যোপলব্ধিস্থান বদরিকাশ্রম।'

এত সাবধানতা কেন? কারণ এবার যে প্রবেশ করতে হবে দেবতাদের সংরক্ষিত এলাকায়।

কিন্তু সাবধান হয়েও বিশেষ ফল হল কি?

'অনন্তর ঋষি, সিদ্ধ ও অমরগণে সমন্বিত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের প্রিয় ও কিন্নরগণ কর্ত্তৃক আচরিত গন্ধমাদন গিরিতে প্রবেশ করিলেন। হে নরনাথ! সেই বীরগণ গন্ধমাদনে প্রবিষ্ট হইলে প্রচণ্ড বায়ু ও মহৎ বর্ষণ প্রাদুর্ভূত হইল। সহসা ধূলি ও পত্রপুঞ্জ সমুদ্ধূত হইয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রেণু দ্বারা নভোমণ্ডল আবৃত হওয়াতে দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল; তাঁহারা তৎকালে পরস্পর সম্ভাষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না। হে ভারত! তাঁহারা পাষাণচূর্ণ মিশ্রিত বায়ুদ্বারা আকৃষ্যমান ও তমসাবৃত-নেত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারিলেন না। বৃক্ষসকল পবনবেগে ভগ্ন হইয়া নিরন্তর পতিত হইতে লাগিল; সেই সকল পতমান ভগ্নবৃক্ষ ও তদ্ভিন্ন অপরাপর বৃক্ষের মহান শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে সমীরণবেগে অতীব মোহিত হইয়া মনে করিলেন, দ্যুলোক কি খসিয়া পড়িতেছে না, পৃথিবী বা পর্ব্বতবিদীর্ণ হইতেছে! তাহারা তাদৃশ বাত্যাবেগে ভীত হইয়া সন্নিহিত বৃক্ষ, বল্মীকস্তূপ ও উচ্চাবচ স্থানসকল হস্তদ্বারা অন্বেষণ করত তদবলম্বনে লীনপ্রায় হইয়া রহিলেন। মহাবল ভীমসেন কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে লইয়া এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিলেন। ধৌম্য ও ধর্ম্মরাজ নিবিড় অরণ্যমধ্যে লীনপ্রায় হইয়া রহিলেন। সহদেব অগ্নিহোত্র লইয়া পর্ব্বতের কোন স্থান আশ্রয় করিলেন। নকুল, মহাতপাঃ লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা সংত্রস্ত হইয়া যিনি যে বৃক্ষ পাইলেন, তিনি সেই বৃক্ষেই বিলীনপ্রায় হইয়া থাকিলেন। কিয়ৎ কালান্তর পবন মন্দীভূত ও ধূলি-সমদ্ধূতি উপশান্ত হইলে, সাতিশয় স্থূলধারায় জলবর্ষণ হইতে লাগিল। নিক্ষিপ্যমাণ বজ্রসঙ্ঘাতের সাতিশয় চটচটা শব্দে কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দ্রুতগতি বাতবেগে সমীরিত জলধারা সকল করকাসমূহসহকারে চতুর্দ্দিক সমাবৃত করত নিরন্তর প্রপতিত হইতে লাগিল।'

কেউ বলবেন এ আর এমন কি ব্যাপার—পাহাড়ে এ রকম হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি হয়েই থাকে। তা হয়, কিন্তু তার তো পূর্ব প্রস্তুতি থাকবে। যুধিষ্ঠিররা গন্ধমাদনে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে আকস্মিক কালবৈশাখী আরম্ভ হল তা স্বাভাবিক ঝড়বৃষ্টি বলে মনে হয় না। দেবতারা হয়তো কৃত্রিম ঝড়বৃষ্টি সৃষ্টি করেছিলেন। এ পাহাড়ে বহিরাগত কেউ ঢুকলে তাকে এভাবেই বাধা দেওয়া হত।

যাই হোক, পাণ্ডবরা বদরীকাশ্রমে এসে বাস করতে লাগলেন। একদিন 'সূর্য্যসম-সমুজ্জ্বল সহস্রদল একটি পদ্মপুষ্প পূর্ব্বোত্তরদিক হইতে পবমান পবন কর্ত্তৃক আনীত হইয়া তথায় পতিত হইল। ঐ পবনানীত ভূতলপতিত পদ্মটি পবিত্র, দিব্যগন্ধান্বিত ও মনোহর ছিল; কল্যাণী পাঞ্চালী সহসা তাহা দেখিতে পাইলেন।'

অত উঁচু পাহাড়ে পদ্মফুল? হ্যাঁ, এর নাম ব্রহ্মকমল। কেদার, বদরীর পাহাড়ের বরফ গলতে শুরু করলে আগস্ট মাস নাগাদ এই ব্রহ্মকমল পাহাড়ের গায়ে ফোটে।

দ্রৌপদীর ফুলটি খুব পছন্দ হল। তিনি ভীমসেনকে বললেন এই রকম ফুল যোগাড় করে নিয়ে এসো, আমরা কাম্যকবনে নিয়ে যাব। ভীম ফুল খুঁজতে খুঁজতে 'গন্ধমাদন সানুতে বহুযোজন-বিস্তৃত সুরম্য কদলীবন দেখিতে পাইলেন।' তারপর এক সরোবর দেখে তাতে স্নান সেরে কলাবন ভেঙে তছনছ করতে লাগলেন। হনূমান শব্দ শুনে বুঝতে পারলেন যে তাঁর ভাই ভীম এখানে এসেছেন (দুজনে যে বায়ুপুত্র)। তাই ভীম যাতে অজান্তে স্বর্গপথে ঢুকে পড়ে দেবতাদের অভিশাপগ্রস্ত না হন সেইজন্য হনূমান 'স্বর্গগমনের একমাত্র তত্রত্য পথ অবরোধ করিলেন।' তারপর ভীমকে বললেন 'হে বীর! ইহার পর এই পর্ব্বত অগম্য এবং ইহাতে আরোহণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এস্থলে সিদ্ধি ব্যতীত গমনের উপায় নাই। ইহা দেবলোকের পথ, এই পথে মনুষ্যদিগের কখনই গমন করিতে সাধ্য হয় না। *** যদি হিতকর মদীয় বাক্য গ্রাহ্য হয়, তবে এই সকল অমৃতকল্প ফলমূল ভক্ষণ করিয়া এখান হইতে নিবৃত্ত হও, বৃথা বিনাশপ্রাপ্ত হইও না।'

সুগ্রীব এই স্থানের কথাই বলেছিলেন। হনুমানও ভাইয়ের প্রতি স্নেহবশত ভীমসেনকে দেবতাদের সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন। বিনানুমতিতে এখানে ঢুকলে যে বিনাশপ্রাপ্ত হতে হয় সে-কথা হনুমান স্পষ্ট করেই বলেছেন।

এখান থেকেই অর্জুনকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অর্জুন এখানেই ফিরে আসবেন তাই যুধিষ্ঠিররা তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছেন এই গ্রহান্তর-স্টেশনে। লোকে যেমন বিমান ঘাঁটিতে গিয়ে প্রবাসী আত্মীয়কে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে।

যাই হোক, একদিন যখন 'যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথেরা অর্জ্জুনকে চিন্তা করিতেছেন, এমত কোন সময়ে অশ্বসংযুক্ত বিদ্যুৎসম সমুজ্জ্বল ইন্দ্ররথ সহসা সমীপগত দেখিয়া তাঁহাদিগের হর্ষোদয় হইল। মাতলি-সংগৃহীত সেই দীপ্যমান ইন্দ্র-বিমান হঠাৎ অন্তরীক্ষে প্রকাশ করত মেঘান্তরস্থ মহোল্কার ন্যায় ও ধূমরহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় উদ্দীপিত হইল এবং নবাভরণ, মাল্য ও কিরীটিধারী ধনঞ্জয় তাহাতে অধিরূঢ় দৃষ্ট হইলেন। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ও শ্রীদ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়া পর্ব্বতে উপনীত হইলেন।'

অর্থাৎ এই গ্রহান্তর-স্টেশনে এসেই নামল ইন্দ্ররথ। অর্জুন স্বর্গ-বাসের পর ফিরে এলেন দৈবী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ; কিন্তু তাঁর চেহারা 'ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ও শ্রীদ্বারা প্রজ্জ্বলিত।' অর্জুন মাতলিকে ইন্দ্র বলে ভুল করেছিলেন ; কিন্তু যুধিষ্ঠিররা অর্জুনকে চেনেন তাই তাঁকে 'ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ও শ্রীদ্বারা প্রজ্জ্বলিত' বলে মনে করেছেন। আসলে অর্জুনও ইন্দ্রের মতো 'স্পেস-স্যুট' পরে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন। আসল স্বর্গ বা অমরাবতী তাই মহাকাশের কোথাও—তা কখনই এ পৃথিবীতে নয়। এ পৃথিবীতে হিমালয়ে হচ্ছে দেবতাদের উপনিবেশ যা প্রায় দ্বিতীয় স্বর্গেরই মতো। তাই বার বার ঘুলিয়ে যায় হিমালয়ের দেবলোক আর মহাকাশের স্বর্গলোকের সঙ্গে।

আশা করি দেবতাদের গ্রহান্তর-স্টেশন কোথায় ছিল এখন আর বুঝতে বাধা নেই।

রামায়ণে কৃত্রিম উপগ্রহ!

সুকেশ মহাদেবের বরে 'আকাশগামী পুর' লাভ করেছিলেন। এই 'আকাশগামী পুর' খুব সম্ভব কোন কৃত্রিম উপগ্রহ। দেবতারা যখন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাতায়াত করতেন তখন তাদের পক্ষে কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করে কোন গ্রহের কক্ষপথে স্থাপন করা মোটেও অসম্ভব ছিল না।

রামায়ণের আদিকাণ্ডের বিশ্বামিত্র ঋষির গল্পটা এবার আলোচনা করে দেখা যাক। ঋষি বিশ্বামিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজা। এক সময় প্রচুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে এলেন। বশিষ্ঠ হোমধেনুর সাহায্যে রাজা বিশ্বামিত্রের সৈন্যসামন্ত সকলকে পেট ভরে খাওয়ালেন। হোমধেনুটির উপর বিশ্বামিত্রের খুব লোভ হল। তিনি ওটি বশিষ্ঠের কাছে চাইলেন, বশিষ্ঠ দিতে অস্বীকার করায় বিশ্বামিত্র জোর করে হোমধেনু শবলাকে নিয়ে চললেন। বশিষ্ঠের কথামত শবলা নিজের দেহ থেকে সৈন্যসামন্ত সৃষ্টি করে বিশ্বামিত্রের সৈন্যসামন্তদের লণ্ডভণ্ড করে দিল। বিশ্বামিত্রের ছেলেরা বশিষ্ঠকে আক্রমণ করতে গেলে বশিষ্ঠ তাদের ভস্ম করে ফেললেন। বিশ্বামিত্র বুঝতে পারলেন ক্ষত্রিয়ের বল থেকে ব্রাহ্মণের বল অনেক বেশী। তিনি তখন এক ছেলের উপর রাজ্যভার দিয়ে 'বনে গমনপূর্ব্বক কিন্নর ও সর্পগণ সেবিত হিমালয়ের পার্শ্বদেশে যাইয়া মহাদেবের প্রসাদার্থ সুমহৎ তপস্যাচরণ আরম্ভ করিলেন।'

এরপর মহাদেবের বরে অনেক অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে শরনিক্ষেপ করতে শুরু করে দিলেন। তপোবন প্রায় ঝলসে গেল। তখন বশিষ্ঠ ক্ষেপে গেলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের উদ্দেশ্যে আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়বেন ঠিক করলেন। কিন্তু আগ্নেয় অস্ত্রে বশিষ্ঠের কিছু হল না। তখন বিশ্বামিত্র বারুণ, ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষিক প্রভৃতি বহু অস্ত্র ছুড়লেন বশিষ্ঠকে উদ্দেশ্য করে; কিন্তু বশিষ্ঠ সমস্ত

অস্ত্র নিষ্ফল করলেন। এর পর বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়লেন ; কিন্তু বশিষ্ঠ তাও হজম করে ফেললেন। বিশ্বামিত্র বুঝলেন ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করলে হবে না। শুরু করলেন তিনি কঠিন তপস্যা।

ঠিক এই রকম সময় ইক্ষাকুবংশের রাজা ত্রিশঙ্কু ঠিক করলেন এমন একটি যজ্ঞ করতে হবে যার সাহায্যে সশরীরে দেবগণের পরম স্থান স্বর্গলোকে যাওয়া যায়। বশিষ্ঠ কুলগুরু। রাজা ত্রিশঙ্কু তাকে মনের কথা খুলে বললেন। বশিষ্ঠ বললেন, এ হবার নয়। তখন ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের ছেলেদের অনুরোধ জানালেন। ছেলেরা বললেন বাবা যখন আপত্তি করেছেন তখন এ হবার নয়, আমরা এ যজ্ঞ করতে পারব না। ত্রিশঙ্কু বললেন, আপনারা কেউ যদি এই যজ্ঞ না করেন তাহলে আমাকে অন্য গুরুর সন্ধান করতে হবে। এ কথা শুনে বশিষ্ঠের ছেলেরা ত্রিশঙ্কুকে চণ্ডাল হওয়ার অভিশাপ দিলেন। ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হলেন। মনের দুঃখে ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। বিশ্বামিত্র বললেন, তুমি পরম ধার্মিক এবং ইক্ষাকুবংশীয় নরপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। গুরুর অভিশাপ বশত তোমার যে চণ্ডাল রূপ হয়েছে আমি সেই রূপেই তোমাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাব। এই বলে বিশ্বামিত্র যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন। বহু দিন পরে যখন যজ্ঞ শেষ হল তখন বিশ্বামিত্র যজ্ঞীয়ভাগ গ্রহণের জন্য সমুদয় দেবগণকে আহ্বান করলেন। কিন্তু কোন দেবতাই সেই যজ্ঞের হবী নেবার জন্য এলেন না।

'তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র রোষসহকারে স্রুব উত্তোলন করিয়া ত্রিশঙ্কুকে এই কথা কহিলেন, নরেশ্বর! তুমি আমার তপস্যার বীর্য্য দেখ। এই আমি স্বীয় তেজে তোমাকে সশরীরে স্বর্গলোকে প্রেরণ করি! রাজন! তুমি মদীয়তেজে সশরীরে দুষ্প্রাপ্য স্বর্গধামে গমন কর! কাকুৎস্থ! বিশ্বামিত্র মুনি সেইরূপ বলিলে, নরপতি ত্রিশঙ্কু, সেই সকল মুনিদিগের সম্মুখে তখনই সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন।'

কিন্তু ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে ঢুকতে দিলেন না। ইন্দ্র বললেন, 'রে মূঢ় ত্রিশঙ্কো! স্বর্গে তোর স্থান নাই *** তুই অধোমস্তক হইয়া

ভূতলে পতিত হ। মহেন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিলে ত্রিশঙ্কু তপোধন বিশ্বামিত্র-উদ্দেশ্যে ত্রাণ করুন বলিতে বলিতে (নিশ্চয় বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে !) পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন। প্রজাপতিতুল্য তেজস্বী, ঋষিগণ-মধ্যবর্ত্তী, মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র, করুণস্বরে শব্দায়মান ত্রিশঙ্কুর তদ্বাক্য শ্রবণে অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে থাক থাক এই কথা বলিলেন। পরে তিনি ক্রোধ মূর্চ্ছিত হইয়া দ্বিতীয় সৃষ্টি করিতে উদযোগী হইয়া দক্ষিণদিক অবলম্বনপূর্ব্বক দক্ষিণমার্গস্থ অপর সপ্তর্ষি-মণ্ডল ও অপর সপ্তবিংশতি নক্ষত্রমালা সৃষ্টি করিলেন।'

বিশ্বামিত্র এত রেগে গিয়েছিলেন যে তিনি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ সৃষ্টি করার উপক্রম করলেন। এবার দেবতাদের টনক নড়ল। দেবতারা ছুটে এসে অনুনয় সহকারে বিশ্বামিত্রকে বললেন, 'মহাভাগ তপোধান! এই রাজা গুরুশাপে অভিশপ্ত হইয়াছে, সুতরাং এ ব্যক্তি সশরীরে স্বর্গে যাইবার অধিকারী নহে।'

বিশ্বামিত্র দেবতাদের কথা মন দিয়ে শুনে বললেন, 'সুরগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক! আমি এই ত্রিশঙ্কু ভূপতির সশরীরে স্বর্গারোহণ প্রতিজ্ঞ করিয়াছি, তাহা মিথ্যা হউক এরূপ ইচ্ছা করি না ; এই রাজা সশরীরে চিরকাল স্বর্গসুখভোগ করুন এবং যে পর্যন্ত সমস্ত লোক বর্তমান থাকিবে, তাবৎ আমার সৃষ্ট নক্ষত্রসকল ইহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করুক, আপনারা এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।'

দেবতারা একটি সর্ত-সাপেক্ষে বিশ্বামিত্রের সব কথা মেনে নিলেন। সর্তটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। সর্তটি নিয়ে এই অধ্যায়ের শেষে আলোচনা করা হয়েছে। রাজা ত্রিশঙ্কুর গল্পে একটি বিষয় পরিষ্কার। ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করলেও বিশ্বামিত্র তপস্যা বলে দেব-অনুগ্রহে দেবতাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিলেন, তা না হলে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাবার দায়িত্ব কখনই নিতে সাহস করতেন না। বশিষ্ঠেরও নিশ্চয় এ ক্ষমতা ছিল, কিন্তু যাকে তাকে স্বর্গে পাঠানো দেবতারা কখনই পছন্দ করতেন না। তাদের অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া কাউকে স্বর্গে পাঠানো রীতিমত গর্হিত

কাজ। তাছাড়া দেবতারাই প্রয়োজন বুঝলে বিমান পাঠিয়ে অনুমোদিত ব্যক্তিকে স্বর্গে নিয়ে যেতেন। এই সব কারণেই বশিষ্ঠ এই ঝামেলা ঘাড়ে নিতে চান নি। কিন্তু বিশ্বামিত্র তো তখনো ব্রাহ্মণত্ব পান নি, তাই মন্ত্রগুপ্তির রহস্যটা তার জানা ছিল না। ত্রিশঙ্কুর ব্যাপারটা তিনি হাতে নিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্রের হয়তো আরও একটি ধারণা হয়েছিল যে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাতে পারলে দেবতারা চমৎকৃত হয়ে তাকে হয়তো তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণত্ব দিয়ে দেবেন।

যাই হোক বিশ্বামিত্র নিশ্চয়ই যজ্ঞকালে ত্রিশঙ্কুর জন্য একটি মহাকাশযান তৈরি করে ফেলেছিলেন। কারণ দেবতারা যদি ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে না নিয়ে যান তাহলে মহাকাশযানে করেই ত্রিশঙ্কুকে তিনি স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। সশরীরে কাউকে স্বর্গে পাঠাতে হলে বিমান বা মহাকাশযান অবশ্য প্রয়োজনীয়—এটা তিনি জানতেন।

আরও একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে আসে, তা হচ্ছে বিশ্বামিত্র ইচ্ছে করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে চৌঁত্রিশটা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে দিলেন মহাকাশে। না, তা নয়। যে মানুষটিকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাবার ভার তিনি নিয়েছেন সেই মহারাজ ত্রিশঙ্কু আগে ছিলেন বশিষ্ঠের শিষ্য। সুতরাং কিছু ঝামেলা যে শেষ পর্যন্ত হতে পারে এ বিষয়ে বিশ্বামিত্র যথেষ্ট সজাগ ছিলেন—এবং ঝামেলা হলে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা যাতে বজায় রাখতে পারেন সে জন্য মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাবার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন তিনি। আর খুব সম্ভবত এ বিষয়ে তাকে সজাগ করে তুলেছিল বশিষ্ঠর ছেলেদের উপহাস। যজ্ঞ শুরু হওয়ার পূর্বের ঘটনা আলোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

যাই হোক, বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে যজ্ঞ করার বিষয়ে আশ্বস্ত করে শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা ঋত্বিক ও বশিষ্ঠনন্দনগণ প্রভৃতি সমস্ত বহুশ্রুত ঋষিদিগকে সুহৃৎ ও শিষ্যবর্গের সহিত আনয়ন কর।'

শিষ্যরা সকলকে নিমন্ত্রণ করে ফিরে এসে বিশ্বামিত্রকে জানালেন, "মুনিপুঙ্গব! আপনার আমন্ত্রণ পাইয়া সর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণেরাই আগমন

করিতেছেন ; কেবল মহোদয় নামক ঋষি ও বশিষ্ঠনন্দনরা আইসেন নাই।' বশিষ্ঠের ছেলেরা কেবল আসেন নি তাই নয়, তারা ত্রিশঙ্কুর উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'যাহার যাজক ক্ষত্রিয় বিশেষত যে স্বয়ং চণ্ডাল। তাহার যজ্ঞে দেবতা ও ঋষিগণ কি প্রকারে হবি ভোজন করিতে পারেন? মহাত্মা ব্রাহ্মণেরাই বা চণ্ডালান্ন ভোজন করিয়া কিরূপে স্বর্গে যাইবেন? তাঁহারা কি বিশ্বামিত্র কর্তৃক পালিত হইয়া স্বর্গে যাইবেন?' অর্থাৎ বিশ্বামিত্র সৃষ্ট স্বর্গে যাবেন?

কথাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বামিত্র সজাগ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যজ্ঞশেষে দেবতারা না-ও আসতে পারেন। তাহলে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাতে হলে মহাকাশযানের ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, চণ্ডাল বলে ত্রিশঙ্কুকে হয়তো স্বর্গে প্রবেশ করতে দেবেন না দেবরাজ। তাহলে প্রতিজ্ঞা রাখতে হলে কৃত্রিম উপগ্রহের (স্বর্গের) ব্যবস্থাও করে রাখতে হবে। বশিষ্ঠের ছেলেদের চ্যালেঞ্জ তিনি ভেবেচিন্তেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আগে থাকতেই অর্থাৎ যজ্ঞ চলাকালীনই সব অবস্থার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন। যজ্ঞ চলেছিল বহুকাল ধরে—তার অর্থই হচ্ছে এই সব ব্যবস্থা করতে বিশ্বামিত্রর বহু সময় লেগেছিল। তিনি আমন্ত্রিত সমস্ত মুনি ঋষিদের এই কাজে লাগিয়েছিলেন।

বিশ্বামিত্র সমবেত মুনি ঋষিদের নির্দেশ দিলেন, 'এই ত্রিশঙ্কু নামে বিশ্রুত, বদান্য, ধার্মিক ইক্ষাকুনন্দন, সশরীরে স্বর্গগমনেচ্ছায় আমার শরণাগত হইয়াছেন ; অতএব ইনি যে যজ্ঞদ্বারা সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন আপনারা আমার সহিত সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন।' বিশ্বামিত্রের কথা শুনে সেই সব ধার্মিক মহর্ষিরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, 'এই অগ্নিতুল্য গাধিনন্দন ভগবান বিশ্বামিত্র পরম কোপন স্বভাব, সুতরাং ইনি যাহা বলিলেন, নিঃসন্দেহক্রমে তাহা সম্যক অনুষ্ঠান করাই উচিৎ, যেহেতু না করিলে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকেও শাপ দিবেন—অতএব যজ্ঞ আরব্ধ করা যাউক—যে যজ্ঞদ্বারা বিশ্বামিত্রের তপোবলে এই ইক্ষাকুনন্দন সশরীরে স্বর্গে যাইতে

পারেন তাদৃশ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হউক, আমরা সকলে স্বস্ব ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করি। * * * তখন সেই ঋষিরা স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র সেই যজ্ঞের অধ্বর্য্যু হইলেন। মন্ত্রকোবিদ ঋত্বিকরা কল্পশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে—যথাবিধি সমুদয় কর্ম্ম আনুপূর্ব্বিকক্রমে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকালের পর মহাতপা বিশ্বামিত্র, যজ্ঞীয় ভাগ গ্রহণার্থ সমুদয় দেবগণকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন না।' (আদিপর্ব: ৫৯, ৬০ সর্গ)

এবারে দেবতাদের সর্তটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। দেবতাদের সর্তটি ছিল—'তোমার সৃষ্ট এই সকল নক্ষত্রেরা আকাশমণ্ডলে জ্যোতিশ্চক্রমার্গের বহির্দ্দেশে অবস্থিত করুক এবং ত্রিশঙ্কুও সেই সকল উজ্জ্বল নক্ষত্রদের মধ্যে দেবতার ন্যায় অবস্থিতি করুক।'

বিশ্বামিত্র দেবতাদের বলেছিলেন সমস্তলোক যত দিন থাকবে তার সৃষ্ট নক্ষত্ররাও যেন ততদিন টিকে থাকে। কৃত্রিম উপগ্রহ (নক্ষত্র!) যে স্বল্পায়ু তা বিশ্বামিত্র জানতেন—কিম্বা এও হতে পারে বিশ্বামিত্র দেবতাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছিলেন যে দেবতারা এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ধ্বংস করবেন না। দেবতারা সবই মেনে নিলেন কিন্তু জ্যোতিষীয় মানচিত্রের মধ্যে ঠাঁই দিলেন না বিশ্বামিত্র-সৃষ্ট কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে। দেবতাদের এই সর্ত মেনে নিলেন বিশ্বামিত্র। কারণ স্বল্পায়ু কৃত্রিম উপগ্রহ কখনই জ্যোতিষীয় মানচিত্রে ঠাঁই পেতে পারে না। এ কথা জানতেন বিশ্বামিত্র।

আজ পর্যন্ত আমরা হাজার দেড়েকেরও বেশী কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছি, যার মধ্যে ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্টও আছে, তাদের কি আমরা 'আকাশমণ্ডলের জ্যোতিশ্চক্রমার্গে' জায়গা দিয়েছি? না, তারা আকাশের জ্যোতিষীয় মানচিত্রের বাইরেই রয়ে গেছে। কৃত্রিম উপগ্রহকে কখনোই জ্যোতিষীয় মানচিত্রে স্থান দেওয়া হয় না। দেবতাদের অদ্ভুত সর্তই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যে বিশ্বামিত্র মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছিলেন।

হনুমান কি টেলিস্কোপিক রকেট ?

হনুমান, সুগ্রীব, বালী, নল ইত্যাদিরা সাধারণ বানর ছিলেন না। অতি সতর্কতার সঙ্গে রামায়ণ পড়লে দেখা যায় দেবতাদের সৃষ্ট মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান বানর ছাড়া অন্য বানররা পশু ছাড়া আর কিছু নয়। তারা কেবল নেতার নির্দেশে যুদ্ধ করে এবং ভীত হলে 'কীলি কীলি' শব্দ করে পালিয়ে যায়। আদিকাণ্ডের ১৭ সর্গে আমরা দেখি, 'বিষ্ণু, মহাত্মা রাজা দশরথের পুত্রতা প্রাপ্ত হইলে ভগবান স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই কথা বলিলেন—তোমরা আমাদের সকলের হিতৈষী, বীর্য্যসম্পন্ন, সত্যসন্ধ বিষ্ণুর মহাবল-পরাক্রান্ত, ইচ্ছানুরূপ রূপধারণে সমর্থ, মায়াবিশারদ, শৌর্য্যসম্পন্ন, বায়ুবেগতুল্য শীঘ্রগামী, বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমশালী, নীতিজ্ঞ, দুরাধর্ষণীয়, উপায়াভিজ্ঞ, দিব্যশরীর সম্পন্ন ও অমরের ন্যায় সমস্ত অস্ত্র নিবারণে সক্ষম, সহায় সকল সৃজন কর।*** আমি পূর্ব্বেই জাম্ববান নামে ঋক্ষবরকে সৃজন করিয়াছি।'

বিষয়টি ভালো ভাবে ব্যাখ্যা করে দেখা যাক—ব্রহ্মা দেবতাদের কি তৈরি করতে বলেছিলেন :

রাক্ষস রাবণ পৃথিবীতে মহাশক্তিশালী ও ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছেন। দেবতা, যক্ষ, নাগ সবার উপর আধিপত্য চালাচ্ছেন তিনি। দেবতারা লেমুরিয়া থেকে হিমালয়ে চলে এসেছেন। সেখানে শক্তিবৃদ্ধি ও নিজেদের গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। গ্রহান্তর-স্টেশন বসানো হয়েছে। নিজেদের গ্রহে খবর পাঠানো হয়েছে। যক্ষ, নাগ, ইত্যাদিরা দেবতাদের দলে যোগ দিয়ে হিমালয়ে চলে এসেছেন। এই অবস্থায় দেবতাদের নিজেদের গ্রহে রাবণকে কি করে ধ্বংস করা হবে সে সম্বন্ধে একটি গুপ্ত-মন্ত্রণা হল। প্রথমতঃ, বিষ্ণু রাজা দশরথের 'পুত্রতা প্রাপ্ত' হবেন। রাম দশরথের ঔরসজাত সন্তান নন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ থেকে রামের জন্ম হয়। সেখানে আবার দেবতারা কি ভেল্কী দেখিয়েছিলেন কে জানে। যাই হোক, নেতাকে না হয় পাঠানো হল পৃথিবীতে; কিন্তু একা নেতা তো শক্তিশালী রাবণকে খতম

করতে পারবেন না। সুতরাং তার কিছু সহায় দরকার। সেই সহায়রা কি রকম হবে তার বর্ণনা দিলেন ব্রহ্মা। এই বর্ণনা বা Specification দেখেই সন্দেহ হচ্ছে যে ব্রহ্মা হয়তো দেবতাদের রোবট বা যন্ত্রমানব তৈরি করতে বলেছিলেন। ব্রহ্মা আগেই এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে জাম্ববানকে তৈরি করেছেন (এর আগেও যে দেবতারা রোবট তৈরি করেছেন—সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে)।

রোবটদের চেহারা সম্বন্ধে ব্রহ্মা দেবতাদের আরও একটি ইঙ্গিত দিলেন। ব্রহ্মা বললেন, 'তোমরা বানররূপী হইয়া মুখ্য মুখ্য অপ্সরা, গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, পন্নগী, ভল্লুকী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীতে স্বতুল্য পরাক্রমসম্পন্ন পুত্রনিচয় উৎপন্ন কর।'

অর্থাৎ তোমরা বানররূপী হয়ে বানরীতে নিজেদের মতো পরাক্রম-সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন কর। সরলার্থ হচ্ছে রোবটদের চেহারা যেন বানরদের মতো হয়। কিন্তু কেন? কারণ সারা দক্ষিণ ভারত, লেমুরিয়া বা পৃথিবীতে তখন বানরদের আধিপত্য। বাইবেলেও এই রকম একটি ইঙ্গিত রয়েছে:

'There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown; (Genesis 6:4) ব্রহ্মার কথারই প্রতিধ্বনি যেন।

যাই হোক, তাতে লাভটা কি হবে? নেতা রামকে সাহায্য করার জন্য কি দেবতারা কোটি কোটি সাধারণ সৈন্য পাঠাবেন পৃথিবীতে? না, তা সম্ভব নয়। কারণ তাতে সময় লাগবে প্রচুর, তাছাড়া এ রকম কোটি কোটি সৈন্য নামানোর কথা কি আর রাবণের কানে উঠবে না? সুতরাং কাজ সারতে হবে অত্যন্ত গোপনে, তারপর আকাঙ্খিত সময় এলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বানর-রূপী এই সব

রোবটরা ভারতে গিয়ে কোটি কোটি বানরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজের উপযোগী করে নিলেই কাজ অনেক সহজ হবে।

'ভগবান ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই কথা কহিলে তাঁহারা সেই আজ্ঞা অঙ্গীকারপূর্ব্বক বানররূপী পুত্রসকল উৎপন্ন করিলেন।'

ইন্দ্র সৃষ্টি করলেন বালীকে। সূর্য সৃষ্টি করলেন সুগ্রীবকে। বৃহস্পতি সৃষ্টি করলেন তারকে। কুবের সৃষ্টি করলেন গন্ধমাদনকে। বিশ্বকর্মা সৃষ্টি করলেন নলকে। অগ্নি সৃষ্টি করলেন নীলকে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সৃষ্টি করলেন মৈন্দ্য ও দ্বিবিদকে। বরুণ সৃষ্টি করলেন সুষেণকে। পর্জ্জন্য সৃষ্টি করলেন শরভকে। এবং বায়ু সৃষ্টি করলেন হনূমানকে।

বানররূপী এই সব মহাভয়ঙ্কর রোবট তৈরি হওয়ার পর এক ঋক্ষরাজকে বালী ও সুগ্রীবের বাবা সাজানো হল। ব্রহ্মা একদূতকে আদেশ করলেন, 'দূত! আমার কথামত কিষ্কিন্ধ্যায় যাও। সেই নগর বিশাল, গুণশালী এবং ইহার পক্ষে শুভদায়ক; যেহেতু তথায় বহুসংখ্যক বানর দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। * * * সে স্থানে গিয়া অন্যান্য সাধারণ বানরগণসহ দলপতিদিগকে আহ্বান করিয়া, পুত্রসহ বানরপ্রধান ঋক্ষরাজকে দেখিয়া তাহাদিগকে আমার আদেশ জানাইবে। পরে জনসমাজে ইহাকে উৎকৃষ্ট আসনে বসাইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিবে। ধীমান বানরগণ দেখিবামাত্র সকলে এই ঋক্ষরাজের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিবে।' (উত্তরকাণ্ড, ৪২ সর্গ)

ব্যাস, সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

বানরদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন হনূমান। এবার সেই হনূমানকে নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। বিষ্ণুর বাহন বা মহাকাশযান গরুড়ের কথা মনে রেখে তৈরি হল রামের বাহন হনূমানকে। বহুবার হনূমানকে গরুড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—আলোচনা প্রসঙ্গেই তা দেখতে পাওয়া যাবে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৩য় সর্গে দেখি রাম লক্ষ্মণ পম্পানদীতীরে এসেছেন। সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সীতা উদ্ধার করতে হবে।

রাম লক্ষ্মণকে দেখতে পেয়ে হনুমান সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে খোঁজ খবর নিতে গেলেন। তিনি রাম লক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন— তাদের স্তুতি করলেন, নিজের পরিচয়ও দিলেন।

হনুমানের দৌত্যেই রামের সঙ্গে সুগ্রীবের যোগাযোগ ঘটল।

জটায়ুর দাদা সম্পাতির কাছে রাবণের খবর পাওয়ার পর অঙ্গদ অধীনস্থ বানরদের বললেন সাগর পার হওয়ার ব্যাপারে আপনাদের যার যা ক্ষমতা তা বলুন। গন্ধমাদন বললেনঃ আমি পঞ্চাশ যোজন লাফ দিতে পারি। মৈন্দ্য বললেন, আমি যেতে পারি ষাট যোজন। দ্বিবিদ বললেনঃ আমি সত্তর যোজন যেতে পারি। সুষেণ বললেনঃ আশী যোজন। জাম্ববান বললেনঃ আগে আমার যথেষ্ট শক্তি ছিল; কিন্তু এখন বুড়ো হয়েছি তবু এখনো নব্বই যোজন যেতে পারি। অঙ্গদ বললেন: আমি একশো যোজন লাফ দিয়ে ওপারে যেতে পারি, কিন্তু ফিরে আসতে পারব কি না বলতে পারি না।

সুগ্রীব সীতার খোঁজে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চতুর্দিকে বানরদের পাঠালেন এবং প্রত্যেক দিকের পথের বিশদ বিবরণ দিলেন। এ বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর। রাম খুব অবাক হয়ে সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি 'সমস্ত ভূমণ্ডলের' কথা জানলে কি করে? সুগ্রীব বললেন, 'বালী আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, আমি বহু নদী, বন, অরণ্য এবং নগরসকল দেখিয়া প্রাণভয়ে নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। এই সসাগরা বসুন্ধরা গোষ্পদবৎ আমার ভ্রমণকালে অলাতচক্র ও আদর্শতলের ন্যায়, আমার নয়নগোচর হইয়াছিল।'

সুগ্রীব যে রকম বিশদ ভাবে এক একটি দিকের বিবরণ দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই জরীপের কাজ করেছিলেন। সুগ্রীবের আসল কাজ ছিল রাম আসার পূর্বে সমগ্র অঞ্চলটি ভালো ভাবে জরীপ করে রাখা। যুদ্ধ-নীতিতে এটি একটি জরুরী কাজ। প্রাণভয়ে ভীত কারো পক্ষে সব কিছু এত বিশদ ভাবে লক্ষ্য করা এবং তা মনে করে রাখা কখনই সম্ভব নয়। সম্পাতির কাছ থেকে রাবণের বাসস্থানের খবর জানবার আগেই

হনুমান, অঙ্গদকে সুগ্রীব রাবণের বাসস্থানের কথা জানিয়েছিলেন। দেবতাদের আসল উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়েও বলতে পারেন নি মহাকবি। তাঁকে দু'দিক রক্ষা করতে গিয়ে বহু গালগল্প করতে হয়েছে। তবে 'ব্যাস-কূটের' মতো 'বাল্মীকি-কূট'ও যে রামায়ণে ছড়িয়ে রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়।

সুগ্রীব এই জরীপের কাজ যে আকাশ পথেই করেছিলেন তা তো সুগ্রীবের কথাতেই পরিষ্কার। সুগ্রীবের ভ্রমণকালে সসাগরা বসুন্ধরা 'গোষ্পদ' অর্থাৎ খুব ছোট 'অলাত-চক্র' বা জ্বলন্ত-অঙ্গার চক্রের মতো মনে হয়েছিল। মাটিতে ঘুরে ঘুরে জরিপ করলে সুগ্রীব পৃথিবীকে কখনই গোষ্পদের মতো দেখতে পেতেন না।

এবার হনুমানের কথায় আসা যাক।

সাগর লঙ্ঘনের ব্যাপারে বানরেরা নিজ নিজ শক্তির কথা প্রকাশ করলেন কিন্তু একমাত্র হনুমানই কোন কথা প্রকাশ করলেন না। তিনি চুপচাপ বসে রইলেন—তখন জাম্ববান হনুমানকে বললেন, 'সর্বশাস্ত্রজ্ঞ! বানরগণের মধ্যে তুমিই প্রধান বীর, সুতরাং মৌনভাব অবলম্বনপূর্ব্বক একাকী বসিয়া আছ কেন? হনূমান তুমি বলে এবং বিক্রমে বানররাজ সুগ্রীবের সমকক্ষ এবং রাম, লক্ষ্মণ, হইতেও নিকৃষ্ট নও। অরিষ্টনেমির তনয় মহাবল বৈনতেয় গরুড় যেমন পক্ষিজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ তুমিও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং বিখ্যাত।' জাম্ববান আরো বললেন, 'বানরবর হনুমান! তুমি উঠ এই মহাসমুদ্র অতিক্রম কর, তোমার সমুদ্রপারে গমন নিশ্চয়ই সর্বপ্রাণীরই কল্যাণকর হইবে। মহাবেগশালী হনূমান! বানর সকল বিষণ্নমুখে অবস্থিতি করিতেছে দেখিয়াও কেন উপেক্ষা করিতেছ? ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর ন্যায় তুমিও পরাক্রম প্রকাশ কর।'

বানররূপী রোবটদের মধ্যে হনুমানকেই যে সর্বশ্রেষ্ঠ করে তৈরি করা হয়েছে সে কথা জাম্ববানকে আগেই জানিয়েছিলেন দেবতারা। এই শক্তিমান রোবটের বিরাট একটি ভূমিকা রয়েছে রাম-রাবণের যুদ্ধে। ঠিক সময়ে হনুমান যেন তার পূর্ণ-শক্তি পান সেইজন্য সেই বিশেষ সময়ে তাকে সজাগ করে দিতে হবে। আগে থেকে তাকে

পূর্ণ-শক্তি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালে হনুমান সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যা দেবতারা একেবারেই চান না। জাম্ববানকে সেই ভাবে তারা নির্দেশ দিয়ে রাখলেন অর্থাৎ Programming* করে রাখলেন যাতে উপযুক্ত সময়ে হনুমান পূর্ণ-শক্তি পায়। সেই উপযুক্ত সময়ে তাই জাম্ববান চুপচাপ বসে থাকা হনুমানকে সজাগ করে তুললেন স্তবরূপী প্রোগ্রামিং-এর সাহায্যে।

এরপরে কি ঘটল দেখুন। 'পবনতনয় কপি প্রধান হনূমান, বানরসত্তম জাম্ববানকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং নিজ বল অবগত হইয়া বানর সৈন্যগণকে আনন্দিত করত সেইরূপ আকৃতি ধারণ করিলেন। বানরগণ, মহাবলশালী বানরোত্তম হনূমানকে শতযোজন লঙ্ঘনার্থ হঠাৎ বর্দ্ধিত এবং মহাবেগবান হইতে দেখিয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে আনন্দধ্বনি করত হনূমানের সুখ্যাতি করিতে লাগিল।'

আরো দেখুন: 'মহাকায় হনূমান সর্ব্বদা স্তুত হইয়া বর্দ্ধিত এবং হর্ষাবেশে লাঙ্গুল আস্ফালন করত অত্যাধিক বলশালী হইলেন। বৃদ্ধ বানরপ্রধানগণ (বৃদ্ধ বানরপ্রধানগণ কেন? কারণ তারাই যে আসল ব্যাপার জানতেন) তাঁহাকে স্তব করিতে থাকিলে, তেজে পরিপূর্ণ হওয়াতে তাঁহার অনুত্তম রূপ হইল।'

সেই রূপ ও শক্তির বর্ণনা কবি খুব সুন্দর ভাবেই দিয়েছেন। 'তৎকালে ধীমান পবনাত্মজ হনূমান বিস্তীর্ণ গিরিগহ্বর মৃগেন্দ্রের ন্যায় মুখ ব্যাদন করিতে থাকিলে তাঁহার মুখমণ্ডল সেই সময়ে যেন প্রদীপ্ত ভর্জ্জন পাত্রবৎ দেখাইল এবং তিনি নিজেও ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।'

কোন জীবিত প্রাণীর পক্ষে কি এ রকম রূপ ধারণ করা সম্ভব? সম্ভব তখনই যখন সব কিছু অলীক ঘটনাই দেবতাদের মহিমা বলে মেনে নেওয়া হয়। দেবতাদের মহিমার যুক্তিগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা আছে

* Programming হচ্ছে কোন কমপিউটারকে চালানোর নির্দেশলিপি। রোবট বা যন্ত্রমানবের ভিতরে থাকে একটি কমপিউটার বা যন্ত্রগণক। এরই নির্দেশে যন্ত্রমানব তার কাজকর্ম করে থাকে

কিনা তা যখন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তখন এই সব অলীক ঘটনা রূপ বদল করে খুব সাধারণ ভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

নিজের পূর্ণশক্তি জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হনুমান বললেন, 'যে অনলসম মহাবল পবনদেব পর্ব্বতাগ্র সকল বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, যিনি অমিতবলশালী এবং শূণ্যগামী আমি সেই প্রবলবেগ ত্বরিতগতি মহাত্মা বায়ুর ঔরসপুত্র; সুতরাং প্লবনেও তাঁহার ন্যায় আকাশস্পর্শী অতিবিস্তৃত সুমেরু পর্ব্বতকেও বিশ্রাম না করিয়া সহস্রবার লঙ্ঘন করিতে পারি। আমি বাহুবলে মহাসমুদ্রকে বিলোড়িত করত তদ্দ্বারা পর্ব্বত, নদী এবং হ্রদাদি সমন্বিত নিখিল ভুবন প্লাবিত করিতে পারি। বরুণালয় জলধি আমার জঙ্ঘাবেগে বেলাভূমি অতিক্রম করিবে এবং মহাগ্রাহ সকল তাহা হইতে উত্থিত হইবে।'

খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। টেলিস্কোপিক রোবট রকেট এখন তার পূর্ণশক্তি পেয়েছে সুতরাং সমুদ্রে সেই রকেটের ব্লাস্ট-অফ ঘটলে সমুদ্র ভয়ঙ্কর ভাবে আলোড়িত হতে বাধ্য।

হনূমান আরো বললেন, 'সর্পভুক বিহগরাজ বৈতনেয় গরুড় আকাশে উড়িলে তাহাকেও আমি সহস্রগুণ অতিক্রম করিতে পারি।'

গরুড় হচ্ছেন বিষ্ণুর বাহন—বা মহাকাশযান বা রকেট। গরুড় পুরোনো মডেল ('গরুড় রহস্য' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কিন্তু হনূমান নতুন মডেল। তাই হনূমানের এ কথা বলা মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

এরপর হনূমান বলছেন, 'আমি নভোগামী গ্রহসকলকেও অতিক্রম করিতে উৎসাহ করি।' এখনো সন্দেহ আছে কি?

হনূমানকে সৃষ্টি করার পর কি ঘটেছিল জাম্ববানের মুখ থেকে এবার তা শোনা যাক—

'মহাবাহু কপিবর! তোমার জননী, পবনদেবের ঐ কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে গুহায় প্রসব করিলেন। পরে তুমি সেই জাতমাত্র নিতান্ত শিশু অবস্থাতেই মহাবনে সূর্য্য উদয় হইতে দেখিয়া ফল মনে করত তাহা ধরিতে ইচ্ছা করিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক শূণ্যপথে উঠিয়াছিলে। কপিশ্রেষ্ঠ! ত্রিংশৎযোজন গমন করিয়া

তাঁহার তেজে নিক্ষিপ্ত হইয়াও কিছুমাত্র ক্লিষ্ট হইলে না। কিন্তু তৎকালে ইন্দ্র তোমাকে দ্রুত অন্তরীক্ষে ধাবিত হইতে দেখিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া বলপূর্ব্বক তোমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তোমার বামহনূ ভগ্ন হইয়া পর্ব্বতশিখরে পতিত হও তদবধি তুমি হনূমান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ।' জাম্ববান আরো বললেন, 'ব্রহ্মা তোমাকে এই বর দিলেন যে যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে তোমার মৃত্যু হইবে না। তখন সহস্রাক্ষ ইন্দ্র বজ্রপাতেও তোমার শরীর অক্ষত রহিল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজের ইচ্ছানুসারে তোমার মৃত্যু হইবে, এই শ্রেষ্ঠ বর তোমাকে দিয়াছিলেন।'

অর্থাৎ এক্সপেরিমেণ্ট শেষ হতে না হতেই হনূমান সাঁ করে প্রায় ২০০ কিলোমিটার আকাশ পাড়ি দিয়ে ফেললেন। ইন্দ্র বজ্রের সাহায্যে (না কি বেতার নির্দেশ ?) হনূমানকে থামালেন। এক্সপেরিমেণ্ট সফল হয়েছে কিন্তু আরো একটু কাজ বাকি। কোন অস্ত্রে (এমন কি ব্রহ্মাস্ত্রেও) এর যেন কোন ক্ষতি না হয়। ইন্দ্র বললেন ওকে এমন ভাবে প্রোগ্রামিং করে রাখতে হবে যাতে প্রয়োজন হলে ও নিজেই নিজেকে ধ্বংস করতে পারে। তাই ইচ্ছামৃত্যু বর।

হনূমানের শক্তির গোপনীয় তথ্যটি আড়াল করে রাখবার জন্য মহাকবি একটি স্থূল গল্পের অবতারণা করেছেন। উত্তরকাণ্ডে দেখি হনূমান মায়ের কাছে থাকার সময় ঋষিদের আশ্রমে খুব দৌরাত্ম্য শুরু করলেন, তখন অঙ্গিরা ও ভৃগুর বংশজাত ক্রুদ্ধ মুনিগণ হনূমানকে শাপ দিলেন—'বানর! তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছ, তুমি আমাদের শাপে বিমোহিত হইয়া দীর্ঘকাল তোমার সেই বল জানিতে পারিবে না, কিন্তু যখন তোমার কীর্ত্তি তোমাকে কেহ মনে করাইয়া দিবে, তখন তোমার বল বর্দ্ধিত হইবে।' শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কি অদ্ভুত চেষ্টা।

সুগ্রীব বুঝতে পেরেছিলেন যে সীতার খোঁজ একমাত্র হনূমানের পক্ষেই আনা সম্ভব হবে। তাই তিনি হনূমানকে উদ্দেশ্য করে

বলেছিলেন, 'মহাবল কপিবর! তোমার গতি, বেগ, বল এবং লঘুত্ব তোমার পিতা মহাতেজা পবনের সমান; তোমার ন্যায় তেজস্বী পৃথিবীমধ্যে কেহই নাই; সুতরাং যেরূপে সীতাকে পাওয়া যায়, তুমি তাহার উপায় স্থির কর।' (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪৪ সর্গ)

রাম সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে হনুমানই সীতার খোঁজ আনতে পারবেন। তাই তিনি হনুমানকেই নিজের নামাঙ্কিত অতি সুশোভন আংটিটি দিয়ে বললেন, 'কপিশ্রেষ্ঠ! সীতা এই অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞান দেখিয়া তুমি যে আমার নিকট হইতে উপস্থিত হইয়াছ ইহা জানিতে পারিয়া নিরুদ্বেগে তোমাকে দর্শন দিবেন।'

হনুমানের উপর এই যে আস্থা এ কি অকারণেই? না, তা নয়। সুগ্রীব, জাম্ববান, রাম—সবাই আসল কথা জানতেন।

যাই হোক, এবার হনুমান পূর্ণ শক্তি পেয়েছেন। শতযোজন সাগর লঙ্ঘন এখন তার কাছে কোন সমস্যাই না। কিন্তু ব্লাস্ট-অফটা হবে কোথা থেকে? হনুমানই সেই জায়গার সন্ধান দিলেন—'কপিগণ! আমি লম্ফ প্রদানে উদ্যত হইলে ইহলোকে কেহই আমার বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। ইহলোকে কেবল প্রস্তরময় মহেন্দ্র পর্ব্বতের এই শিখরসকল দৃঢ় এবং বৃহৎ; সুতরাং নানাতরুরাজিবিরাজিত ধাতুমণ্ডিত ইহার শিখর হইতে সবেগে উল্লম্ফন করিব।'

এরপর ব্লাস্ট-অফের দৃশ্য:

'সেই বৃহৎ মহেন্দ্র পর্ব্বত মহাত্মা বায়ুনন্দনের বাহুবলে নিপীড়িত হইয়া তখন যেন সিংহাক্রান্ত মত্ত মহামাতঙ্গের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল এবং তাহার প্রস্তরসমূহ বিক্ষিপ্ত, মাতঙ্গ এবং মৃগকুল বিত্রস্ত, বৃক্ষরাজি বিকম্পিত ও সলিলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিল। * * * মহাসর্পসকল বিবরে লুক্কাইত এবং শিখরনিচয়ের প্রস্তরসকল পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে সর্পসকল অর্দ্ধনিঃসৃত হইয়া ফণাবিস্তারপূর্ব্বক নিঃশ্বাস ফেলিতে থাকিলে ঐ পর্ব্বত যেন উচ্ছ্রিত পতাকাসমূহে শোভমান হইল, পথিকগণ ভয়ঙ্কর দুর্গম পথে সঙ্গিবিহীন হইয়া যেরূপ অবসন্ন হয়, ভয়চকিত ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় ঐ পর্ব্বতেরও সেইরূপ

অবসাদ লক্ষিত হইল। পরে পরবীরহা কপিবর মহানুভব মনস্বী বেগবান হনুমান গতিবেগ বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইয়া অবহিতচিত্তে মনে মনে লঙ্কা স্মরণ করিলেন।'

লঙ্কায় যাওয়ার সময় যা ঘটল, লঙ্কা থেকে ফিরে আসার সময়ে সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঃ

'তখন সেই পর্ব্বতোত্তম, (এবার অরিস্ট পর্বত) বানরের ভরে পীড়িত হইয়া ভূতবর্গের সহিত ঘোর শব্দ করিয়া পৃথিবীতলে প্রবেশ করিল। তাহার শিখরসকল কম্পিত হইতে লাগিল এবং বৃক্ষসকল পতিত হইতে লাগিল। পুষ্পশোভিত বৃক্ষশ্রেণী তাহার গুরুতর বেগে মথিত ও ভগ্ন হইয়া বজ্রাহতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অতীব তেজস্বী সিংহসকল পীড়িত হইয়া গুহামধ্যে গর্জ্জন করিল। সেই ঘোরতর রব আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া লোকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। * * * অতীব দীর্ঘ, দীপ্তজিহ্ব বলবান মহাবিষ বৃহৎ বৃহৎ সর্পসকল মস্তক এবং গ্রীবাদেশ নিপীড়িত হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইল। * * * বৃক্ষ এবং শিখরে অতীব উন্নত শ্রীমান সেই ভূধর সেই বলবানের ভরে নিপীড়িত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। (সুন্দরকাণ্ড, ৫৬ সর্গ)

একটি বানরের লাফে কি এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে? তা সে বানর যতই শক্তিশালী হোক না কেন। এ তো রকেট ব্লাস্ট-অফের দৃশ্য। আধুনিক রকেট ছোড়ার দৃশ্যটি এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক।

'Five, Four, Three, Two, One, Ignition! Main Engine! Launch!

'The rocket's fuel suddenly begins to burn in a giant flash of colour. Loud thunder roars as the shining rocket attempts to move up toward the sky. It hesitates an instant, surrounded by white smoke, but as more fuel is burned, its speed increases. The engine of the second part of the rocket is ignited and the rocket rises faster and faster. When the final engine is finished burning, the spacecraft is in the orbit.'

ইন্দ্রজিতের বাণে রাম লক্ষ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হলেন। তখন জাম্ববান হনুমানকে বললেন হিমালয়ে গিয়ে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানকরণী এই ওষুধ চারটে নিয়ে এসো। জাম্ববানের —'এই কথা শুনিয়া বায়ুতনয় হনুমান বায়ুবেগে পুরিত মহাসাগরের ন্যায় বলোদ্রেকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।'

লঙ্কায় যাওয়া-আসার সময়ে যা ঘটেছিল এখনও ঠিক তদ্রূপ ঘটনা ঘটল। হিমালয়ে যাওয়ার জন্য হনুমান ত্রিকূট শিখরে উঠলেন।—'হনুমানের বেগে পীড়িত সেই ভূধরের বৃক্ষসকল ভূতলে পতিত ও পরস্পর সঙ্ঘর্ষণজন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল এবং শৃঙ্গসকল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। * * * পরে ভীমপরাক্রম প্রচণ্ডবেগশালী শত্রুদমন হনুমান রামচন্দ্রকে নমস্কারপূর্ব্বক বড়বা-মুখতুল্য মুখমণ্ডল বিস্তারিত করত আকাশে উঠিলেন। সেই সময়ে সেই বীরের উৎপতনবেগে সেই পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ এবং প্রস্তরাদিও তাঁহার সহিত শূন্যমার্গে উঠিল এবং তদীয় বাহু ও উরুদ্বয়ের বেগে সেই বৃক্ষাদি কিয়ৎক্ষণ সঞ্চালিত হইয়া ক্রমে বেগক্ষয়বশতঃ সমুদ্রের জলে পড়িল।' (লঙ্কাকাণ্ড, ৭৪ সর্গ)

এবার কিন্তু শত যোজন নয় সহস্র যোজন পথ। যাওয়া-আসা দুই সহস্র যোজন তাও আবার একরাত্রির মধ্যে। রকেট ছাড়া কোন প্রাণীর পক্ষে এ কাজ কি সম্ভব?

হনুমান যে সাধারণ বানর নন, তিনি দেবতাদের সৃষ্ট বিশেষ কোন যন্ত্র এটা বুদ্ধিমান রাবণও বুঝতে পেরেছিলেন। সুন্দরকাণ্ডের ৪৬ সর্গে আমরা রাবণকে বলতে শুনি:

'আমি তাহার কার্য্যসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাকে বানর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। প্রত্যুত তাহাকে সর্ব্বতোভাবে প্রবল বলসম্পন্ন কোন মহাপ্রাণী বলিয়াই বোধ করি। যেরূপ সংবাদ উপস্থিত, তাহাতে তাহাকে বনের বানর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। অতএব এ বানর—এইরূপ প্রত্যয় করিয়া আমার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইতেছে না। প্রত্যুত দেবেন্দ্র আমাদিগের দমনের নিমিত্ত

তপঃপ্রভাবে ইহাকে সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমি সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও মহর্ষিদিগকে পরাজয় করিয়াছি। বোধ করি, এখন আমাদের কিছু অপকার করিবার কাল তাহাদের উপস্থিত। সেইজন্যই এই বানররূপী প্রাণীর সৃষ্টি।'

হনূমান যে একটি সাধারণ বানর নয়—দেবতাদের সৃষ্ট একটি টেলিস্কোপিক রোবট রকেট—আর কি কোন সন্দেহ আছে?

আর একটি ছোট ঘটনা বলে এই অধ্যায়ের ইতি টানব।

সাগরের বন্ধনের জন্য রাম সাগরের স্তব করলেন। কিন্তু সাগর সাড়াশব্দ দিলেন না। তখন রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বাণাঘাতে সাগরকে ধ্বংস করতে উদ্যত হলে সাগর ভয় পেয়ে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'সৌম্য রঘুনন্দন! এই বিশ্বকর্ম্মা পুত্র নল, তাহার পিতার নিকট হইতে সর্ব্ববস্তু-নির্ম্মাণ-সামর্থ্য-রূপ বর পাইয়াছে; সুতরাং পিতার ন্যায় শক্তিশালী এই মহোৎসাহ বানর আমার উপরে সেতু প্রস্তুত করুক, আমি তাহা ধারণ করিব।'

সাগরের কথা শুনে নল উঠে দাঁড়িয়ে রামকে বললেন, 'মহারাজ! সমুদ্র যাহা বলিলেন, তাহা নিশ্চয় সত্য। আমি পিতার বরপ্রভাবে এই বিস্তীর্ণ মকরালয় সমুদ্রের উপর সেতু প্রস্তুত করিব। *** এক্ষণে সাগরের কথা শুনিয়া আমার স্মরণ হইতেছে, পূর্ব্বে মন্দর পর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মা আমার জননীকে এই বর দিয়াছিলেন যে, দেবি! তোমার পুত্র আমারই তুল্য হইবে। আমি সেই মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মার ঔরস-পুত্র এবং তাঁহার তুল্য নির্ম্মাণকুশল। * * * আমি নিশ্চয়ই সমুদ্রের উপর সেতু প্রস্তুত করিতে পারিব।' (লঙ্কাকাণ্ড ২২ সর্গ)

সাগরের কথাগুলো প্রোগ্রামিং হিসেবে কাজ করেছে, তাই নল আত্মশক্তির পূর্ণ পরিচয় পেয়েছেন। এবার তিনি সাগরের উপর সেতু তৈরি করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। এই সব রোবটগুলিকে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ করার জন্যই যে দেবতারা তৈরি করেছিলেন—তাতে এখনো সন্দেহ আছে কি?

মায়া-সীতা এবং তিলোত্তমা আসলে কি রোবট ?

রোবট বা যন্ত্রমানব তৈরিতে দেবতা ও রাক্ষসেরা যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন সে-কথা রামায়ণ, মহাভারত থেকেই আমরা দেখাতে পারি।

রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড ৮১ সর্গে দেখা যায় ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য ভাবে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ লঙ্কায় ফিরে গেলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও বানরসেনাদের মনোবল ভেঙে দেবার জন্য তিনি ঠিক করলেন এক মায়া-সীতা তৈরি করে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে এনে সবার সামনে টুকরো টুকরো করে কাটবেন। এই উদ্দেশ্য তিনি 'নিজ রথে একটি মায়াময় সীতা স্থাপন করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে বধ করিতে মনন করিলেন।' হনুমান একটি পাহাড়ের চূড়া ভেঙে নিয়ে ইন্দ্রজিতের দিকে ছুটে গিয়ে দেখলেন, 'সতত উপবাস বশতঃ যাঁহার মুখমণ্ডল কৃশ হইয়াছে, সেই মলিনবসনা একবেণী-ধারিণী ধূলিধূসরিতা মলিনগাত্রী রমণীরত্ন রামপ্রণয়িণী দীনভাবেও দুঃখিতচিত্তে ইন্দ্রজিতের রথে অবস্থান করিতেছেন। * * * দীনভাবাপন্ন মলিনগাত্রী জানকীকে রথ মধ্যে দেখিয়া বায়ুতনয় যারপরনাই ব্যথিত হইলেন।'

এরপর হনূমান অন্যান্য বানরবীরদের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের দিকে ছুটে গেলেন। 'বানরসৈন্য দেখিয়া রাবণতনয় রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে আকুল হইয়া তরবারী নিষ্কাশিত করিলেন এবং বানরগণের সম্মুখেই রথমধ্যে 'রাম রাম' রবে উচ্চৈস্বরে বিলাপকারিণী সেই মায়া নির্ম্মিতা সীতার কেশদাম ধরিয়া পীড়ন করিতে লাগিলেন।' হনূমান রেগে গিয়ে ইন্দ্রজিৎকে গালাগালি দিতে লাগলেন। ইন্দ্রজিৎও হনূমানকে গালাগালি দিয়ে বললেন, 'আমি এই রামমহিষী জানকীকে বধ করিব। ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিয়াই তীক্ষ্ণধার তরবারি দ্বারা সেই রোরুদ্যমানা মায়াময় সীতাকে আঘাত করত যজ্ঞোপবীতবৎ কাটিলেন।'

এই মায়া-সীতা সীতার নিখুঁত প্রতিমূর্তি। মায়া-সীতা অচল পুতুলমাত্র নয়—সে রথের মধ্যে 'রাম রাম' বলে চিৎকার করছে। ইন্দ্রজিৎ চুল ধরে কাটতে গেলে ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করছে। দেখতে

সে হুবহু সীতার মতো এবং অভিব্যক্তিও তার জীবন্ত সীতার মতো। এই জীবন্ত পুতুলটি কি আসলে একটি যন্ত্রমানবী? এ রকম হুবহু মানুষের মতো দেখতে মানুষের মতো অভিব্যক্তি সম্পন্ন যন্ত্রমানব বা যন্ত্রমানবী তৈরি সম্ভব কি?

Alvin Toffler-এর 'Future Shock' থেকে উদ্ধৃতি দিই—

'Technicians at Disneyland have created extremely life-like computer controlled humanoids capable of moving their arms and legs, grimacing, smiling, glowering, simulating fear, joy and a wide range of other emotions. Built of clear plastic that, according, to one reporter, does everything but bleed.'

মহাভারতের আদিপর্বে সুন্দ-উপসুন্দের গল্পটাও খুব কৌতূহলোদ্দীপক। মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে এক তেজস্বী দৈত্যের জন্ম হয়। এই নিকুম্ভের ভীমপরাক্রম দুই পুত্র হয়—নাম তাদের সুন্দ ও উপসুন্দ। দুই ভাইয়ে দারুণ ভাব—'তাহারা উভয়ে নিরন্তর এক বিষয়ে সম্মত, একনিশ্চয় ও এককার্য্য হইয়া সমান সুখ-দুঃখে কালযাপন করিত। তাহাদের দুই ভ্রাতার প্রকৃতি ও আচরণ অভিন্ন হওয়াতে বোধ হইত, যেন এক ব্যক্তিই দ্বিধাকৃত হইয়াছে।'

বড় হয়ে দুই ভাই বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে দারুণ তপস্যা শুরু করল। দেবতারা নানাভাবে তাদের তপস্যার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগলেন; কিন্তু সুন্দ-উপসুন্দের তপস্যা ভাঙতে পারলেন না। অবশেষে ব্রহ্মা এসে বর দিতে চাইলেন। সুন্দ-উপসুন্দ অমর হওয়ার বর চাইলে ব্রহ্মা বললেন অমর হওয়ার বর দিতে পারব না তার বদলে অন্য কোন বর চাও। তখন দু'ভাই বলল, 'হে পিতামহ! আমাদিগের পরস্পর ব্যতীত এই ত্রিলোকস্থিত স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি কোন বস্তু হইতে যেন আমাদিগের মৃত্যুভয় না থাকে।' ব্রহ্মা বললেন, 'তথাস্তু'। বর পেয়ে দুই ভাই দেবলোকে গিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করল। দেবতারা ব্রহ্মার বরের কথা জানতেন, তাই তারা দেবলোক ছেড়ে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন এবং ব্রহ্মাকে দুই ভাইয়ের কথা জানালেন। তখন ব্রহ্মা একটু ভেবে দেবশিল্পী

বিশ্বকর্মাকে ডেকে বললেন, 'সকলের প্রার্থনীয়া মনোহর এক প্রমদা নির্ম্মাণ কর।'

তখন বিশ্বকর্মা, 'ত্রিলোকমধ্যে দর্শনীয় পরম রমনীয় যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম পদার্থ আছে, তৎসমুদয় আহরণপূর্ব্বক দেবরূপিনী এক কামিনী সৃজন করিয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় গাত্রে কোটি কোটি রত্নে অলঙ্কৃত করত তাহাকে রত্ন-সঙ্ঘাতময়ী নির্ম্মাণ করিল।* * * মূৰ্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় কামরূপিনী সেই সীমন্তিনী প্রাণিমাত্রেরই নয়নমনের অপহারিণী হইল। বিশ্বকর্ম্মা তিল তিল করিয়া সমস্ত রত্ন সংগ্রহপূর্ব্বক সেই ললনাকে সৃজন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত পিতামহ তাহার নাম তিলোত্তমা রাখিলেন।'

অর্থাৎ ব্রহ্মার নির্দেশমত বিশ্বকর্মা একটি কৃত্রিম সুন্দরী নারীমূর্তি তৈরি করলেন। এ রকম একটি অপরূপা নারীকে সাজাবার জন্য রত্ন ছাড়া আরও অন্যান্য বহু কিছু লাগা উচিৎ ছিল। সে সম্বন্ধে ব্যাসদেব সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। কিন্তু তিলোত্তমাকে সাজাবার জন্য দু'দশখানা রত্ন নয় কোটি কোটি রত্ন লাগার কথা তিনি বেশ বিশদ ভাবে বললেন। তিলোত্তমাকে রত্ন-সংঘাতময়ীরূপে তৈরি করা হল। তিলোত্তমার সঙ্গে রত্নের যে নিবিড় সংযোগ রয়েছে এ কথা ব্যাসদেব প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিলেন। (সংঘাত কথার অর্থ নিবিড় সংযোগ—চলন্তিকা)। বিশ্বকর্মা তিল তিল করে সমস্ত রত্ন সংগ্রহ করে তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেছিলেন। এত রত্নের ছড়াছড়ি কেন?

কিছু রহস্য আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে কি? ঠিক তাই—এখানে রত্ন বলতে মণিমুক্তো বোঝানো হয় নি। এখানে রত্ন হচ্ছে স্ফটিক (quartz) বা semi-conductor। আরো সোজা কথায় যাদের বলা হয় ট্রানজিস্টার—এ রত্ন হচ্ছে তাই। যন্ত্রমানবী অর্থাৎ Computer Controlled Humanoid তৈরির জন্য কোটি কোটি মণিমুক্তো লাগে না—লাগে কোটি কোটি ট্রানজিস্টার। আরও প্রমাণ লাগবে?

ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে ডেকে প্রমদা তৈরি করতে বললেন, কিন্তু কি কাজে প্রমদাকে ব্যবহার করা হবে তা বললেন না। বিশ্বকর্মাও

ব্রহ্মাকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করা উচিৎ হবে না ভেবেই কিছু জিজ্ঞাসা না করে পিতামহের নির্দেশমত প্রমদা তিলোত্তমাকে তৈরি করলেন। তারপর তিলোত্তমাকে এমন ভাবে প্রোগ্রামিং করে দিলেন যাতে সে নিজেই তার কর্তব্য সম্বন্ধে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে বললে সেই কথাগুলো যাতে প্রোগ্রামিং-এর কাজ করে সে ব্যবস্থাও করে রাখলেন বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মার ধারণামতই ঘটল ব্যাপারটা। তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করার পর 'তিলোত্তমা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে ভূতেশ। আমাকে কি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, আমি কি নিমিত্ত সম্প্রতি নির্ম্মিতা হইয়াছি, আজ্ঞা করুন। পিতামহ কহিলেন, তিলোত্তমে। তুমি সুন্দ ও উপসুন্দ, দুই অসুরের নিকট গমন কর; তথায় যাইয়া তোমার কমনীয় রূপ দ্বারা তাহাদিগের প্রলোভ জন্মাইতে যত্নবতী হও। ভদ্রে! তাহারা তোমার রূপসম্পত্তি দর্শন করিয়া যাহাতে তোমার নিমিত্ত তাহাদিগের পরস্পর বিরোধ হয়, এমত চেষ্টা কর।' (মহাভারত আদিপর্ব, ২১০-২১৩ অধ্যায়)

রোবট তিলোত্তমার প্রোগ্রামিং সম্পূর্ণ হল।

Toffler থেকে আর একটু তুলে দিচ্ছি: 'There appears to be no reason, in principle, why we cannot go forward from these present primitive and trivial robots to build humanoid machines capable of extremely varied behaviour, capable even of 'human' error and seemingly random choice—in short, to make them behaviourally indistinguishable from human except by means of highly sophisticated or elaborate tests. At that point we shall face the novel sensation of trying to determine whether the smiling, assured humanoid behind the airline reservation counter is a pretty girl or a carefully wired (Programmed) robot. The likelihood, of course, is that she will be both.'

তিলোত্তমাকে দেখে সুন্দ-উপসুন্দ অবশ্য wired-robot ভাবে নি —কারণ ভাববার কোন সুযোগই তিলোত্তমা তাদের দেয় নি। সে এমন একটা সময় বেছে নিয়ে সুন্দ-উপসুন্দের সামনে হাজির হয়েছিল

যখন রোবট এবং আসল রক্ত-মাংসের মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা তাদের লোপ পেয়েছিল।

'একদা তাহারা কুসুমিত মহীরুহসমূহে সুশোভিত অবন্ধুর শিলাতলযুক্ত বিন্ধ্যাচলশিখরে বিহার করিবার নিমিত্ত গমন করিল। সেই স্থানে যথাভিলষিত সমুদয় দিব্য কাম্য বস্তু সমানীত হইলে স্ত্রীগণের সহিত প্রমুদিত হৃদয়ে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইল। রমণীগণ তাহাদিগের প্রীতির নিমিত্ত মনোরম নৃত্য, গীত ও স্তুতিসংযুক্ত সঙ্গীতদ্বারা তাহাদিগের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল। এমত সময়ে তিলোত্তমা একমাত্র রক্তবসন পরিধানপূর্ব্বক মনঃকল্পিত বেশবিন্যাস করিয়া সেই বনে উপনীত হইয়া পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল এবং নদীতীরজাত কর্ণিকার কুসুম চয়ন করিতে করিতে সেই স্থানে দৈত্যদ্বয়-সন্নিধানে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিল। তাহারা উভয়ে অপরিমিত মদ্যপান করিয়া আরক্তনয়ন ও মদমত্ত হইয়াছিল, সুতরাং সেই বরারোহাকে দেখিবামাত্র মদনবাণে সম্পূর্ণরূপে ব্যথিত হইল।'

অর্থাৎ যন্ত্রমানবী তিলোত্তমার সাহায্যে দেবতারা সুন্দ-উপসুন্দের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে তাদের নিহত করলেন। দেবতাদের আসল পরিচয় যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে তাদের বহু বিষয়ই সহজেই আমাদের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠবে। দেবতারা উন্নত সভ্য মানুষ। জ্ঞান বিজ্ঞানে আমাদের থেকেও উন্নত। তারা যা করেছেন তা অলৌকিক কিছুই নয়—সবই উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে করা সম্ভব; আসলে আমরা অনুন্নত মানুষদের মতো সেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না বলেই সবকিছু ধোঁয়াটে ও অলৌকিক মনে হচ্ছে।

গরুড় রহস্য !

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ডোহেনি বৈজ্ঞানিক অভিযানের ফলে উত্তর আরিজোনার হাভা স্বপাই গিরিখাতে একটি শিলাচিত্র আবিষ্কৃত হয়। এই শিলাচিত্রে আঁকা ছিল পিছনের তু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অধুনালুপ্ত টিরানোসরাসের একটি ছবি। টিরানোসরাসের অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে ছিল প্রায় ২৭ কোটি বৎসর আগে। তাহলে শিল্পীরাও কি ২৭ কোটি বৎসরের প্রাচীন! অবিশ্বাস্য। কিন্তু তাহলে কারা আঁকল এই অতিকায় টিরানোসারাসের ছবি? এ জন্তু চোখে না দেখে শুধু কল্পনায় কি কারো পক্ষে আঁকা সম্ভব? ছবিগুলি নিশ্চয় ২৭ কোটি বৎসরের প্রাচীন হতে পারে না। তাহলে আর কি ব্যাখ্যা আছে এই রহস্যময় শিলাচিত্রের?

আচ্ছা, এমন কি হতে পারে—ধরা যাক ২৭ কোটি বৎসর পূর্বে একটি ভিন্‌গ্রহী মহাকাশযান এসে নামল পৃথিবীর বুকে। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মহাকাশচারীরা বুঝতে পারলেন এই গ্রহটা সব দিক থেকে তাদের গ্রহের মতো, তবে গ্রহটার বয়স তাদের গ্রহের বয়সের থেকে অনেক কম। এখানে চলছে তখন অতিকায় দানব বা সরীসৃপের রাজত্ব। তাদের গ্রহের আদিমকালেও হয়তো এই রকম অবস্থা ছিল। তারা যেন নিজেদের গ্রহেরই আদিমরূপ লক্ষ্য করলেন এখানে। খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তারা। ছবি-টবিও তুলে নিতে লাগলেন। তারা লক্ষ্য করলেন যে অতিকায় দানবদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে টিরানোসরাস। সুতরাং টিরানোসরাসের ছবিও উঠল। সবকিছু জমা হল পৃথিবী নামক গ্রহের ফাইলে। তারপর তারা চলে গেলেন। পরবর্তীকালে সেই ফাইল সঙ্গে নিয়ে এলেন আর একদল মহাকাশচারী। পৃথিবীর বুকে পরিবর্তন ঘটে গেছে তখন অনেক।

ডাইনোসরাস অর্থাৎ অতিকায় সরীসৃপদের যুগ শেষ হয়েছে। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর দেহে একদিন পাখা গজিয়েছে—তারা ধীরে

ধীরে পরিণত হয়েছে পাখিতে—হয়তো সরীসৃপদের মধ্যে কোন কোনটির শরীরের আঁশগুলি জটিল ও দীর্ঘ হয়ে পরে পাখায় পরিণত হয়েছে। সব নোট করে চলে গেলেন মহাকাশচারীরা; তখনো হয়তো এ গ্রহ তাদের বসবাসের উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি।

বহুকাল পরে সেই একই ফাইল নিয়ে এলেন আর একদল মহাকাশচারী। আধা-বানর আধা-মানুষদের রাজত্ব হয়তো তখন পৃথিবীতে। মহাকাশচারীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। অবসর সময় কাটানোর জন্য একজন মহাকাশচারী খুলে ধরলেন ফাইল—কিছু না ভেবেই তিনি হয়তো হাভা সুপাই গিরিখাতে টিরানোসরাসের একটা ছবি এঁকে ফেললেন। খুবই কি অবাস্তব মনে হচ্ছে গল্পটা?

পৃথিবীর জীবজগতের ক্রমবিবর্তনবাদের খবর আমাদের দেবতার রাখতেন বলেই মনে হয়। মহাভারতের গরুড় কাহিনীটা আলোচন করা যাক, দেখা যাক কিছু সূত্র পাওয়া যায় কিনা।

গরুড় সাধারণ পাখি নন। তার জন্ম রহস্যাবৃত।

প্রজাপতি কশ্যপ পুত্র কামনায় যজ্ঞ করছেন। দেবগণ, ঋষিগ ও গন্ধর্বগণ তাকে যজ্ঞের কাজে সাহায্য করছেন। দেবরাজ ইন্দ্র বালখিল্য মুনিদের উপর ভার পড়েছে যজ্ঞের কাঠ সংগ্রহের। দেবরা ইন্দ্র পর্বতপ্রমাণ কাঠ এনে জড়ো করতে লাগলেন। এক সময় তি লক্ষ্য করলেন যে আঙুলের মতো রোগা বেঁটে কতকগুলি ঋ মিলে একটি পলাশ ফুলের বোঁটা মাথায় করে অতি ক যজ্ঞস্থানের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ইন্দ্র সেই বালখিল্য ঋষিদে উপহাস করে এগিয়ে গেলেন। এতে বালখিল্য ঋষিরা অত্য অপমানবোধ করলেন এবং 'ইন্দ্রের ভয়জনক এক মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠা করলেন। তারা বললেন, 'আমাদের ব্রত ও তপস্যার ফলে ত কামবীর্য্য, কামচারী, দেবরাজের ভয়জনক ইন্দ্র হইতে শতগুণ শৌ বীর্য্য সম্পন্ন, মনোজব উগ্রমূর্ত্তি অপর এক ইন্দ্র দেবলোকে উৎ হউক। এই কামনায় উচ্চাবচ-মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি হুতাশনে আহু প্রদান করিতে লাগলেন।'

ইন্দ্র এ কথা জানতে পেরে কশ্যপকে গিয়ে ধরলেন। কশ্যপমুনি বালখিল্য ঋষিদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন—বললেন, আপনাদের সৃষ্ট ইন্দ্র পাখিদের ইন্দ্র হোন। বালখিল্য ঋষিরা শান্ত হয়ে কশ্যপকে বললেন, 'আমরা সকলেই ইন্দ্রের উৎপত্তির নিমিত্ত এবং আপনার সন্তানোৎপাদনাভিলাষে এই যজ্ঞের আরম্ভ করিয়াছি, অতএব আপনিই আমাদের কর্ম্মফল প্রতিগ্রহ করিয়া যাহাতে ভালো হয়, তাহা করুন।'

যজ্ঞশেষে কশ্যপ মুনি পত্নীদের বললেন আমি তোমাদের বর দেব। কদ্রু বললেন তার গর্ভে যেন সমানতেজা সহস্র নাগ উৎপন্ন হয়। বিনতা প্রার্থনা করলেন বল, প্রভাব, কান্তি ও বিক্রমে কদ্রুর ছেলেদের থেকে যেন শ্রেষ্ঠ দুটি ছেলে তার হয়। যথা সময়ে কদ্রুর একহাজার নাগ সন্তান ও বিনতার অরুণ ও গরুড় নামে দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করল।

পৃথিবীতেও তো প্রথমে সরীসৃপ তারপর পাখিদের জন্ম হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা সরীসৃপ ও পাখি সগোত্র। 'Scientists think that all birds may be descended from a small dinosaur—called procompsoganthus.'

তবে গরুড় সাধারণ পাখি নন—তিনি পাখিদের রাজা বা ইন্দ্র, বালখিল্য ঋষিদের তপঃপ্রভাবে সৃষ্ট। তাই আমরা দেখি 'কাল উপস্থিত হওয়াতে মাতৃসাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং অণ্ডবিদারণ-পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাসত্ত্ব, মহাবল, তড়িন্মালাবৎ পিঙ্গলাক্ষ, অতি ভীষণ কালানল তুল্য, প্রদীপ্ত মহাঘোর, রুদ্রমূর্ত্তি, মহাকায়, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনরাশি সদৃশ অতি ভয়ঙ্কর, কামরূপ, কামবীর্য্য, কামগতি ঐ বিহঙ্গম দশদিক প্রকাশ করত দ্বিতীয় বাড়বাগ্নির ন্যায় সহসা শরীর বৃদ্ধি করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে আকাশে আরোহণ করিলেন।'

ডিম ফুটে একটি পাখির জন্মবৃত্তান্ত কি এই। আসলে তা না, ডিম ভেঙে গরুড়ের জন্ম হয় নি, তার জন্ম হয়েছে বালখিল্য ঋষিদের তপঃপ্রভাবে (বা বিজ্ঞান প্রভাবে)। আসলে গরুড়ও একটি

টেলিস্কোপিক রোবট-রকেট। ঠিক হনুমানের মতোই। তবে হনুমান থেকে বহু পূর্বে তৈরি—সম্ভবত পৃথিবীতে যখন পাখিদের রাজত্ব চলছিল তখন গরুড়কে তৈরি করা হয়। কারণটাও সেই একই, পৃথিবীর কোন জন্তু বা পাখির আদলে যন্ত্র তৈরি করে পৃথিবীতে পাঠালে কোন ঝামেলা থাকবে না। খুব সম্ভব এই সময় পৃথিবীর বুকে সরীসৃপরা ধ্বংস হচ্ছিল এবং পাখিদের প্রভাব বাড়ছিল— গরুড়কে সর্প ভক্ষক করার পিছনে সম্ভবত সেই ধরণের কোন ইঙ্গিতই রয়েছে বলে মনে হয়।

যাই হোক, জন্মমুহূর্তে গরুড় যে কাণ্ডটি ঘটালেন তাতে দেবতাদের আক্কেল গুড়ুম। দেবতারা ভীত হয়ে গরুড়ের স্তব করতে শুরু করলেন। নাকি বেতার সংকেত পাঠাতে লাগলেন গরুড়-রূপী রোবট রকেটের ভিতরে বসানো কমপিউটারে? সম্ভবত তা-ই, আর সে কারণেই আমরা দেখি দেবতাদের স্তব শুনে গরুড় নিজ দেহ সংকুচিত ও তেজ সংহার করলেন।

গরুড়ের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিত হই। মায়ের দাসীত্ব মোচনের জন্য অমৃত আনবার উদ্দেশ্যে তিনি ইন্দ্রলোকে যাত্রা করলেন। তখন 'দেবরাজের প্রিয়তম বজ্র ভয়ে প্রচলিত হইয়া উঠিল; আকাশ হইতে সধূম শিখাবিশিষ্ট উল্কাপিণ্ড অজস্র পতিত হইতে লাগিল। * * * চতুর্দ্দিকে নির্ঘাত বায়ু বহন করিতে আরম্ভ করিল; সহস্র সহস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিপতিত হইতে থাকিল এবং মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশ মহাশব্দপূর্ব্বক ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল। দেবগণের মাল্যসকল ম্লান ও তেজোরাশি বিনষ্ট হইল। রজোবৃন্দ উড্ডীয়মান হইয়া দেবগণের মুকুট মলিন করিল।'

পরে ইন্দ্রর সঙ্গে যুদ্ধ হল। ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতাদের আহত করে অমৃতের উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন গরুড়। দেখলেন অমৃতভাণ্ড ঘিরে রয়েছেন অগ্নি। অগ্নি নাকি কোন ফোর্স-ফিল্ড? বিদ্যুতের ব্যবহার তো দেবতারা ভালো ভাবেই জানতেন। যাই হোক, আগুন-টাগুন নিভিয়ে নিজের দেহকে ছোট করে যে ঘরে অমৃত রাখা ছিল

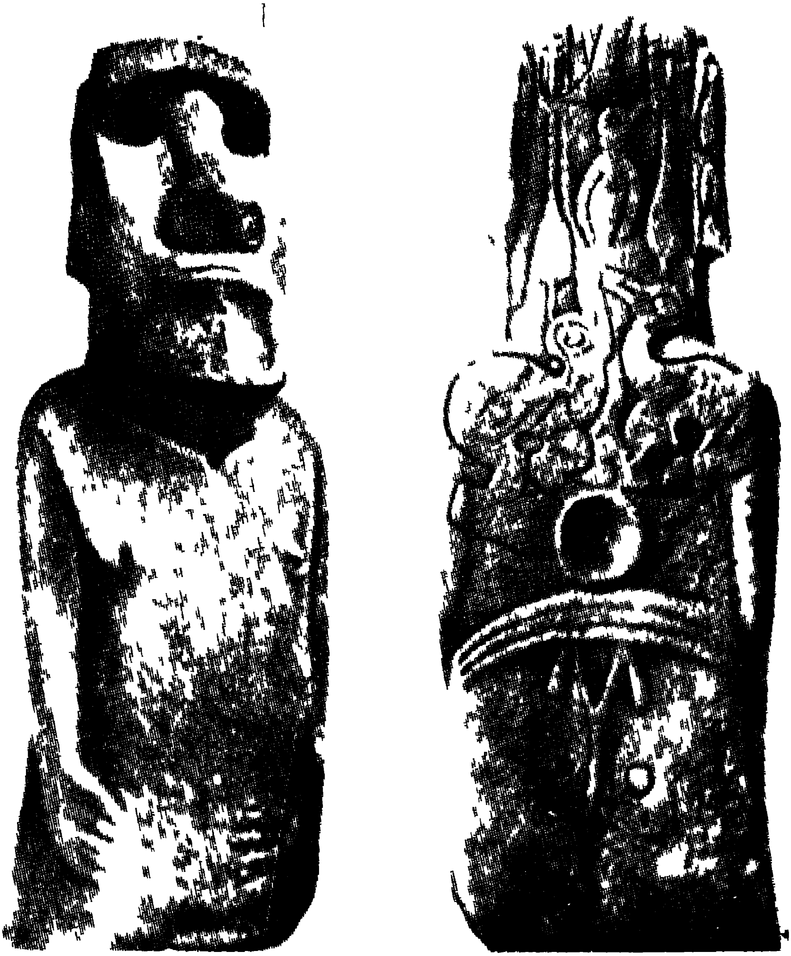

ইস্টার দ্বীপের বিশাল বিশাল পাথরের মূর্তি। এগুলিকে বলা হয় হোয়া-হাকা-নানা-ইয়া। এগুলি এখন আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে

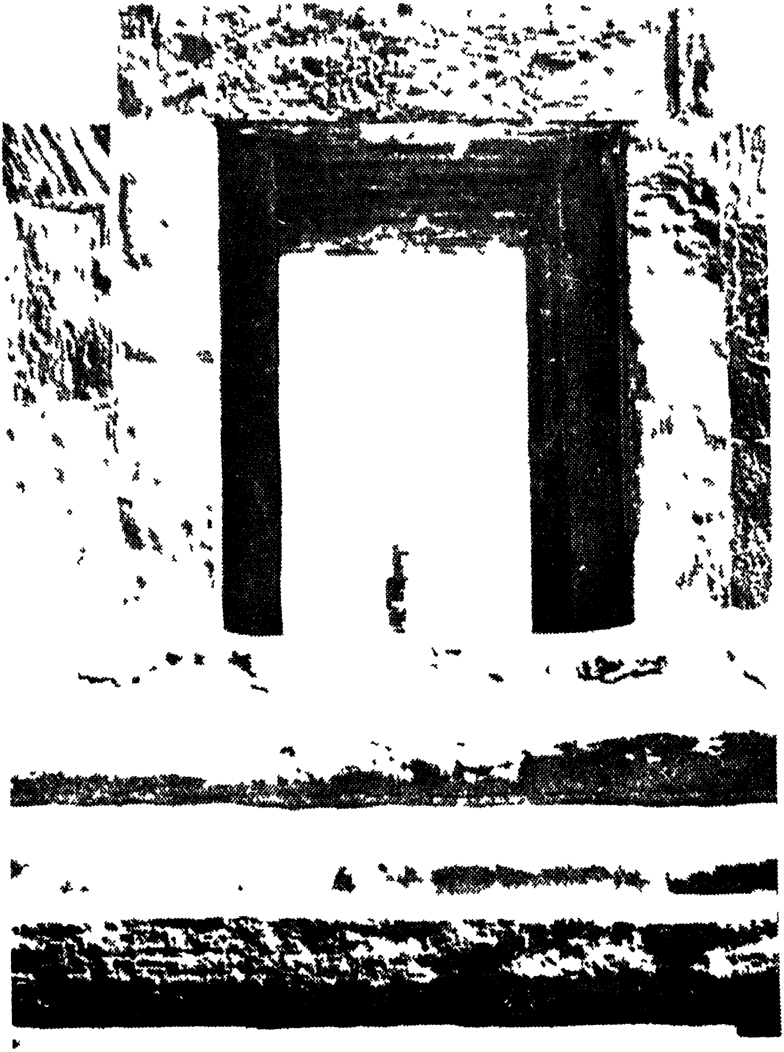

টিয়াওয়ানাকো (পেরু) মন্দিরের প্রবেশদ্বার। এ মন্দির যে কত পুরোনো তা বলা শক্ত। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে তের হাজার ফুট উঁচু মালভূমিতে অবস্থিত। বিশাল প্রবেশদ্বারটি এখনো অক্ষত আছে। এই মন্দির তৈরি করতে কমপক্ষে একলক্ষ লোক লেগেছিল। অথচ চারপাশের জমি এমন উর্বর নয় যে এত মানুষের জীবনধারণের জন্য খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতে পারে। তাহলে কারা এই মন্দির তৈরি করেছিলেন?

প[illegible] ছবি[illegible]
টিয়া[illegible]হুয়ানাকো (পেরু)
মন্দিরের প্রস্তর [illegible]
[illegible]
[illegible] অংশটি
বড় করে দেখানো হয়েছে
একটি অ[illegible] পাথর কেটে
তৈরি এবং [illegible]
[illegible]। মাথার
হেলমেটের মত [illegible]
বুকের উপরকার অদ্ভুত বর্ম
[illegible]-স্যুট পরিহিত
মহাকাশচারীর ইঙ্গিত
দেয় কি?

সাহারার টাসিলি-তে পাওয়া প্রাচীন চিত্র। অনেকের ধারণা এটা এক আকাশচারীর দেহ হলেও হতে পারে

স্পেস-স্যুট পরিহিত আধুনিক মহাকাশচারী। দেখতে অদ্ভুত নয় কি ?

সেই ঘরে ঢুকলেন গরুড়। ঘরে ঢুকে দেখলেন, 'যে প্রজ্জ্বলিত প্রভাকরতুল্য, ঘোরভীষণ, লৌহময়, ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার এক চক্র অমৃতের চতুর্দ্দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। দেবগণ! অমৃত হরণেচ্ছু ব্যক্তিদিগের ছেদনার্থ ঐ ঘোররূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।'

কী আশ্চর্য, অমৃত রক্ষার জন্য দেবতাদেরও তাহলে কলকব্জা বানাতে হয়! অবশ্য হতেই পারে, দেবতাদের অলৌকিক কর্মকাণ্ড আসলে তো তাদের উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যারই ফসল!

তারপর গরুড় 'ঐ যন্ত্রমধ্যে যৎকিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশস্থান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরীর সঙ্কুচিত করিয়া অরমধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে দেখিলেন যে প্রদীপ্ত হুতাশনসদৃশ দেদীপ্যমান, বিদ্যুন্মালার ন্যায় চঞ্চলজিহ্বাবিশিষ্ট, মহাবীর্য্য, দীপ্তবদন, দীপ্তলোচন, দৃষ্টিবিষ মহাঘোর, সর্ব্বদাই রোষপরবশ, অতিশয় বলশালী, সদাসংরক্ত-নয়ন, নিত্যনির্নিমেষলোচন ভীষণ ভুজঙ্গদ্বয় অমৃতরক্ষার্থ নিয়ত নিযুক্ত আছে।* * * সর্পবরের মধ্যে অন্যতর সর্প যাহার প্রতি একবারমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে তৎক্ষণাৎ ভস্মরাশি হইয়া যায়।'

সাপের বর্ণনা দেওয়া হলেও ওই দুটি যে সাপ নয় কোন ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্র-বিশেষ তা বুঝতে কোন কষ্ট হয় কি? অমৃত রক্ষার জন্য যারা যন্ত্রের ব্যবহার করেন তারা কি অমৃত পাহারা দেওয়ার জন্য দুটি সাপ ছেড়ে রাখবেন? সাপ দুটির বর্ণনা ভালো করে পড়লেই বোঝা যায় কোন শক্তিশালী অস্ত্রের কথা বলা হচ্ছে। 'সদাসংরক্ত-নয়ন, নিত্য-নির্নিমেষ লোচন' আসলে Photo cell নয়তো? হয়তো এমন কোন ব্যবস্থা করা আছে যার ফলে কেউ এই চোখের সামনে এলে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহ সচল হয়ে উঠবে এবং লেসার-রশ্মি অথবা তেজস্ক্রীয় কোন রশ্মি নির্গত হয়ে তাকে ভস্ম করে ফেলবে। কিন্তু এই ফটো সেলকে কৌশলে অকেজো করে দিতে পারলে আর বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু হবে না তাই ভস্ম হওয়ার ভয়ও থাকবে না। গরুড় কি করলেন? তিনি 'সহসা ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ঐ সর্পদ্বয়ের নয়ন আচ্ছাদিত করিলেন।'

আশা করি এবার সবকিছুই স্পষ্ট—এই ধরণের সাপের কথা রামায়ণ মহাভারতে আমরা বহু ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করি।

গরুড় অমৃত নিয়ে যাচ্ছেন দেখে ইন্দ্র উঠে বজ্র ছুড়ে মারলেন। গরুড়ের একটি পালক পুড়ে গেল। গরুড়ের আর এক নাম তাই সুপর্ণ। বজ্রের আঘাতে হনুমানেরও মাত্র বাম হনূ ভেঙে গিয়েছিল। ইন্দ্র মনে মনে ভাবলেন, 'পক্ষী সামান্য নহে, নিশ্চয়ই এক মহাপ্রাণী হইবে।' যাই হোক, ইন্দ্রের সঙ্গে গরুড়ের বন্ধুত্ব হল। বিষ্ণু এসে বর দিলেন—তুমি অমর হবে। ব্রহ্মাও হনুমানকে অমর হওয়ার বর দিয়েছিলেন। এরপর বিষ্ণু বললেন 'গরুড় আজ থেকে তুমি আমার বাহন হও।' গরুড় রাজি হলেন। হনূমানও তো রামের বাহন হিসাবে পরিচিত। গরুড় আর হনূমানের মধ্যে নিশ্চয়ই এবার যথেষ্ট মিল খুঁজে পাচ্ছেন। আর এ কারণেই বার বার বলা হয়েছে যে গরুড় আর হনূমানের শক্তি সমান, এমন কি হনূমানের শক্তি গরুড়ের থেকেও বেশী।

গরুড় আর হনূমান দুজনেই টেলিস্কোপিক-রোবট-রকেট। একজনকে পূর্বে তৈরি করা হয়েছিল, অপরজনকে তৈরি করা হয়েছিল বহু পরে। কারণ পৃথিবীতে বানরের আবির্ভাব পাখির আবির্ভাবের বহু পরেই ঘটেছিল।

পুরাকালের স্থাপত্য।

লঙ্কা তৈরি করেছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। দানবদের যিনি শিল্পী ছিলেন তার নাম হচ্ছে ময় বা ময়দানব।

পৃথিবীর প্রাচীনতম জ্যোতির্বিদ্যা গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থ 'সূর্যসিদ্ধান্ত'। এই গ্রন্থে 'সিদ্ধ' এবং 'বিদ্যাহর' অর্থাৎ দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের কথা আছে, যারা পুরাকালে চাঁদের নীচ দিয়ে ও মেঘের উপর দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারতেন। এই গ্রন্থের রচয়িতা ময়দানব। অবশ্য দানব শিল্পী ময়দানব এবং সূর্যসিদ্ধান্ত রচয়িতা ময়দানব একই লোক কিনা তা বলা সম্ভব নয়। তবে দানব শিল্পী ময়দানবও একজন বড় বিজ্ঞানী তথা স্থপতি ও বিশিষ্ট অস্ত্রবিদ ছিলেন। জামাই রাবণকে তিনি নিজের তৈরি 'শক্তি' নামে এক সাংঘাতিক অস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। সেই অস্ত্রের আঘাতে লক্ষ্মণের কি অবস্থা ঘটেছিল তা আমরা জানি।

এই ময়দানব খাণ্ডবদাহনের সময় কৃষ্ণ ও অর্জুনের দয়ায় বেঁচে যান। তাই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের জন্য এক আশ্চর্য স্ফটিক নির্মিত সভা তৈরি করে দেন। এই সভায় অপমানিত হয়ে দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্য এই সভাগৃহও অনেকাংশে দায়ী। সভার বর্ণনা শুনুন:

'সভাটি চতুর্দ্দিকে পঞ্চসহস্রহস্ত বিস্তীর্ণ হইল। ঐ সভা সূর্য্য-চন্দ্রাদির সভাতুল্য দীপ্তিমতী হইয়া অতিশয় মনোহর আকার ধারণ করিল। স্বকীয় প্রভার প্রভাবে সূর্য্যের প্রখর প্রভাবকেও যেন অপ্রতিভ করিল। অলোকসামান্য তেজদ্বারা দিব্যরূপা হইয়া যেন প্রজ্জ্বলিতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং নূতন জলধরের ন্যায় নভোমণ্ডল আবৃত করিয়া রহিল।* * * গগনচারী, মহাবল, মহাকায়, রক্তাক্ষ, পিঙ্গলাক্ষ, শুক্তিকর্ণ, প্রহরণধারী অষ্টসহস্র কিঙ্কর নামক ঘোররূপ রাক্ষস ময়ের আজ্ঞানুসারে উক্ত সভায় গমন করত উহার রক্ষণ ও বহন করিতে লাগিল।' (সভাপর্ব, ৩য় অধ্যায়)

এই রাক্ষসদের বিষয় একটি হেঁয়ালি। সভার রক্ষণ ও বহনকারী রাক্ষসরা কি কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি? সঠিক বলা মুশকিল।

যাই হোক, 'উক্ত সভায় ময় একটি অপ্রতিম সরোবর নির্ম্মাণ করিল। ঐ সরোবরে মণিময় মৃণাল ও বৈদূর্য্যময় পত্রযুক্ত শত শত শতপত্র ও কাঞ্চনময় কহ্লারকদম্ব সুশোভিত ছিল এবং বহুতর বিহঙ্গগণ ইতস্তত কেলি করিতেছিল। প্রফুল্ল পঙ্কজ ও সুবর্ণনির্ম্মিত মৎস্য-কূর্ম্মাদি দ্বারা বিচিত্রিতা, চিত্র-স্ফটিকসোপানবদ্ধা, মন্দ মন্দ সমীরণ দ্বারা আন্দোলিতা, মুক্তাবিন্দুনিচয়ে খচিতা, মহামণি-শিলাপট্টদ্বারা চতুর্দ্দিকে বদ্ধবেদিকা মণিরত্নে বিভূষিতা ঐ নির্ম্মল-সরসী দৃষ্ট করিয়াও কোন কোন রাজপুরুষ ভ্রমক্রমে উহাতে পতিত হইয়াছিলেন।'

আসলে দুর্যোধন এই সভায় নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়ে সারা ভারতবর্ষের যে সব রাজারা ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন যজ্ঞশেষে তারা সবাই চলে গেলেন। মামা শকুনিসহ দুর্যোধন রয়ে গেলেন। ময়দানবের সভা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন তিনি। 'তথায় তিনি যে সমস্ত দিব্য নিম্মাণ প্রণালী দর্শন করিলেন, পূর্ব্বে হস্তিনানগরে তাহা আর কস্মিনকালেও দেখিতে পান নাই। সেই মহীপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্রতনয় কোন দিন সভামধ্যে স্ফটিকময় স্থলভাগের সন্নিহিত হইয়া বুদ্ধিমোহ প্রযুক্ত জলশঙ্কা করিয়া স্বীয় বসন উৎকর্ষণ করিলেন এবং তাহাতে বিমুখ হওয়ায় দুম্মনায়মান হইয়া সভা পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে স্ফটিকতুল্য-নির্ম্মল-সলিলশালিনী স্ফটিকময় কমলশোভিতা একটি বাপীকে স্থলজ্ঞান করিয়া সবস্ত্রে জলমধ্যে নিপতিত হইলেন।*** তাঁহার সেই অবস্থা অবলোকন করিয়া মহাবল ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই তখন হাস্য করিতে লাগিলেন। অমর্ষণ সুযোধন তাঁহাদিগের সেই উপহাস সহ্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু বাহ্য আকার গোপন করত তৎকালে মুখ তুলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। যেন জল পার হইবেন, এই মনে করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বসন উৎক্ষেপনপূর্ব্বক স্থলে আরোহন করিলেন, তাহাতে সকলেই পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া উঠিল। একটি বদ্ধাকার স্ফটিকময়দ্বার

নিরীক্ষণ করিয়া বিবৃত-বোধে দুর্য্যোধন যেমন প্রবেশোন্মুখ হইবেন, অমনি মস্তকে আহত হইয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন, সেইরূপ স্ফটিকময় বিশালকপাটপুট সংযুক্ত অপর এক বিবৃতদ্বার বদ্ধ বোধ করিয়া করযুগলদ্বারা বিঘট্টিত করত নির্গত হইয়া পতিত হইলেন। আবার তদ্রূপ বিততাকার অন্য এক দ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সংবৃত বোধ করিয়া বাস্তবিক দ্বারস্থান হইতে নিবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! নরপতি দুর্য্যোধন রাজসূয় মহাযজ্ঞে তাদৃশ অদ্ভুত সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া এবং সভামধ্যে উক্তরূপে বহুবিধ বিপ্রলম্ভ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অপহৃষ্ট মানসে হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।' (সভাপর্ব, ৬৪ অধ্যায়)

মহারাজ দুর্যোধনের দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করেছিল কি সেই রাক্ষসরূপী ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলি? পাঠকই বিচার করবেন।

এবার বিশ্বকর্মাপুত্র (!) নলের সেতুবন্ধনের বিষয়টি দেখা যাক। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ২২ সর্গে আমরা এই সেতু নির্মাণের বর্ণনা দেখতে পাই।

'অসংখ্য প্রধান প্রধান বানর, রামচন্দ্রকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া হৃষ্টমনে উল্লম্ফন করত মহারণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তৎপরে সেই পর্ব্বতপ্রমাণ বানরযূথপতিগণ, গিরিশিখর এবং বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন এবং উৎপাটিত করত সমুদ্রতীরে আনিতে আরম্ভ করিল এবং শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, কূটজ, তাল, তিলক, তিনিশ, বিল্ব, পুষ্পিত সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, চূত এবং অশোক প্রভৃতি বৃক্ষসকলদ্বারা সাগরতীর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই মহামহা বানরগণ ইন্দ্রধ্বজতুল্য সমূল এবং নির্ম্মূল বৃক্ষসকলকে চারিদিক হইতে আহরণ করিতে লাগিল। নানা স্থান হইতে তাল, দাড়িম্ব, নারিকেল, বিভীতক, করবীর, বকুল ও নিম্ব প্রভৃতি বহুল বৃক্ষ আহরণ করিতে থাকিল। হস্তির ন্যায় প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড এবং পর্ব্বত-সকলকে উৎপাটন করিয়া যন্ত্র দ্বারা বহন করিতে লাগিল। প্রস্তরখণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে সমুদ্রজল উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশ পর্যন্ত উত্থিত এবং পুনরায় অধঃপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে চারিদিক

হইতে প্রস্তর সকল পতিত হওয়ায়, সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বহু সংখ্যক বানর, সূত্র ধরিয়া সেই সেতুর সমবিষমাদি পরীক্ষা করিতে লাগিল।* * * কোন কোন বানর দণ্ড গ্রহণ করত নিজ নিজ অধীনস্থ বানরগণকে কার্য্য করাইতে লাগিল। এবং কেহ কেহ ইতস্ততঃ বৃক্ষাদি অন্বেষণ করিতে লাগিল।* * * হস্তীর ন্যায় বহুসংখ্যক বানর পর্ব্বত-প্রমাণ প্রস্তরখণ্ড এবং গিরিশৃঙ্গ সকল গ্রহণ করত, সেতুর অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। তৎকালে গিরিশৃঙ্গ এবং প্রস্তরখণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় সমুদ্রে তুমুল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। এইরূপে গজপ্রমাণ ক্ষিপ্রকারী মহাবেগ ও মহাবলশালী মহাকায় বানরগণ অপরিমিত আনন্দ সহকারে প্রথম দিনে চতুর্দ্দশ যোজন দীর্ঘ সেতু প্রস্তুত করিল। ভীমকায় মহাবল বানরগণ সেইরূপ লঘুহস্ততা প্রকাশ করিয়া দ্বিতীয় দিনে বিংশতি, তৃতীয় দিনে একবিংশতি, চতুর্থ দিনে ত্রয়োবিংশতি যোজন নির্ম্মাণ করিয়া, লঙ্কানিম্নস্থ বেলাভূমিতে সংযোজিত করিয়া দিল।'

এই সেতু শতযোজন দীর্ঘ আর দশযোজন প্রশস্ত। সময় লাগল চারদিন। অমানুষিক কাজ সন্দেহ নেই। আর এই অমানুষিক কাজ করবার জন্যই দেবতারা নলকে সৃষ্টি করেছিলেন।

সেতু তৈরির কি বিশদ বর্ণনা! যেন আমাদের চোখের সামনে আমরা নলকে সেতু তৈরি করতে দেখছি। আধুনিক construction site এর থেকে নলের সেতু তৈরির দৃশ্যে কি খুব পার্থক্য আছে? আসলে দেবতারা অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা কিছুই করেন নি। সেতু তৈরি করতে তাদেরও মজুর লেগেছে, গাছ-পাথর লেগেছে। লেগেছে পরিদর্শক, লেগেছে যন্ত্র, লেগেছে রাজমিস্ত্রী। আসলে দেবতাদের কাজ কারবার কখনো খোলা মন নিয়ে আমরা বিচার করে দেখার চেষ্টা করি নি। দেবতারা যা খুশি তাই করতে পারেন এটাই ভক্তি বিনম্র চিত্তে অন্ধের মতো মেনে নিয়ে ভাবনা চিন্তার দায় এড়িয়ে গেছি।

অস্ত্র রহস্য !

রামায়ণ, মহাভারতে যেন অস্ত্রের ছড়াছড়ি। সুতরাং অস্ত্র সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা না করলে এ রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অস্ত্রশাস্ত্র বলতে প্রধানত ধনুর্বেদকেই বোঝায়। এই ধনুর্বেদকে বহু ক্ষেত্রে পঞ্চম বেদ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। ধনুর্বেদ গুরুমুখী বিদ্যা। গুরু বা দেবতার কাছ থেকে এর শিক্ষাপ্রকরণ না জানতে পারলে এই বিদ্যায় সিদ্ধি হয় না। অর্জুনকে এ কারণেই স্বর্গে গিয়ে দৈবী অস্ত্র ও সেই অস্ত্র সম্বন্ধে পাঁচ বৎসর শিক্ষালাভ করে আসতে হয়েছিল। কর্ণকে ছদ্ম পরিচয় দিয়ে অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ব করতে হয়েছিল গুরু পরশুরামের কাছ থেকে। এই অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ব করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হত। এবং উপযুক্ত শিষ্য ছাড়া গুরুরা কখনই এ বিদ্যা শেখাতেন না।

অভিমন্যু অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন অর্জুনের কাছ থেকে। 'বেদজ্ঞ অরিন্দম অভিমন্যু অর্জ্জুনের নিকট আদান, সন্ধান, মোক্ষণ, বিনিবর্ত্তন, স্থান, মুষ্টি, প্রয়োগ, প্রতিকার, মণ্ডল ও রহস্য এই দশাঙ্গবিশিষ্ট এবং মন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও অমুক্ত এই চতুষ্পাদযুক্ত দিব্য ও মানুষ সমুদায় ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলেন।' (আদিপর্ব, ২২২ অধ্যায়)

অস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ ছিল। দৈব, ব্রাহ্ম, বায়ব্য ও সাধারণ অস্ত্র। পাঠক শ্রেণীবিভাগগুলি ভালো করে লক্ষ্য করুন। মহাভারতের বনপর্বের ৩৭ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলছেন, 'ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও অশ্বত্থামাতে চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাঁহারা পর-প্রযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রতীকার সহিত ঐন্দ্র, বারুণ প্রভৃতি দৈব, ব্রাহ্ম, বায়ব্য ও সাধারণ অস্ত্র এবং ঐ সমস্ত অস্ত্রের প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত আছেন।'

রামায়ণ, মহাভারত আলোচনা করলে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্রশস্ত্রের পরিচয় ও তাদের ক্ষমতার কথা জানতে পারা যায়। এর মধ্যে বড়

বড় পাথর ও লোহার গোলা ছোড়ার যন্ত্র থেকে ব্রহ্মাস্ত্র পর্যন্ত আছে। এর মধ্যে কিছু কিছু অস্ত্রের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করতে পারলেও বহু অস্ত্রের কর্মক্ষমতার স্বরূপ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। ভল্ল, শর, খড়্গ, সায়ক, আয়ুধ ইত্যাদি অস্ত্রের সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করতে পারলেও ঐন্দ্র, বারুণ, পাশুপত, বজ্র, শূলবত, শক্তি, শুষ্ক ও আর্দ্র অশনি, বর্ষণ ও শোষণ অস্ত্র, সৌর অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট।

বজ্র, শুষ্ক ও আর্দ্র অশনি কি লেসার-রশ্মি জাতীয় কোন অস্ত্র? সৌর অস্ত্র নিশ্চয় সূর্যরশ্মি সংহত করে সেই শক্তিকে ধ্বংসাত্মক কাজে লাগাবার অস্ত্র। বর্ষণ অস্ত্র কি আবহমণ্ডল-নিয়ন্ত্রণকারী কোন অস্ত্র? আমেরিকা এই অস্ত্র তৈরি করেছে বলে রাশিয়া অভিযোগ করেছিল। এই অস্ত্রের সাহায্যে শত্রুদেশে ঝড়-বৃষ্টি, হারিকেন, জলোচ্ছ্বাস ঘটানো যায়। ব্রহ্মাস্ত্র কি পারমাণবিক কোন অস্ত্র? সঠিক বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ সব অস্ত্রের ধ্বংসলীলা যে কি ভয়ঙ্কর তার বর্ণনা আমরা রামায়ণ, মহাভারত থেকেই পাই।

'রাক্ষসরাজ এই বলিয়া মহাক্রোধে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয়তেজে প্রদীপ্তা অষ্টঘণ্টাসমন্বিতা সেই মহাশব্দযুক্তা শত্রুঘাতিনী অমোঘা ময়মায়াবিনির্ম্মিতা শক্তি নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। ভীমবেগে নিক্ষিপ্তা বজ্র ও অশনির ন্যায় শব্দকারিণী সেই শক্তিও সংগ্রাম মধ্যস্থিত লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হইল।' (লঙ্কাকাণ্ড, ১০১ সর্গ)

রাম রাবণের দ্বৈরথ যুদ্ধে—'রামচন্দ্র গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা গান্ধর্ব্ববাণ সকলকে এবং দৈববাণ দ্বারা দৈবাস্ত্র সকলকে কাটিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া রাবণ অত্যন্ত কোপযুক্ত হইয়া ঘোররূপ উৎকৃষ্ট রাক্ষস অস্ত্র ক্ষেপণ করিলে, রাবণ ধনুর্ম্মুক্ত সেই কাঞ্চনভূষিত দীপ্তমুখ ভয়ঙ্কর বাণসকল সর্পরূপ ধারণপূর্ব্বক বদন বিস্তার করিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল। * * * রামচন্দ্র সেই সর্পরূপী বাণসকলকে রণমধ্যে আসিতে দেখিয়াই ঘোরতর ভয়াবহ গরুড় অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন সেই রামধনুর্ম্মুক্ত

অগ্নিপ্রভ সুবর্ণপুঙ্খ বাণসকল সুবর্ণময় গরুড়রূপ ধারণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। পরে রামচন্দ্রের সেই কামরূপ গরুড়াকৃতি বাণসকল, দশাননের সর্পাকৃতি বাণসকলকে বিনষ্ট করিল।' (লঙ্কাকাণ্ড, ১০৩ সর্গ)

জনস্থানে যুদ্ধের সময় খর রামের দিকে গদা ছুড়ে মারলেন। —'সেই ভীষণ প্রদীপ্তা গদা খরবাহু হইতে নিক্ষিপ্তা হইয়া বৃক্ষ ও গুল্ম সকল ভস্ম করিতে করিতে রামের দিকে ধাবিত হইল। যমপাশতুল সেই গদাকে আকাশপথ দিয়া তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া রাম বহুতর বাণ দ্বারা তাহাকে বহুখণ্ডে কাটিয়া ফেলিলেন।' (অরণ্যকাণ্ড, ২৯ সর্গ)

রাম খরকে মারবার জন্য 'দেবরাজ ইন্দ্রের প্রদত্ত অগ্নিতুল্য-দীপ্তিময় ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ বাণ গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধান করিয়া খরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ধনু নমিত করিয়া রামকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দকারী মহাস্ত্র খরের বক্ষস্থলে পতিত হইল।' (অরণ্যকাণ্ড, ৩০ সর্গ)

বালীকে বধ করার জন্য রাম—'সর্পতুল্য জীবনান্তকর একটি বাণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং ধনুতে সেই বাণ যোজনা করিয়া যম যেমন কালচক্রনামক শরাসন আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ তাহা আকর্ষণ করিলেন। তখন পক্ষী ও মৃগ সকল তাঁহার জ্যা এবং তলশব্দে ভীত এবং প্রলয়কালে প্রাণীগণ যেমন মোহিত হয়, তদ্রূপ মোহিতচিত্ত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পরে তিনি বালীর বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য এবং শব্দায়মান সেই মহাবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন।' (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৬ সর্গ)

সাগর বন্ধনের জন্য রাম সাগরের স্তব করলেন ; কিন্তু সাগর দেখা দিলেন না। তখন রাম খুব রেগে গিয়ে,—'ব্রহ্মদণ্ডনিভ বাণ ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া বিপুল শরাসনে যোজনপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের অভ্যন্তরভাগ যেন স্ফুটিত ও

পর্ব্বতসকল কম্পিত হইল। তৎপরে লোকসকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, দিকসকল অপ্রকাশ এবং সরোবর ও নদীসকল সংক্ষুব্ধ হইল। চন্দ্র ও সূর্য্য—নক্ষত্রগণের সহিত বিষমভাবে মিলিত হইয়া বিষমপথে যাইতে লাগিলেন। এবং আকাশমণ্ডল সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত থাকিয়াও তমসাচ্ছন্ন হইল এবং তন্মধ্যে শতশত দীপ্তিবিশিষ্ট উল্কাসকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে ভয়ঙ্কর নির্ঘাতশব্দ সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল। গগনমণ্ডলে বায়ু প্রস্ফোটিত হইয়া মেঘমালাকে বারংবার ইতস্ততঃ সঞ্চালনকরত তরুসকলকে ভগ্ন করিল এবং পর্ব্বতাগ্র সকলকে উৎপীড়িত করত শিখর সকলকে নিপাতিত করিতে লাগিল। মহাবেগ, মহাস্বন বজ্র সকল পরস্পর আকাশে সংহত হওয়ায় মুহুর্ম্মুহু বৈদ্যুতাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৎকালে দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রাণি-মাত্রেই অভিভূত হইয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং ভয়ে কম্পিতদেহ হইয়া নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল। তৎপরে মহাসাগর—জল, উর্মি, নাগ, রাক্ষস এবং প্রাণিগণ সুমহৎ বেগবশতঃ হঠাৎ এরূপ ভয়ঙ্কর বেগশালী হইয়া উঠিলেন যে প্রলয়কাল উপস্থিত না হওয়াতেও বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া এক যোজন পর্য্যন্ত উচ্ছলিত হইলেন।' (লঙ্কাকাণ্ড, ২১ ও ২২ সর্গ)

কুম্ভকর্ণকে বধ করার জন্য রাম—'সূর্য্য-মরীচিবৎ চাকচিক্যময়, প্রদীপ্ত দিবাকরজ্বলন তুল্য দেদীপ্যমান মহেন্দ্রের বজ্র ও অশনির ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগবান, মারুতবৎ আশুগামী, সুবর্ণ ও হীরকাদিখচিত শোভনপুঙ্খবিশিষ্ট শত্রুগণের অশুভপ্রদ, নিশিতবাণ গ্রহণপূর্ব্বক রাক্ষস কুম্ভকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রামবাহু নিক্ষিপ্ত নির্ধূম মহা-প্রজ্জ্বলিত অনলের তুল্য ভীমদর্শন সেই বাণ আপন প্রভায় দশদিক উদ্ভাসিত করত, ইন্দ্র ও ইন্দ্রের বজ্রতুল্য ভীমপরাক্রম রাক্ষসপতি কুম্ভকর্ণের নিকটে গমন করিয়া—পূর্ব্বকালে পুরন্দর যেরূপ বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রমণীয়কুণ্ডলবিহীন মহাপর্ব্বতের কূটসদৃশ বিবৃতদন্ত তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল।' (লঙ্কাকাণ্ড, ৬৭ সর্গ)

এবার ব্রহ্মাস্ত্র : অগস্ত্য রামকে যে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েছিলেন রাবণ বধের জন্য রাম সেই ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মা এই অস্ত্রটি তৈরি করে ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন। 'সেই অস্ত্রের বেগে পবন, ফলায় অগ্নি ও সূর্য্য, সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মা এবং গুরুত্বে মেরু ও মন্দরের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদ্বয় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র আপন দেহপ্রভায় জাজ্জ্বল্যমান, শোভনপুঙ্খ দ্বারা শোভিত, সুবর্ণভূষিত, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের তেজদ্বারা নির্ম্মিত, সূর্য্যের ন্যায় তেজবিশিষ্ট—সধূম প্রদীপ্ত ও বিষধর সর্পতুল্য ছিল। রথ, অশ্ব, মাতঙ্গদ্বার পরিখ ও গিরি সকলের শীঘ্র ভেদকারী, বহুবিধ রুধির ও মেদোদ্বারা লিপ্ত, বজ্রের ন্যায় সারবান ও শব্দবিশিষ্ট। ঐ মহাস্ত্র সংগ্রামে কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই। ঐ মহাস্ত্র—নিশ্বাসশীল সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও ভয়প্রদ। ঐ অস্ত্র রণমধ্যে কঙ্ক, শকুনি, বক, শৃগাল ও রাক্ষসগণের অবসাদক। গরুড়ের বহুবিধ পক্ষদ্বারা ঐ অস্ত্রের পক্ষ নির্ম্মিত। * * * সেই সুদারুণ ভীষণ মহাস্ত্রকে বেদবিহিত নিয়মে মহাবল রামচন্দ্র অভিমন্ত্রিত করিয়া বলপূর্ব্বক ধনুতে সন্ধান করিলেন। তিনি সেই উত্তম বাণ সন্ধান করিলে সকললোক ভীত হইল—বসুমতী কাঁপিতে লাগিল। পরে রঘুনন্দন ক্রোধভরে যত্নসহকারে ধনু অবনমনপূর্ব্বক সেই পরমর্ম্মভেদী বাণ ক্ষেপণ করিলেন। সাক্ষাৎ যমের ন্যায় অনিবার্য্য, বজ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ সেই মহান অস্ত্র, রাবণের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত সেই দেহান্তকারী মহাবেগশালী বাণ দুরাত্মা রাবণের হৃদয় বিদারণ করিল।' (লঙ্কাকাণ্ড, ১১০ সর্গ)

রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৫৫ সর্গে বশিষ্ঠ মুনিকে কিন্তু আমরা এই ব্রহ্মাস্ত্র হজম করে ফেলতে দেখি। হোমধেনু নিয়ে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বশিষ্ঠের দারুণ ঝগড়া হয়। তপস্যার বলে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে বশিষ্ঠের তপোবন নষ্ট করে ফেললেন। তখন বশিষ্ঠ এগিয়ে এলে বিশ্বামিত্র তার উপর বিবিধ অস্ত্র ত্যাগ করলেন; কিন্তু বশিষ্ঠের কিছুই হল না। তখন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়লেন—'বশিষ্ঠ স্বীয় ব্রাহ্মতেজ প্রভাবে ব্রহ্মদণ্ড দ্বারাই সেই মহাঘোর

ব্রহ্মাস্ত্রও সম্যকরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। সেই অস্ত্রগ্রাসকালে মহাত্মা বশিষ্ঠের মূর্ত্তি ত্রিলোকের মোহকর অতিদারুণ ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার সমস্ত রোমকূপ হইতে অগ্নির ধূমপরীতা শিখার ন্যায় শিখা নির্গতা হইতে লাগিল এবং তাঁহার হস্তস্থিত কালদণ্ডতুল্য ব্রহ্মদণ্ডও নির্ধূম কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।'

বশিষ্ঠের এই ব্রহ্মদণ্ড আবার কি বস্তু ছিল কে জানে? এ সবের ব্যাখ্যা করার মতো জ্ঞান আমাদের সীমিত। তবে একদিন হয়তো এ সবের পরিষ্কার ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে।

এই সব অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনায় আর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের নজরে আসে তা হচ্ছে এই সব দৈবী ও ব্রাহ্ম অস্ত্র ছোড়ার আগে 'অভিমন্ত্রিত' করে নেওয়া হয়—

'ব্রহ্মাস্ত্র স্বয়ম্ভুদৈবত প্রভৃতি নানাবিধ মন্ত্র দ্বারা পূত হইলে সিদ্ধ হয়।' (লঙ্কাকাণ্ড, ৪৮ সর্গ)

রাম সাগরের প্রতি বাণ ছোড়ার সময় বাণটি ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে নিয়েছিলেন।

রাবণের ছেলে অতিকায়ের সঙ্গে যুদ্ধের সময় লক্ষ্মণ 'একটি উগ্রবেগ বাণ লইয়া ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত ধনুতে যোজনা করিলেন।' (লঙ্কাকাণ্ড, ৭১ সর্গ)

নিকুম্ভিলা যজ্ঞশেষে ইন্দ্রজিৎ আহুতি দিলেন, তারপর 'আপন অস্ত্র, ধনু, রথ ও কবচকে ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন। তখন সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রগণের সহিত নভোমণ্ডলস্থিত সমুদয় জীবই ভীত হইল।' (লঙ্কাকাণ্ড, ৭৩ সর্গ)

মকরাক্ষ নিহত হওয়ার পর রাবণের নির্দেশে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করতে গেলেন—'আকাশগামী রথে আরূঢ় সেই বীর অদৃশ্য থাকিয়া, শাণিত বাণসমূহদ্বারা যুদ্ধ মধ্যে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল দাশরথিদ্বয় তাঁহার বাণে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত হইয়া ধনুতে বাণ যোজনপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান বাণসমূহ দ্বারা গগনপথ আছন্ন করিলেন।' (লঙ্কাকাণ্ড, ৮০ সর্গ)

খাণ্ডবদাহনের সময় অর্জুন ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। ইন্দ্র তাঁর তীক্ষ্ণ অস্ত্র ছুড়েছেন অর্জুনের উদ্দেশ্যে। তখন—'প্রতিবিধানক্ষম অর্জ্জুন সেই সমস্ত নিরাকরণের নিমিত্ত উত্তম বায়ব্য অস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে ইন্দ্রের সেই অশনি ও মেঘগণের বীর্য্য ও তেজ নিহত হইল এবং জলাধার সকল পরিশুষ্ক ও বিদ্যুৎ-সমূহ বিনষ্ট হইয়া গেল।' (মহাভারত, আদিপর্ব ২২৮ অধ্যায়)

দেখা যাচ্ছে রহস্যময় অস্ত্র ছোড়ার আগে 'অভিমন্ত্রিত' করে নেওয়া হচ্ছে। এই 'অভিমন্ত্রিত' করার ব্যাপারটি কি? সঠিক কিছু বলা এই মুহূর্তে সম্ভব না হলেও একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নিশ্চয় দেওয়া যায়। এই সব রহস্যময় দৈবী, ব্রাহ্ম, বায়ব্য অস্ত্রগুলির ধ্বংসাত্মক শক্তি যে অপরিসীম তার বর্ণনা আমরা পেয়েছি। বেদাধ্যয়ন, কঠোর তপস্যা, সংযম, সেবা প্রভৃতির সাহায্যে দেবতা বা গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তবেই এই সব অস্ত্রের 'প্রয়োগ ও উপসংহার' শেখা সম্ভব হত। অর্থাৎ এই সব রহস্যময় ভয়াবহ অস্ত্রের ব্যবহার শেখা কেবলমাত্র highly trained technical personnel-দের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

এই সব বিধ্বংসী দৈবী, ব্রাহ্ম ও বায়ব্য অস্ত্রশস্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট অনেকাংশে আমাদের পরমাণু বোমা ও গাইডেড-মিসাইলের মতো। এ ছাড়া বার বার অভিমন্ত্রিত করার কথা দেখে এই কথাই মনে আসে যে দেবতাদের বিধ্বংসী অস্ত্রগুলিও কমপিউটার চালিত ছিল। অভিমন্ত্রিত অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কমপিউটারের প্রোগ্রামিং-এর কাজ শেষ হত এবং অস্ত্রটি চালকের ইচ্ছামত কাজ করত। আমাদের গাইডেড মিসাইলগুলিও চালকের নির্দেশমত একটি নির্দিষ্ট ধ্বংসকার্য সম্পন্ন করে। হনূমান, নল ও গরুড়ের সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা লক্ষ্য করেছি কমপিউটার ব্যবহারের সম্ভাবনা সেখানে কত প্রবল। অভিমন্ত্রিত করে অস্ত্রের ভিতরের ক্ষুদে কমপিউটারকে activate করতে না পারলে এ সব অস্ত্র কোন কাজই করে না। তাই আমরা দেখি—'ব্রহ্মাস্ত্র স্বয়ম্ভূদৈবত প্রভৃতি নানাবিধ মন্ত্রদ্বারা পুত হইলেই সিদ্ধ হয়।' (লঙ্কাকাণ্ড, ৪৮ সর্গ) এই কারণেই দেখি গুরু বা

দেবতারা শিষ্যকে বা শরণাগতকে অস্ত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের 'প্রয়োগ ও উপসংহার' শিখিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ তারা অস্ত্রগুলিকে activate করার সাংকেতিক প্রোগ্রামিংটাও শিখিয়ে দিচ্ছেন।

বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখুন—রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৯১ সর্গে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের মধ্যে প্রাণান্তকর যুদ্ধ হচ্ছে। দুজন দুজনকে বধ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। অস্ত্রের পর অস্ত্র চালাচালি হচ্ছে। অবশেষে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করবার জন্য একটি ভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ করলেন। 'উহার পর্ব্ব ও পত্র অতি সুন্দর; উহা অনুক্রমে বর্ত্তুল; স্বর্ণমণ্ডিত; আশীবিষ সর্পের বিষের মত উহার বেগ অসহ্য; উহা রাক্ষসগণের ভীতিপ্রদ, এমন কি প্রাণান্তকর; ইন্দ্রজিতের কালস্বরূপ। দেবগণ উহার পূজা করিতেন। পূর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রামে মহাতেজস্বী ইন্দ্র উহারই সাহায্যে দৈত্যজয় করিয়াছিলেন। ঐ অস্ত্রের নাম ঐন্দ্র, উহা যুদ্ধে কখনও ব্যর্থ হয় নাই। লক্ষ্মীবান সৌমিত্রি ধনুতে ঐ বাণ যোজনা করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনের জন্য ঐ অস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দাশরথি রাম যদি ধার্ম্মিক সত্যবাদী এবং পৌরুষ-বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাহা হইলে তুমি এই রাবণ-তনয়কে বিনাশ কর। পরবীরনিষূদন বীর লক্ষ্মণ এই বলিয়াই সেই ঋজুগামী ঐন্দ্র অস্ত্রকে আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক রণমধ্যে ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্রজিতের কিরীটকুণ্ডলাকৃত সুচারু মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল।'

অস্ত্র কি জীবন্ত মানুষ! যে লক্ষ্মণ তাকে সম্বোধন করে নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা বললেন আর অমনি অস্ত্র তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল? তা নয়, লক্ষ্মণ অস্ত্রের ভিতরকার কমপিউটারকেই activate করলেন। মুখের কথায় কমপিউটারকে নির্দেশ দেওয়া যে কোন অসম্ভব ব্যাপার নয় তা আজ আমরা জানি। আর এই মৌখিক নির্দেশই হচ্ছে মন্ত্র বা প্রোগ্রামিং।

পুরাকালের অভিনব চিকিৎসা বিদ্যা!

বহু কাল পূর্বে অযোধ্যায় সগর নামে জনৈক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। কেশিনী ও সুমতি নামে তাঁর দুই রাণী ছিল। অপুত্রক রাজা সন্তান কামনায় দুই রাণীকে নিয়ে হিমালয়ে ভৃগুমুনির অধিষ্ঠিত প্রস্রবণের কাছে বসে বহু দিন তপস্যা করলেন। ভৃগু সন্তুষ্ট হয়ে রাণীদের বর চাইতে বললেন। তখন কেশিনী বললেন আমার যেন একটি পুত্র হয়, সুমতি চাইলেন ষাট হাজার পুত্র। সগর রাজা ভৃগুমুনিকে প্রণাম করে রাণীদের নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন। বেশ কিছু কাল বাদে কেশিনীর অসমঞ্জ নামে একটি পুত্র হল। 'সুমতিও তুম্বাকার একটি গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন। সেই তুম্ব ভেদ করিয়া ষষ্টিসহস্র পুত্র নির্গত হইল। তখন ধাত্রীগণ সেই ষষ্টিসহস্র পুত্রদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে রাখিযা সংবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন, পরে ক্রমশঃ দীর্ঘকালে সগরের সেই ষষ্টিসহস্র পুত্র রূপযৌবনশালিনী হইয়া উঠিল।' (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৩৮ সর্গ)

মহাভারতের আদিপর্বে (১১৫ অধ্যায়) আমরা পাই আরো কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। গান্ধারী কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সেবা করায় খুশি হয়ে দ্বৈপায়ন গান্ধারীকে বর দিয়েছিলেন, যে তাঁর একশো পুত্র হবে। গান্ধারী সময়মত গর্ভধারণ করলেন কিন্তু দু'বছরের মধ্যেও সন্তানাদি কিছুই হল না। ইতিমধ্যে কুন্তীর পুত্র হয়েছে জানতে পেরে গান্ধারীর নিজের গর্ভ সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিল। কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি নিজের পেটে আঘাত করলেন।—'তাহাতে দুই বৎসরের সেই গর্ভ সংহত লৌহপিণ্ডের ন্যায় মাংসপেশীরূপে ভূমিষ্ঠ হইল।' গান্ধারী সেই মাংসপিণ্ড ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু দ্বৈপায়ন সে কথা জানতে পেরে গান্ধারীর কাছে ছুটে এলেন এবং গান্ধারীকে বকাবকি করলেন। গান্ধারী তখন বললেন কুন্তীর ছেলে হয়েছে তাই মনের দুঃখে আমি পেটে আঘাত করেছি। আপনি বর দিয়েছিলেন আমার শতপুত্র হবে, এখন দেখুন, তার বদলে এই মাংসপিণ্ড জন্মেছে। ব্যাস বললেন আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না। যা বলেছি তাই হবে—

এখন, 'ঘৃতপূর্ণ একশত কুম্ভ শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া নিভৃতস্থানে উত্তমরূপে রক্ষা কর এবং শীতল সলিলদ্বারা এই মাংসপেশী সিক্ত কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অনন্তর জলাভিষেক করিতে করিতে সেই মাংসপেশী বহুধা বিদীর্ণ হইল। তাহার প্রত্যেক খণ্ড অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ হইয়া কালক্রমে একশত সংখ্যায় বিভক্ত হইল। অনন্তর ঐ সকল মাংসপেশীখণ্ড ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে স্থাপিত হইয়া সুগুপ্তস্থানে উত্তমরূপে পরিরক্ষিত হইতে লাগিল। ভগবান ব্যাস তখন সুবলাত্মজাকে কহিলেন যে এতাবৎকালে অর্থাৎ দুই বৎসর পরে এই সমস্ত কুম্ভ উদ্‌ঘাটন করিবে। ধীমান ভগবান দ্বৈপায়ন, ইহা কহিয়া সেই সমস্ত গর্ভ সংস্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তপস্যার নিমিত্ত হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর যথাকালে সেই সকল মাংসপেশীখণ্ডের মধ্যে প্রথমত দুর্য্যোধন ভূপতির জন্ম হইল।'

কাহিনী দুটির মধ্যে কোন গরমিল আছে কি? ব্যাসদেব কি বাল্মিকী থেকে ঘটনাটি চুরি করেছিলেন? কিন্তু ব্যাসদেবের বর্ণনা যে আরও বিশদ। আসলে এ রকম টেস্ট টিউব শিশু তৈরিতে পুরাকালের বিজ্ঞানীরা হয়তো পারদর্শী ছিলেন। সেই পদ্ধতির কথা দুজনেই উল্লেখ করেছেন। কেউ কারো নকল করেন নি। নিসিক্ত ভ্রূণ টেস্ট টিউবে রেখে সন্তান উৎপাদনের কথা আমাদের কালের বিজ্ঞানীরা মোটেও অবাস্তব বলে মনে করেন না। তার প্রথম ধাপ হিসেবে এই তো কিছু দিন আগেই লণ্ডনে ও কলকাতায় নলজাতিকাদের আবির্ভাব ঘটে গেছে।

রাজা উপরিচর মৃগয়ায় গিয়ে অশোক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছেন এমন সময় তাব রেতঃস্খলন হল। রাজা 'ঐ স্খলিত রেত বৃক্ষপত্রে ধারণ করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে কিরূপে আমার এই স্খলিত রেত ও পত্নীর ঋতু ব্যর্থ না হয়; পরে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, আমার এই রেত অব্যর্থ এবং মহিষীর নিকট ইহা প্রেরণ করিবার কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কোন প্রকারে ইহা প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর সূক্ষ্মধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ রাজা

উপরিচর এইরূপ স্থির করিয়া মন্ত্রদ্বারা সেই শুক্রের সংস্কার করিয়া সমীপবর্ত্তী শীঘ্রগামী এক শ্যেনপক্ষীকে কহিলেন, হে সৌম্য। তুমি আমার উপকারার্থ এই মদীয় শুক্র আমার অন্তঃপুরে লইয়া যাও, অদ্য গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়াছে, তাহাকে ইহা প্রদান কর।' (মহাভারত, আদিপর্ব, ৬৩ অধ্যায়)

শুক্র সংরক্ষণ করা সম্ভব কি ?

সম্প্রতি কলকাতাতেই ডঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে নলজাতিকার জন্ম দিয়েছেন (কলকাতায় এখনো তর্ক-বিতর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে এর সত্যতা নিয়ে) সেই উদ্দেশ্যেই তিনি শুক্র-নিসিক্ত ডিম্বকোষ তরল নাইট্রোজেনের মধ্যে ৫৩ দিন রেখেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। এরপর ওই সংরক্ষিত ডিম্বকোষ জরায়ুতে সংস্থাপন করা হয়। শুক্র-নিষিক্ত ডিম্বকোষকে যদি ৫৩ দিন সংরক্ষণ করা যায় তাহলে কেবলমাত্র শুক্রকেও বেশ কিছুকাল সংরক্ষণ করা নিশ্চয় সম্ভব। রাজা উপরিচর আবার ছিলেন সূক্ষ্মধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ শুক্র সংরক্ষণ করার মতো প্রযুক্তিগত জ্ঞান তার ছিল বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। শুক্রের সংস্কার করেই তা তিনি মহিষীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

ভীষ্ম শিখণ্ডীর হাতে নিহত হন। এই শিখণ্ডীর কাহিনী বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। দ্রুপদরাজা পুত্রলাভ ও ভীষ্মকে বধ করার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। শঙ্কর দ্রুপদরাজের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলেন, 'তোমার স্ত্রী অথচ পুরুষ এরূপ এক সন্তান হইবে।' (মহাভারত উদযোগপর্ব, ১০৯ অধ্যায়)

রাজমহিষীর সর্বাঙ্গসুন্দর একটি কন্যা হল ; কিন্তু রাজা ও রাণী পরামর্শ করে প্রচার করলেন যে তাদের একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। যাই হোক শিখণ্ডী বড় হল। তখন দ্রুপদরাজ দশর্ণাধিপতি হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে শিখণ্ডীর বিয়ে দিলেন। এর পর সব জানাজানি হয়ে গেল। হিরণ্যবর্মা রাজা দ্রুপদের উপর খুব রেগে গিয়ে দূত পাঠিয়ে জানালেন যে তিনি যুদ্ধে দ্রুপদরাজাকে নিধন করবেন। শিখণ্ডী লজ্জায় বনে চলে গেলেন। সেই বনে স্থূণাকর্ণ নামে কুবেরের এক যক্ষ বন্ধু বাস করত।

সেই যক্ষ শিখণ্ডীর সব কথা শুনে বলল—ঠিক আছে, কিছু সময়ের জন্য আমি তোমার স্ত্রীরূপ গ্রহণ করে তোমাকে পুরুষ করে দিতে পারি তবে নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে তোমাকে ফিরে এসে তোমার নারীত্ব ফিরিয়ে নিতে হবে এবং আমার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে। শিখণ্ডী রাজি হলেন। এরপর—'তাহারা উভয়েই তদ্বিষয়ে শপথ করিল এবং পরস্পর লিঙ্গ সংক্রামণ করিল। স্থূণাকর্ণ স্ত্রীলিঙ্গ ধারণ করিল এবং শিখণ্ডী সেই প্রদীপ্ত যক্ষরূপ প্রাপ্ত হইল।' (মহাভারত, উদযোগপর্ব, ১৯৪ অধ্যায়)

শল্য চিকিৎসার সাহায্যে পুরুষ থেকে নারী এবং নারী থেকে পুরুষ সৃষ্টি তো আমাদের কালে আখচার ঘটছে। তবে এরা সন্তান উৎপাদন করতে পারে না। শিখণ্ডীরও কোন সন্তানাদি ছিল বলে আমরা জানি না। সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে এই যে নির্দিষ্ট সময়ের পরে শিখণ্ডী যক্ষের কাছে ফিরে এলেও সেই 'সঙ্কল্পসিদ্ধ খেচর যে যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে' সে ও আর শিখণ্ডীর পুরুষত্ব ফিরিয়ে নিতে পারে নি। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল না!কি কুবেরের অভিশাপ। সুতরাং এর পর শিখণ্ডী যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি পুরুষ হয়েই বেঁচে ছিলেন।

রাজা বৃহদ্রথের দুই রাণী দশ মাস গর্ভধারণ করার পর দুজনে 'দুই খণ্ড শরীর প্রসব করিলেন এবং উহাদের প্রত্যেকের এক চক্ষু, এক বাহু, এক চরণ, অর্দ্ধমুখ, অর্দ্ধউদর ও অর্দ্ধস্ফিক অবলোকন করিয়া উভয়ে ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন।' ধাইরা ওই দুখণ্ড দেহ কাপড়ে মুড়ে ফেলে দিল, তখন জরা নামে এক রাক্ষসী 'ঐ প্রক্ষিপ্ত দেহখণ্ডদ্বয় গ্রহণ করিল ঐ রাক্ষসী তখন বিধিবল-প্রেরিতা হইয়া সহজে বহন করিবার আশায় সেই উভয় শরীরখণ্ড একত্র করিল। হে পুরুষর্ষভ! ঐ অর্দ্ধকলেবর যুগল পরস্পর সংযোজিত হইবামাত্র এক-মূর্ত্তিধারী এক বীরকুমার হইল।' (মহাভারত, সভাপর্ব, ১৭ অধ্যায়) এই কুমারের নাম জরাসন্ধ। বিরাট পালোয়ান ছিল সে, যাকে কৃষ্ণ পর্যন্ত ভয় করতেন এবং এরই ভয়ে মথুরা থেকে পালিয়ে চলে গিয়েছিলেন দ্বারকায়।

এ রকম ঘটনা আমাদের শল্য চিকিৎসকরা এখনো ঘটাতে পারেন নি বটে তবে ভবিষ্যতে যে করতে পারবেন না এ কথা কি জোর করে বলা যায়?

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর ক্রুদ্ধ রাবণ ময়দানব নির্মিত অষ্টঘণ্টাযুক্ত শক্তি নিক্ষেপ করলেন লক্ষ্মণের উপর। লক্ষ্মণ শক্তিহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন সুষেণ হনুমানের সাহায্যে বিশল্যকরণী প্রভৃতি ওষুধ এনে লক্ষ্মণকে সুস্থ করে তুলেছিলেন।

পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৭ দিন সময় লেগেছিল কিন্তু মৃতদেহ অবিকৃত ছিল। (মহাভারত, আদিপর্ব ১২৬ অধ্যায়)

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৮৮ সর্গে দেখি এক ব্রাহ্মণ তার মৃত পুত্রকে রামের কাছে এনে জিজ্ঞাসা করছেন কার পাপে এই শিশু মারা গেছে? রাম কারণ অনুসন্ধান করতে যাওয়ার আগে লক্ষ্মণকে বললেন, 'বালকের মৃতদেহ তৈলদ্রোণীমধ্যে রাখ। বালকের দেহ যেন নষ্ট হইয়া না যায়; তুমি সুগন্ধী তৈল এবং দিব্য গন্ধ দ্বারা তাহা উত্তমরূপে রক্ষা কর। শুভাচারসম্পন্ন বালকের মৃতদেহ যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তুমি তাহার উপায় কর। এবং যাহাতে বালকের সৌন্দর্য্যাদি নষ্ট এবং অঙ্গসন্ধিসকল শিথিল না হয়, তাহারও উপায় কর।'

এই দুটি ঘটনা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে মৃতদেহ বেশ কিছুদিন অবিকৃত রাখার কৌশলও দেবতারা জানতেন।

মহাভারতের আদিপর্বের যযাতি উপাখ্যান অনেকেরই জানা। এই কাহিনীর মধ্যে একটি রহস্য লুকিয়ে আছে। রাজা যযাতি শ্বশুর শুক্রাচার্যের শাপে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বিষয় ভোগের বাসনা শেষ না হওয়ায় তিনি ছেলেদের ডেকে বললেন তোমরা কেউ আমার জরা নিয়ে তোমাদের যৌবন আমাকে দাও। বিষয়ভোগ শেষ করে আবার আমার জরা আমি ফিরিয়ে নেব। একমাত্র ছোট ছেলে পুরু ছাড়া কেউ যযাতির কথায় রাজী হল না। যযাতি খুশি হয়ে বললেন, 'হে বৎস পুরো! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, প্রীতমনে এই বর প্রদান

করিতেছি যে, তোমার রাজ্যে প্রজাগণ সর্ব্বকামসমৃদ্ধ হইবে। মহাতপা যযাতি ইহা কহিয়া শুক্রকে স্মরণপূর্ব্বক পুরু নামক মহাত্মা পুত্রেতে জরা সংক্রামিত করিলেন।'

যযাতি শুক্রকে স্মরণ করে তবে পুরুর দেহে জরা সংক্রামিত করলেন। রহস্য এখানেই। এখানটাই আমাদের একটু ভেবে দেখতে হয়। যযাতি যদি শুক্রকে স্মরণ না করে এই ঘটনা ঘটাতেন তাহলে এই ঘটনা ভোজবাজি বলে উড়িয়ে দিতে পারতাম অথবা দৈবী মহিমা বলে ভক্তি গদগদ হয়ে উঠতাম, কিন্তু গণ্ডগোল বাধাল শুক্রের নামটা। শুক্র কেন? কারণ শুক্রাচার্য হচ্ছেন দানবদের কুলগুরু। তিনি এমন একটি বিদ্যা জানতেন যা দেবগুরু বৃহস্পতিও জানতেন না। এই বিদ্যা হচ্ছে মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার অর্থাৎ সঞ্জীবনী বিদ্যা। 'বীর্য্যবান শুক্র যে সঞ্জীবনী বিদ্যা অবগত ছিলেন, বৃহস্পতি তাহা জানিতেন না।' তিনি যুদ্ধে মৃত দানবগণকে এই বিদ্যার বলে বাঁচিয়ে তুলতেন। যে বিদ্যা গোপনে শিখে নেওয়ার জন্য দেবতারা বৃহস্পতির ছেলে কচকে শুক্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

যাই হোক যা বলছিলাম, রাজা যযাতি গোপনে শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর দাসী দানবরাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠাকেও বিয়ে করেছিলেন। এ কথা জানতে পেরে দেবযানী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাবাকে সব কথা বলে দেন। সব শুনে শুক্রাচার্য 'রোষপরবশ হইয়া শাপ প্রদান করিলে নহুষ-নন্দন যযাতি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব-বয়স পরিত্যাগ পূর্ব্বক বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইলেন ; তখন তিনি কহিলেন হে ভৃগূদ্বহ! আমি যৌবনাবস্থায় দেবযানীতে পরিতৃপ্ত হই নাই, হে ব্রহ্মণ! আপনি প্রসন্ন হউন যে, এই জরা যেন আমাতে প্রবিষ্ট হইতে না পারে। শুক্র কহিলেন, ভূমিপাল! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, তুমি জরাগ্রস্থ হইয়াছ, তবে ইচ্ছা করিলে এই জরাকে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রমণ করিতে পারিবে। যযাতি কহিলেন হে ব্রহ্মণ! আমার যে পুত্র তাহার স্বীয় যৌবন আমাকে প্রদান করিবে, সেই পুত্রই রাজ্যভাগী, পুণ্যভাগী ও কীর্ত্তিভাগী হইবে, ইহা আপনি অনুমতি করুন। শুক্র কহিলেন নহুষাত্মজ! তুমি

এককভাবে আমাকে ধ্যান করিয়া ইচ্ছানুসারে জরাকে সংক্রমিত করিবে।'

এই জরা সংক্রমণের ব্যাপারে দানবগুরুর নিশ্চয় কোন হাত ছিল। যিনি সঞ্জীবনী বিদ্যার বলে মড়া বাঁচাতে পারেন, তিনি নিশ্চয় অনন্ত যৌবন লাভের উপায় জানতেন এবং জরা থেকে রক্ষা করাও তার পক্ষেই সম্ভব। তবে যযাতির যৌবন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য একজন যুবকের প্রয়োজন হয়েছিল। তা কি কোন শল্য চিকিৎসার জন্য? পুরু যযাতির জরা নিতে রাজি হলে, 'রাজর্ষি যযাতি তপস্যা ও বীর্য্যবলে ঐ মহাত্মা পুত্রেতে জরা সঞ্চারিত করিলেন।' 'তপস্যা ও বীর্যবলে' জরা সংক্রামিত করা হয়েছিল বলেই সন্দেহ হয় যে এর সঙ্গে খুব সম্ভবত শল্য চিকিৎসার কোন যোগাযোগ ছিল।

বার্ধক্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানীরা তো উঠে পড়ে লেগেছেন। বার্ধক্যজনিত মুখের বলিরেখা ও বাড়তি ঝুলে পড়া মাংস অপারেশনের সাহায্যে সরিয়ে মুখে যৌবনের লালিত্য ফিরিয়ে আনা তো আমেরিকায় এখন অতি সাধারণ ঘটনা। তবে তাতে কেবলমাত্র মুখের সৌন্দর্যটুকুই বাড়ে। আর এর জন্য অন্য কোন যুবক-যুবতীর দেহ থেকে কিছু নেওয়ার দরকারই পড়ে না। আমাদের বিজ্ঞানীরাও হয়তো একদিন জরাকে পরাজিত করতে পারবেন—আর সেদিন হয়তো অন্য কোন যুবক যুবতীর দেহের কিছু কিছু অংশের প্রয়োজন হবে। আর তখনই আমরা এই জরা সংক্রমণের রহস্য আরো পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারব।

শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যা জানতেন। অমৃত বা মৃতসঞ্জীবনী সুধা তৈরির গল্প-কাহিনী প্রাচীন কিমিয়বিদ্‌দের (Alchemist) জীবনী আলোচনা করতে গিয়েও আমরা দেখতে পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর কাউন্ট দ্য সেন্ট জারমেইন ছিলেন একজন কিমিয়বিদ্, যদিও নিজেকে তিনি রসায়নবিদ বলে প্রচার করতেন। ফরাসী সম্রাট পঞ্চদশ লুই জারমেইনের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ভল্‌তেয়ার জারমেইন সম্বন্ধে বলেছেন 'তিনি একজন সর্বজ্ঞ ব্যক্তি।'

জারমেইন নাকি এমন এক ওষুধ তৈরি করতে পারতেন যার সাহায্যে অনন্তকাল যৌবন ধরে রাখা যেত। জারমেইনের নিজের বয়স সম্বন্ধেও বহু রহস্যময় গল্প প্রচলিত আছে। কারো মতে তার বয়স ১২৪ বছর হয়েছিল, কারো মতে ১৬১ বছর বেঁচে ছিলেন জারমেইন।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট জারমেইন-এর 'অনন্তযৌবন' লণ্ডনে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল সে সম্বন্ধে 'লণ্ডন ক্রনিকল' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ এই রকম : প্রথমে যা মিথ্যে কল্পনা বলে মনে হয়েছিল এখন সেটা আর কেউ অবিশ্বাস করে না। অন্যান্য গুপ্তবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সর্বরোহগহর ওষুধ এবং দেহের ওপর সময়ের যে ছাপ পড়ে তা দূর করার ওষুধও তার কাছে আছে। (জারমেইনের কাহিনী Andrew Tomas এর We are not the first বই থেকে সংগৃহীত)

শুক্রাচার্যও যে একজন রসায়নবিদ বা কিমিয়বিদ্ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি অভিশাপ (!) বা কোন ওষুধের সাহায্যে হয়তো যযাতিকে জরাগ্রস্ত করে ফেলেছিলেন, আবার তিনিই যযাতির জরা পুরুতে সংক্রমিত করে যযাতির যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কোন অলৌকিক ঘটনাই নয়।

ব্যাসদেব রহস্য !

মহাভারতকার ব্যাসদেব একটি রহস্যময় চরিত্র। আদিপর্বের ৬০ অধ্যায়ে উগ্রশ্রবা ব্যাসদেবের যে জন্ম বৃত্তান্ত দিয়েছেন তা এই— 'শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর কন্যাকালেই তাঁহার গর্ভে যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যে মহাযশা মহর্ষি জন্মমাত্র তৎক্ষণাৎ দেহবৃদ্ধি করিয়া বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়াছিলেন। * * * পরাৎপর পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞ, সত্যব্রত, অতীতদর্শী, শুদ্ধাচার, বেদবিশারদ যে ব্রহ্মর্ষি এক বেদ চতুর্দ্ধা বিভাগ করিয়াছিলেন; পুণ্যকীর্তি মহাযশা যে মহর্ষি শান্তনুর বংশ রক্ষার্থ পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের জন্ম দিয়াছিলেন।'

এই সংক্ষিপ্ত জন্ম বৃত্তান্তের ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর রহস্য। সে রহস্য ভেদ করতে পারলেই সন্ধান পাওয়া যাবে দেবতাদের এক কূটনীতির, যে কূটনৈতিক কারণে তারা বেছে নিয়েছিলেন বেদব্যাসকে। কৌশলে নিজের জন্ম বৃত্তান্তের মধ্যে যার সূত্র রেখে গেছেন বেদব্যাস ভবিষ্যতের বুদ্ধিমান মানুষদের জন্যে।

আদিপর্বের ৬৩ অধ্যায়ে যে বিশদ বিবরণ আছে সেটুকু একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক—

'একদা মৎস্যগন্ধা (সত্যবতী) পিতার আজ্ঞাক্রমে নৌকাবাহন কার্য্যে নিযুক্তা আছেন, এমত সময় তীর্থ-যাত্রায় বহির্গত ধীমান পরাশর ঋষি তাঁহাকে দেখিলেন এবং অতিশয় রূপবতী সিদ্ধগণেরও প্রার্থিতা রম্ভোরু মধুরহাসিনী মনোরমা সেই বসুকন্যাকে দেখিবামাত্র মুনিবর এককালে কামাভিভূত হইলেন এবং কহিলেন, হে কল্যাণি! আমার মনোরথ পূর্ণ কর। কন্যা কহিলেন, হে ভগবন! দেখুন নদীর উভয় পারে ঋষিগণ আছেন, তাঁহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন, অতএব এখন কিরূপে আমাদের সঙ্গম হইতে পারে? মৎস্যগন্ধা এরূপ আপত্তি করাতে প্রভু ভগবান পরাশর কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিলেন; তখন সমুদয় দেশ অন্ধকারাবৃতের ন্যায় হইল। অনন্তর

মহর্ষিকর্ত্তৃক সৃষ্ট নীহার সন্দর্শন করিয়া তপস্বিনী কন্যা বিস্মিতা ও লজ্জাভিভূতা হইলেন। পরে সত্যবতী কহিলেন, হে ভগবন্! আমি পিতৃবশবর্ত্তিনী কন্যা, আমার বিবাহ হয় নাই। হে অনঘ! আপনার সহিত সমাগমে আমার কন্যাভাব দূষিত হইবে। হে দ্বিজোত্তম! কন্যাভাব দূষিত হইলে আমি কি প্রকারে গৃহে যাইব? হে ধীমন ঋষে! আপনি ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। কন্যা এরূপ কহিলে ঋষি প্রীত হইয়া কহিলেন, আমার সহযোগে তোমার কন্যাভাব দূষিত হইবে না; হে ভীরু! তোমার যাহা অভিলাষ হয়, বর প্রার্থনা কর। পরাশর এই বাক্য কহিলে মৎস্যগন্ধা স্বীয় গাত্রে উত্তম সৌগন্ধ্য প্রার্থনা করিলেন। মুনি 'তথাস্তু' বলিয়া সেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর সত্যবতী ঋষি-প্রভাবে ঋতুমতী ও প্রার্থিত বরলাভে সন্তুষ্ট হইয়া অদ্ভুতকর্ম্মা পরাশর ঋষির সহিত সঙ্গম করিলেন। তদবধি মৎস্যগন্ধার 'গন্ধবতী' এই নাম ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইল। মনুষ্যগণ এক যোজন দূর হইতেও তাঁহার গাত্রগন্ধ আঘ্রাণ করিত, এই নিমিত্ত তাঁহার 'যোজনগন্ধা' এই নামও প্রথিত হইয়াছিল। সত্যবতী এইরূপে উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে পরাশরের মনোরথ পূরণপূর্ব্বক সদ্যগর্ভধারণ করিয়া প্রসব করিলেন। তাহাতে বীর্য্যবান পরাশর-নন্দন যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি জন্মমাত্র মাতার অনুমতি লইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত মনোনিবেশ করিলেন।'

আশা করি এই গল্পের মধ্যে কতগুলি অবিশ্বাস্য ব্যাপার আপনারা লক্ষ্য করেছেন। নিজের জন্মবৃত্তান্ত ঘিরে তিনি যেন সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাস-কূট সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু কেন?

অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলি সাজিয়ে নেওয়া যাক।

(১) পরাশরের মতো একজন মহর্ষি তীর্থ পর্যটনের পথে একটি ধীবর-কন্যাকে দেখে কামাভিভূত হলেন

(২) কাম চরিতার্থ করবার জন্য তিনি কুয়াশা সৃষ্টি করে সমুদায় দেশ অন্ধকারাবৃত করে ফেললেন

(৩) ঋষি সত্যবতীর গায়ে এমন সুগন্ধ সৃষ্টি করলেন মানুষ একযোজন দূর থেকেও যার গন্ধ পেত

(৪) ঋষি প্রভাবে অকালেও সত্যবতী ঋতুমতী হলেন

(৫) ঋষির সঙ্গে সঙ্গম করে সন্তান ভূমিষ্ঠ করার পরও সত্যবতীর কন্যাভাব দূষিত হল না

(৬) সঙ্গম হল নৌকার উপর। আর সঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গে সত্যবতী সদ্য গর্ভধারণ করে সদ্য প্রসব করলেন। অথচ সন্তান ভূমিষ্ঠ হল যমুনাদ্বীপে

(৭) জন্মমাত্রই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তপস্যা করতে চলে গেলেন।

ব্যাসদেবের জন্মবৃত্তান্ত ঘিরে এতগুলি অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ কেন ঘটানো হল? ঘটানো হল একটি সত্যকে গোপন করার জন্য। কি সেই সত্য? আসুন, একটু কল্পনা করে দেখা যাক।

পরাশর জ্ঞানী মহর্ষি। দেবতাদের সঙ্গে তার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা। দেবতারা পরাশরকে বললেন বিশেষ একটি কাজের জন্যে তাদের একজন পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু একজন সাধারণ অসভ্য পৃথিবীর মানুষ কি দেবতাদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে? তার জন্য কোন চিন্তা নেই। ওর মগজে একটি ছোট অস্ত্রোপচার করে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর এই কাজটিও পরাশরকেই করতে হবে। অস্ত্রোপচার করার কলা-কৌশল অবশ্য দেবতারাই শিখিয়ে দেবেন পরাশরকে। পৃথিবীর মানুষ পরাশরকে ভালো করে চেনে। সুতরাং তিনি একটি লোককে বেছে নিয়ে অস্ত্রোপচার করলে কোন হাঙ্গামা হবে না। পরাশর রাজী হলেন। দেবতারা অস্ত্রোপচারের কৌশল শিখিয়ে দিলেন পরাশরকে।

পরাশর খুঁজে পেতে একজনকে বেছে নিয়ে শিষ্য করলেন। শিষ্যকে নিয়ে নানা তীর্থে ঘুরে বেড়ান পরাশর আর মনে মনে অস্ত্রোপচারের জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা খোঁজেন। অত বড় একজন মহর্ষির সঙ্গে একজন শিষ্য থাকা নিশ্চয়ই এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সশিষ্য ঘুরতে ঘুরতে ঋষি পরাশর এক দিন এক নির্জন খেয়াঘাটে এসে পৌছালেন। খেয়াঘাটে সত্যবতী নৌকা চালাচ্ছেন। এক নজর দেখেই পরাশর বুঝতে পারলেন, মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনই বুদ্ধিমতী। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে খুশি হলেন পরাশর। অস্ত্রোপচারে উপযুক্ত জায়গা। সত্যবতীকে যদি সহকারী নার্স হিসেবে পাওয়া যায় তাহলে আর কোন চিন্তাই থাকে না। অতএব ঋষি পরাশর সত্য-বতীকে সবকিছু খুলে বলে তার সাহায্য চাইলেন। মৎস্যগন্ধা খুবই চালাক মেয়ে। ভাবলেন সামান্য এই সহযোগিতাটুকু করলে দেবতারা সন্তুষ্ট হবেন, আখেরে লাভ ছাড়া লোকসান হবে না। সত্যবতী মেয়ে হয়েও কতখানি কূটনীতিজ্ঞা ছিলেন রাজা শান্তনুর মহিষী রূপে হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে তার কার্যকলাপই তার প্রমাণ।

যাই হোক সত্যবতী বা মৎস্যগন্ধা সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সর্তসাপেক্ষে ঋষি পরাশরের কথায় রাজী হয়ে গেলেন। গোপনীয় কাজ লোক চক্ষুর সামনে তো করা যায় না। মৎস্যগন্ধা পরাশরকে সাবধান করে দিলেন, নদীর দুই পারে ঋষিরা রয়েছেন। পরাশর সঙ্গে সঙ্গে যোগবলে (!) কুয়াশা সৃষ্টি করে যমুনাদ্বীপ ঢেকে ফেললেন। এবার অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হল। অস্ত্রোপচারের আগে সবকিছু বীজাণুমুক্ত করে নেওয়াই রীতিসম্মত। মৎস্যগন্ধার গায়ের দুর্গন্ধ সুগন্ধে পরিণত হল কি কোন তীব্র এ্যান্টিসেপটিকের গন্ধে? এই তীব্র গন্ধই কি লোকে এক যোজন দূর থেকেও পেত? যাই হোক, পরাশর অস্ত্রোপচার করলেন। এই অদ্ভুত কাজ করতে দেখেই ঋষি পরাশরকে অদ্ভুতকর্মা বলে মনে হয়েছিল সত্যবতীর। তারপর 'সত্যবতী এইরূপে উত্তম বরপ্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে পরাশরের মনোরথ পূরণপূর্ব্বক সদ্য গর্ভধারণ করিয়া প্রসব করিলেন।' পরাশর শিষ্য পরিবর্তিত হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নে। অস্ত্রোপচার সফল। তাই সদ্য গর্ভধারণ করেই সদ্য প্রসব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল। তাই সন্তান ভূমিষ্ঠ করেও সত্যবতীর কন্যাভাব দূষিত হল না। এবং জন্ম মাত্রই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তপস্যা করতে, বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস, দর্শন অধ্যয়ন করতে চলে গেলেন।

গল্পটা কি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে? এখনো একটি ধাঁধার উত্তর দেওয়া হয় নি। কেন দেবতাদের একজন বিশিষ্ট লোকের প্রয়োজন হয়েছিল? আসলে দেবতাদের প্রয়োজন হয়েছিল একজন শক্তিশালী লেখকের, যে লেখকের সাহায্যে দেবতারা প্রচার করবেন নিজেদের মহিমা! যে দেবমহিমা প্রচণ্ড ভাবে প্রভাবান্বিত করবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানুষদের। ফলে পরবর্তী কালে এখানে দেবতাদের অন্য কোন গোষ্ঠি এলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে পরিপূর্ণ ভাবে দেব-রাজত্ব কায়েম করাই ছিল দেবতাদের কূটনীতির মূল উদ্দেশ্য। এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একজন শক্তিশালী লেখকের তাই বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পরাশর হয়েছিলেন এ কাজের হোতা এবং সত্যবতী হয়েছিলেন উপলক্ষ্য।

দ্বৈপায়নের জ্ঞানের পরিধি কি রকম ছিল তা উগ্রশ্রবার মুখেই শোনা যাক—'দুর্গ, নগর, তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি সমুদায় জীবস্থান, ধর্ম্মরহস্য, অর্থরহস্য, কামরহস্য, বেদচতুষ্টয়, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এবং ধর্ম্মার্থকাম বিষয়ক নানাবিধ শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি সমুদায় সংসারযাত্রা বিধায়ক শাস্ত্র বেদব্যাস ঋষি জানিতেন।' এর আগে উগ্রশ্রবা আরো বলেছেন, 'তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, সন্তানোৎপাদন কি যজ্ঞদ্বারা কোন ব্যক্তিই যাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।'

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে চারভাগে ভাগ করে বেদব্যাস হলেন। আঠারোটি পুরাণ লিখলেন, আর আঠারোটি উপপুরাণ। যে পুরাণে দেহধারী দেবতাদের ছড়াছড়ি। দেবতাদের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করলে এখানেও একটি মিসিং লিঙ্ক লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদের দেবতা এবং পুরাণের দেবতাদের মধ্যে যেন বিরাট একটি ফাঁক। গবেষকরাই এ কথা বলে থাকেন।

এবার আরো একটি বড় কাজ করতে হবে বেদব্যাসকে। লিখতে হবে ইতিহাস। যে ইতিহাসে থাকবে 'বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, বেদ বেদাঙ্গ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ, বর্ত্তমান, ভূত,

ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের নিরূপণ, জরা, মৃত্যুভয়, ব্যাধিভাব ও অভাবের নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্মের ও বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের নানা পুরাণোক্ত আচারবিধি, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রতারা ও যুগচতুষ্টয়ের প্রমাণ, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, আত্মতত্ত্বনিরূপণ, ন্যায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, দানধর্ম্ম, পাশুপত ধর্ম্ম, এবং যিনি যে কারণে দিব্য বা মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার বিবরণ, পবিত্র তীর্থ, দেশ, নদী, পর্ব্বত, বন, সমুদ্র, দিব্যপুরী, দুর্গ, সেনাব্যূহ রচনাদি যুদ্ধকৌশল, বাক্য বিশেষ, জাতি বিশেষ, লোকযাত্রা বিধান, যিনি অখিল সংসার ব্যাপিয়া আছেন সেই পরমব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইবে।' (মহাভারত, আদিপর্ব)

বুঝুন কি অমানুষিক কাজ। এ কারণেই একজন অতিমানবের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু এ রকম ইতিহাস লিখতে গেলে তো ঐতিহাসিক ঘটনার প্রয়োজন। পৃথিবীতে তখন রাজা-রাজড়া কোথায়? পার্থিব মানুষ তো তখনো সভ্য হয়ে ওঠে নি। তাদের ইতিহাস কোথায়? রামায়ণ তো দেবতাদের গোষ্ঠি লড়াইয়ের ইতিহাস। সে ইতিহাস বিকৃত করে তো প্রচারধর্মী ও উদ্দেশ্যমূলক কিছু লেখা সম্ভব নয়। ঠিক আছে, সবই যখন ধার করা হচ্ছে দেবতাদের, তখন কাহিনীটাও না হয় ধার করা হোক। তাই নিজেদের গ্রন্থের এক গোষ্ঠি লড়াইয়ের কাহিনীও গ্রহণ করা হল।

স্বামী প্রভাবানন্দের 'The spiritual heritage of India' বই থেকে প্রমাণ দিচ্ছি: 'The germ of which (central story of the Mahavarata) is to be found in the Vedas—concerns a great dynastic war.'

এইবার কাহিনীর উপর রঙ চড়াও। তবে পটভূমি যেন তোমাদের পৃথিবীর হয়। মনে রেখো, ভবিষ্যতের মানুষ যেন বিশ্বাস করে এ ইতিহাস তাদেরই পূর্বপুরুষদের ইতিহাস। কেননা পৃথিবীর রাজা-রাজড়াদের গল্প পৃথিবীর মানুষকে বেশী আকর্ষণ করবে—এবং তার প্রভাব হবে অনেক বেশী। ফলে পুরাণকে নস্যাৎ করলেও পৃথিবীর

মানুষ মহাভারতকে নস্যাৎ করতে পারবে না। তাই খুব সাবধানে লিখবে। অতি সাবধানী হতে গিয়েই ব্যাসদেব মাঝে মাঝে পড়েছেন ফাঁপরে। সৃষ্টি করেছেন রহস্যের পর রহস্য—যার অপর নাম ব্যাসকূট। দেবতাদের এই কারসাজি তাকে মুখ বুজে মেনে নিতে হয়েছিল। তার অবচেতন মনে এই ক্ষোভটা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছিল, তাই মহাভারতের মধ্যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছেন তিনি বহু মূল্যবান, কিন্তু রহস্যাবৃত সূত্র।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, 'হে ব্রহ্মণ! যে সকল রাজগণের নাম কীর্ত্তন করিলেন এবং যাঁহাদের কীর্ত্তন করিলেন না, দেবতুল্য মহারথ সেই সমস্ত মহানুভবগণ যে কারণে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি; হে মহাভাগ! আপনি সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শ্রুত হইয়াছি, ইহা দেবগণের রহস্য; আমরা সম্প্রতি স্বয়ম্ভুকে প্রণাম করিয়া আপনার নিকট সেই দেবরহস্য কীর্ত্তন করি।' (আদিপর্ব, ৬৪ অধ্যায়)

মহাভারত রচনার আগে ব্রহ্মা এসে দেখা করলেন বেদব্যাসের সঙ্গে। বেদব্যাস ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন, 'হে ভগবান! আমি এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।' এবং সেই কাব্যে কি কি জিনিস থাকবে তাও তিনি বললেন।

ব্রহ্মা সব শুনে বেশ একটি মজার কথা বললেন। বললেন, 'তোমার রহস্যজ্ঞান থাকাতে তুমি দুষ্কর তপঃশালী, কুলশীলসম্পন্ন সমুদায় ঋষিকুল হইতে শ্রেষ্ঠতম; আমি জানি যে তুমি জন্মাবধি সত্য ও ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যই কহিয়া থাক, সুতরাং তুমি স্বপ্রণীত গ্রন্থকে (যখন) কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ তখন ইহা কাব্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইবে। * * * সমুদায় কাব্যের মধ্যে তোমার এই কাব্য শ্রেষ্ঠতম হইবে; কোন কবিই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে পারিবেন না।'

ব্যাসদেবকে দেবতারা নির্দেশ দিলেন ভারতের ইতিহাস লিখতে। কি ভাবে লিখতে হবে তাও বলে দেওয়া হল। তবু ব্যাসদেব ব্রহ্মার

কাছে মুখ ফসকে বলে ফেললেন, 'আমি এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।' কারণ বেদব্যাস ভালো করেই জানতেন যে তিনি ইতিহাস রচনা করছেন না। ইতিহাস তো সৃষ্টি হয় সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে, কিন্তু তিনি রচনা করছেন এক কল্প-কথা। অবচেতন মনের কারসাজিতেই তার মুখ থেকে ইতিহাস কথাটির বদলে বেরিয়ে এলো কাব্য কথাটি।

ব্রহ্মা আর কি করেন উপরোধে ঢেঁকি গিললেন। বললেন, ঠিক আছে, তুমি নিজেই যখন তোমার রচনাকে কাব্য বলছ, তখন তা কাব্য বলেই পরিচিত হবে। সত্যিই যদি মহাভারত পার্থিব মানুষদের ইতিহাস হত তাহলে কি ব্রহ্মা বেদব্যাসের কথা মেনে নিতে পারতেন? কাব্য আর ইতিহাস কি এক? পার্থক্যটুকু ব্রহ্মা নিশ্চয় জানতেন, কিন্তু নিজেরা যে বড় রকমের একটি জুয়োচুরি করছেন, 'অপরাধী মনোবৃত্তি' রয়েছে, তাই ব্যাসদেবের কথা মেনে নিতে তিনি বাধ্য হলেন। তাকে জোর করে বলতে পারলেন না যে এই রচনা ইতিহাস, কাব্য নয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে লেখা হল মহাভারত, পার্থিব পটভূমিতে ভিন্‌গ্রহী মানুষদের গল্প। পৃথিবীর আদি সায়েন্স-ফিকশান। আর আদি সায়েন্স-ফিকশান বা বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প-লেখক হলেন মহর্ষি বেদব্যাস।

কাব্য রচনা করছি বলেও আসলে দেবতাদের ইচ্ছাকে মোটেও কিন্তু উপেক্ষা করতে পারলেন না বেদব্যাস—তাই খুব নিপুণ ভাবে সৃষ্টি করলেন এক পার্থিব রাজকাহিনী বা ইতিহাস।

দেবতাদের ইচ্ছাই ফলবতী হয়েছে—এই কল্প-গল্পকে আমরা আমাদের ইতিহাস বলেই মেনে নিয়েছি। বেদব্যাস ভিন্‌গ্রহী দেব-গন্ধর্বদের ইতিহাস, বেদ, উপনিষদ, পরব্রহ্মতত্ত্ব ইত্যাদি সুন্দর ভাবে পৃথিবী বিশেষ করে ভারতবর্ষের পটভূমিতে ফেলে এমন ভাবে পার্থিব ইতিহাসের রূপ দিয়েছেন যে আমরা বোকা বনতে বাধ্য হয়েছি। মহাভারতের অলিখিত প্রধান ব্যাস-কূট হচ্ছে বোধ হয় এই ব্যাপারটি।

কথা শেষ, কিন্তু শেষ কথা নয়

তাহলে কি দাঁড়াল ?

দাঁড়াল এই যে দেবতা, রাক্ষস, অসুর, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ—সবাই একই গ্রহের উন্নত মানুষেরই বিভিন্ন গোষ্ঠী। এরা সকলেই নিজেদের গ্রহ ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। এদের নিজেদের গ্রহ কোথায় ছিল তা বলা মুশকিল, তবে খুব সম্ভব সে গ্রহের অস্তিত্ব ছিল আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে। সৌরমণ্ডলে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহেও হয়তো তাদের উপনিবেশ ছিল। হয়তো মঙ্গল কিম্বা শুক্রে অথবা মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী গ্রহে (যে গ্রহ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে আজ গ্রহানুপুঞ্জের রূপ নিয়েছে)। কেন এসেছিলেন তারা তা বলা আরো মুশকিল। হয়তো তাদের নিজেদের গ্রহ প্রাকৃতিক কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, হয়তো সে গ্রহের খনিজ সম্পদ শেষ হয়ে এসেছিল, অথবা হয়তো শুধুই মহাকাশ আবিষ্কারের লোভে তারা এসেছিলেন পৃথিবীতে।

প্রথমে যখন এই ভিন্‌গ্রহবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠি পৃথিবীর লেমুরিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করেন তখন তারা মিলে-মিশেই বসবাস করছিলেন। কালক্রমে রাক্ষস-গোষ্ঠি হয়ে উঠলেন প্রবল। আধিপত্য বিস্তার করতে চাইলেন তারা অন্যান্য গোষ্ঠির উপর, ফলে শুরু হল বিবাদ বিসম্বাদ।

ইতিমধ্যে লেমুরিয়াও ডুবতে শুরু করেছিল ভারত মহাসাগরের গর্ভে। সুতরাং আরম্ভ হল মাইগ্রেশান। অন্যান্য গোষ্ঠিরা লেমুরিয়া ছেড়ে চললেন নতুন জায়গার সন্ধানে।

দেবতারা ঠিক করলেন তারা একটি সুরক্ষিত জায়গার সন্ধান করবেন। এবং সেই সুরক্ষিত জায়গায় ঘাটি স্থাপন করে যোগাযোগ করবেন নিজেদের গ্রহের সঙ্গে। অবস্থা অনুকূল হলে নিশ্চয় সাহায্য পাবেন নিজেদের গ্রহ থেকে, তখন রাক্ষস গোষ্ঠিকে ধ্বংস করে পৃথিবীতে কায়েম করবেন দেব-রাজত্ব। খুঁজে পেলেন তারা হিমালয়।

খুব গোপনে চলতে লাগল তাদের কাজ। যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ কাজ; কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

অন্যান্য গোষ্ঠিরা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছেন মোহেঞ্জোদড়ো, হরাপ্পা, সুমের, ইস্টারদ্বীপ, অধুনালুপ্ত আটলান্টিস, এমন কি দক্ষিণ-আমেরিকায়। নিজেদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে তারা গড়ে তুলেছেন নতুন সভ্যতা। আদিম পার্থিব মানবগোষ্ঠিদের পদানত করতে মোটেও বেগ পেতে হয় নি তাদের।

দেবতারা হিমালয়ের সুরক্ষিত অঞ্চল থেকে ততদিনে যোগাযোগ ঘটিয়ে ফেলেছেন নিজেদের গ্রহেব সঙ্গে। সে সময় নিজেদের গ্রহেও খুব সম্ভবত দেব-গোষ্ঠিদেরই রবরবা চলছিল। অতএব সাহায্য আসতে দেরী হল না। রাক্ষসরাজ রাবণের ধ্বংসের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন দেবতারা। হিমালয়ে বসল গ্রহান্তের স্টেশন। কাজ চলতে লাগল খুব গোপনে।

পৃথিবীতে ততদিনে খুব সম্ভব বিবর্তনবাদের ধাপ বেয়ে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু তারা তখন সভ্যতার একেবারে প্রথম সিঁড়িতে পা রেখেছে মাত্র। বন্য শিকারী জীবন ছেড়ে সবে চাষবাস ও পশুপালন বিদ্যাটা শিখেছে।

দেবতারা বা বেদ সৃষ্টিকারী আর্যরা সংরক্ষিত এলাকার বাইরে ঘোরাফেরার জন্য এদেরই ছদ্মবেশ গ্রহণ করলেন। তাই আমরাও ঘুলিয়ে ফেললাম ঐতিহাসিক আর্যদের সঙ্গে দেবতাদের। যাযাবর আর্যদেরই আমরা চিনি যে। দেবতারা তো তখনো প্রকাশ করেন নি নিজেদের স্বরূপ। পৃথিবীর প্রাণীর আড়ালে আত্মগোপন করে কাজ হাসিল করায় তারা যে সিদ্ধহস্ত তা তো আমরা লক্ষ্য করেছি আগেই।

নিজেদের গ্রহে জ্ঞান বিজ্ঞানের আরো উন্নতি ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। জড়-বিজ্ঞান (যজ্ঞ ইত্যাদি) রূপ নিয়েছে অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা দর্শনে। তাই বেদ পেরিয়ে তারা চলে গেছেন উপনিষদে। খুঁজে ফিরছেন তারা বিশ্বের সর্বনিয়ন্তা সেই পরমপুরুষ পরমব্রহ্মকে।

এবার যারা এসে নামলেন হিমালয়ের গ্রহান্তর-স্টেশনে তারা নিয়ে এলেন উপনিষদ। প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের সময় তারা নিয়ে এসেছিলেন বেদ। ঐতিহাসিক প্রমাণ আমাদের হাতে নেই ঠিকই, কিন্তু তা না হলে আর্য-পূর্ব অনার্য রাক্ষসরাজ রাবণ বেদ-পারঙ্গম হতে পারতেন কি?

নিজেদের গ্রহ থেকে এলো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি, এলো কূটবুদ্ধি, এলো নতুন দর্শন। তাই গোষ্ঠী শত্রু রাক্ষসরা হয়ে গেলেন অনার্য। পৃথিবীর ব্যাপারে দেবতারা গভীর ভাবে মনোযোগ দিলেন। রাবণ ধ্বংস হলেন। এবার পৃথিবীতে দেব-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পালা। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নেই পৃথিবীতে। বেদব্যাসকে তৈরি করে নেওয়া হল। বেদ বিভাগ করা হল। এবার দেবতারা নিজেদের মহিমা প্রচার করে পার্থিব মানুষকে প্রভাবান্বিত করার কথা ভাবলেন। সৃষ্টি হল পুরাণের, যেখানে দেহধারী দেবতাদের ছড়াছড়ি। উপনিষদের একেশ্বরবাদ পুরাণের চাপে পড়ে দূরে হঠে গেল।

ইতিমধ্যে বাল্মিকীকে দিয়ে নিজেদের গোষ্ঠিযুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। পার্থিব মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য আসল ইতিহাসকে কাব্য বলে চালানো হয়েছে। এর পর মহাভারত লেখানো হল। শেষ হল দেবতাদের প্রাথমিক কাজ। এর পর অন্য কোন গোষ্ঠী পৃথিবীতে এলেও আর সুবিধে করতে পারবে না। পৃথিবীর মানুষরাই তাদের হঠিয়ে দেবে। পৃথিবীতে কায়েম হবে দেব-রাজত্ব।

এই দেবতারাও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনার অতীত নন। তারাও জন্ম-মৃত্যুর অধীন। এর প্রমাণ পাই আমরা রামায়ণ-মহাভারতের পাতায় পাতায়। প্রজাপতি ব্রহ্মার জীবৎকাল যত দীর্ঘই হোক না কেন, তারও শেষ আছে। ইন্দ্র তো চোদ্দটা। সুতরাং দেবতারা ঈশ্বর নন। দেবতারা আমাদের মতোই রক্তমাংসের মানুষ। তবে তারা আমাদের থেকেও যথেষ্ট উন্নত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র' যারা পড়েছেন তারাই লক্ষ্য করে থাকবেন যে বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিসহকারে দেখিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ একজন বুদ্ধিমান মানুষের বেশী আর কিছুই নন।

বুদ্ধির স্বল্পতা ও জ্ঞানের অনুন্নতির জন্যই পার্থিব মানুষ কোটি কোটি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কিন্তু তা তো হতে পারে না। ঈশ্বর এক। তিনি অক্ষয়, অব্যয়। তিনি জন্মরহিত, অমর, নিত্য ও শাশ্বত।

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥'

[কঠ উপনিষৎ ১।২ ১৮]

এই পরমাত্মা বা ঈশ্বরকেই জানতে চেষ্টা করেছেন দেবতারা। এই পরমব্রহ্মের সন্ধানেই ছুটে বেড়াচ্ছে মানুষ। অর্থাৎ যে বিশ্ব-নিয়ন্তা পরমব্রহ্ম দেবতাদের ঈশ্বর, তিনিই মানুষেরও ঈশ্বর।

রামায়ণ-মহাভারতের অলৌকিক গল্প-গাথার ভিতরে যে সত্য লুকিয়ে রয়েছে আজ আমরা তার মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইছি। পণ্ডিতেরা হয়তো কূট তর্ক তুলবেন, আঁৎকে উঠবেন দেবভক্তরা। আমাদের সব কথা বিশ্বাস করতেই হবে এমন কোন মাথার দিব্যি আমরা দিচ্ছি না। আমরা আমাদের বক্তব্য রাখছি কেবলমাত্র অগণিত কৌতূহলী পাঠকদের সামনে। তাঁরা যদি যুক্তিবাদী মন নিয়ে নিরপেক্ষভাবে সব কিছু নতুন করে ভাবতে শুরু করেন তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক।

॥ সমাপ্ত ॥

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

Alan and Sally Landsburg—In Search of Ancient Mysteries

Alexander Kondratov—The Riddles of Three Oceans.

Alfred Sherwood Romer—Man and the Vertibrates Vol. II

A. L Basham (Edited by)—A Cultural History of India.

Andrew Tomas—We are not the First (বাংলা অনুবাদ : বিশু দাস)।

Alvin Toffler—Future Shock.

Brinsley Le Poer Trench—Secret of the Ages.

Charles Berlitz—Mysteries from Forgotten Worlds.

Craig and Eric Umland—Mystery of the Ancients.

Eloise Engle & Kenneth H. Drummond—Sky Watchers.

Erich Von Daniken—Chariots of the Gods.

E. F. C. Ludowyk—The story of Ceylon.

F. P. Kerovkin—Ancient History.

George Gamaw—A Planet Called Earth.

H. D. Sankalia—Reading the Mind of the Harappans. [Science Today, June 1978]

H. T. Lambrick—Sind (a Generrl Introduction).

Immanuel Velikovsky—Earth in Upheaval.

Isaac Asimov—View from a Height.

L. Landau, Yu. Rumer—What is the Theory of Relativity (Translated from the Russian by A. Zdornykh).

Leonard Cottrell—Wonders of Antiquity.

M. Rebrov, G. Khozin—The Moon and Man (Translated from the Russian by Vladimir Talmy).

Michael Grumley—There are giants in the Earth.

Mohan Sundra Rajan—India in Space.

O. H. K. Spate & A. T. A Learmonth—India & Pakistan. (A general ond regional Geography).

P. E. Cleator—The Past in Pieces.

Romila Thapar—Ancient India.

Sir Mortimer Wheeler—The Indus Civilization (Supplementary Volume to the Cambridge History of India—3rd Ed.).

Swami Prabhavananda--The Spiritual Heritage of India.

V. Komarov—This Fascinating Astronomy. (Translated from the Russian by N. Kittell).

Walter A. Fairservis, Jr.—The Roots of Ancient India.

W. J. Wilkins—Hindu Mythology—Vedic & Puranic.

অতুলচন্দ্র সেন—উপনিষদ।

অনিমেষ পাল—চাঁদে অভিযান (রুশ থেকে অনূদিত)।

আবদুল হক খন্দকার—জীবজগতের জন্মকথা।

ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা।

ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম ও ২য় খণ্ড) সামবেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা, অথর্ববেদ।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী—প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার।

পঞ্চানন তর্করত্ন (অনূদিত)—রামায়ণ।

বর্দ্ধমান রাজসভার পণ্ডিতমণ্ডলী (অনূদিত)—মহাভারত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণ চরিত্র।

বিমলেন্দু চক্রবর্তী—রহস্যময় মোহেনজোদড়ো।

বিমানচন্দ্র ভট্টাচায (ডঃ)—সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা।

মনোনীত সেন রামায়ণ ও মহাভারত : নব সমীক্ষা।

মাখন লাল রায়চৌধুরী—রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা।

রাজ্যেশ্বর মিত্র—স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা।